পুলকেশ দে সরকার

বাংলা বিপ্লবী-সাহিত্যের মূল্যায়ন—১

কে প্রথম শহীদ ?

প্রাপ্তিস্থান :

উচ্চারণ ২ ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

KE PRATHAM SHAHID

Pulakesh De Sarkar

প্রকাশক / পুলকেশ দে সরকার

৩১/সি/১৫, হরিনাথ দে রোড / কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ / আগষ্ট ১৯৬০

প্রচ্ছদ / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বাঁধাই / ইস্টেণ্ড ট্রেডার্স / ২০, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট / কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর / প্রদ্যুৎকুমার মান্না

বিশ্বকর্মা প্রেস / ২/১/এ, আশুতোষ শীল লেন / কলকাতা-৭০০০০৯

এই বইখানি

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির উচ্চ চিন্তাশীল লেখক মুরারিপুকুর বাগানবাড়ির বোমা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম নির্যাতিত বন্দী, পরবর্তী বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামে আমা-হেন অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের অগ্রজ এবং বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম-সচিব শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের করকমলে গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎসর্গ করে কৃতার্থ হলাম।

বাংলা বিপ্লবী-সাহিত্যের মূল্যায়ন—১

কে প্রথম শহীদ ?

বাঙলার স্বাধীনতাকামী বিপ্লব-প্রচেষ্টায় কে প্রথম শহীদ ?

এর জবাব একটিই হওয়া উচিত। প্রথম মানেও একটি। কিন্তু বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। যিনি মাত্র একখানি বই পড়েছেন তিনি একটি জবাব পেয়ে হয়তো সুনিশ্চিত হয়েছেন। কিন্তু যাঁর অন্তত একশ' বই পড়বার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছে তিনি একটু গোলমালে পড়বেন। তবে কিঞ্চিৎ গবেষণা করে প্রকৃত জবাবটিও আহরণ করে আনতে পারবেন। সন্দেহ নেই, তা শ্রমসাপেক্ষ এবং তা হওয়া চাই তুলনা ও যুক্তিনির্ভর। তথ্যগুলো বিশ্লিষ্ট করলেই কে প্রথম শহীদ তা অবিসম্বাদী ও তর্কাতীত হয়ে যাবে।

আপাতত একের পর আর আত্মত্যাগের এই যে মিছিল তার পটভূমিকা রচনাকালটি পাশ কাটিয়ে আমি সোজা শহীদ-রাজ্যে বিচরণ আরম্ভ করেছি, কারণ নানা বিভ্রান্তির মধ্যে আমি এই প্রশ্নটি সব চাইতে জরুরী মনে করেছি। বিস্মৃতি ও স্বীকৃতি-বৈষম্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। এটি কারও ইচ্ছাকৃত, এমন কথা বলা সঙ্গত মনে করিনে। অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। অসম্পূর্ণ জ্ঞানে পক্ষপাতী প্রচার-ব্যগ্রতা গৌণ কারণ হলেও দুর্ভাগ্যবশত তা অনেক ক্ষেত্রে প্রবলতর হয়েছে, অনুসন্ধান বা প্রাপ্ত তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের স্থৈর্যের যে বাঁধ তা ভেঙে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছার, পছন্দ-অপছন্দের সঙ্কীর্ণ ভাবাবেগ বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়েছে। বাংলা বিপ্লবী-সাহিত্যে বিভ্রম-বৈচিত্র্যই নির্ভরযোগ্য নৈর্ব্যক্তিক বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে দেয়নি। বিপ্লবী বাঙলার বর্তমান চরম দুঃখদৈন্য, পর-করুণানির্ভর জীবন-যাপন অনিবার্য ছিল না। এত ত্যাগ, এত নিষ্ঠা, কঠোর ব্রতপালন, অত স্বেদ ও রক্তপাত যথার্থ পটভূমিকায় যথার্থ ইতিহাসের অভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এ নিয়ে আফসোসের কোন সার্থকতা নেই যে, যে-বাঙলার তথা ভারতবর্ষের জন্য ঐ অপরিমেয় ত্যাগ. প্রাণদান, রক্ততর্পণ সে-বাঙলাও নেই, সে-ভারতবর্ষও নেই। বাঙলাকে বারে বারে ভাঙা হয়েছে। ছোটখাট বাদ দিয়ে প্রথম অসৎ-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বড় রকমের রাজনৈতিক ভাঙন হয় ১৯০৫এর ১৬ অক্টোবর।

তবু তা নিতান্তই প্রশাসনিক। কিন্তু তাইতেই বাঙলা প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে। প্রশাসনও অস্থির হয়ে ওঠে কিন্তু অসদুদ্দেশ্য ছাড়ে না। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের নামে আর একটা বঙ্গভঙ্গ করে, বিহার, উড়িষ্যাকে আলাদা করার নামে বঙ্গভাষী অনেক এলাকা মূল বাঙলা থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়, এবং সমূহ সর্বনাশের জন্য—অথবা বিদগ্ধ বাঙালির আধিপত্য খর্ব করার জন্য ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি নিয়ে যায়, সেদিনকার নির্বোধ বাঙালি এর—এই ষড়যন্ত্রের তাৎপর্য ধরতে পারে না। বঙ্গভঙ্গ রদ হল এই মিথ্যা মোহে উল্লসিত হয়ে ওঠে, দুই লর্ড, হার্ডিঞ্জ-ক্রুব, ডেসপ্যাচগুলো বোধগম্যও হল না। তারপর শেষবার বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯৪৭এর ১৫ আগষ্ট—বাঙালিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মিশ্রণে। প্রতি-রোধের মতো কোন শক্তিই তখন তাদের ছিল না এবং উপলব্ধি করতে বেশ দেরি হল যে, এবারকার বঙ্গভঙ্গ নিছক প্রশাসনিকমাত্র নয়, রাষ্ট্রিক। বাঙলার দুই তৃতীয়াংশ পররাষ্ট্র হয়ে গেল। একেবারে ১৯০৫এর রেখায় রেখায়। অধিকন্তু হার্ডিঞ্জ-ক্রুব মতানুসারী।

ক্ষতি ছিল না। রোমও গেছে গ্রীসও গেছে, কিন্তু রোম-গ্রীসের ইতিহাস আছে, তা আমাদের আজও পাঠ্য, কারণ ওরা দুই সভ্যতার চির-জাগরূক স্মৃতি। কাহিনীভুক্ত রোম-গ্রীসের মতো সেদিনকার বাঙলাও বিলুপ্ত। কিন্তু তার চির-জাগরূক ইতিহাস থাকবে না কেন? ইংরেজ রাজত্বে তার স্বাধীনতাকামী বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন? সে দায় ইতিহাসবিদের অবশ্যই, কিন্তু বিপ্লব-প্রচেষ্টার কুশীলবদেরও। ইতিহাসবিদ থাক, বিপ্লবীরা তাঁদের এই পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছেন? বর্তমান গ্রন্থ তারই অন্তঃশীল ময়না তদন্ত।

(২)

বাঙলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য ও ফরাসী চন্দননগরে 'প্রবর্তক আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা, শ্রদ্ধাস্পদ মতিলাল রায় তাঁর "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী" গ্রন্থে লিখেছেন: **"বিপ্লবযজ্ঞে বৃটিশদণ্ডে দণ্ডিত সর্বপ্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম বসু।"** (পৃঃ ২৩)**

লেখকের **"বৃটিশদণ্ডে দণ্ডিত"** বিশেষণটি লক্ষণীয়। "বিপ্লবযজ্ঞে" অন্য

** এই বইয়ের সর্বত্র বাংলা মোটা অক্ষরগুলো ও ইংরেজী ইটালিক্‌স আমার

কোনরকম আহুতি থেকে একান্তভাবে পৃথক, "বৃটিশদণ্ডে দণ্ডিত" যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রথম। "বিপ্লবযজ্ঞে" অন্য কোন ভাবে কারও আত্মাহুতি হয়ে থাকলে বা কেউ দিয়ে থাকলে তিনি মতিলাল রায়ের শহীদ সংজ্ঞায় পড়বেন না, এমন কারও কথা তিনি উল্লেখও করেন নি। সুতরাং, আর কারও প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না; কেননা, সেখানে রাজদণ্ডের ছাপ নেই। কিন্তু এমনতর শহীদের শ্রেণীবিভাগ কারও উদ্দেশ্য হতে পারে না, তা গ্রাহ্যও নয়।

"রাজদণ্ডে দণ্ডিত" ক্ষুদিরাম বসুর গ্রেপ্তার, পর্যায়ক্রমিক বিচার ও ফাঁসীর তিন মাসেরও আগে, ধরা পড়ার মুহূর্তে আপন হাতের ব্রাউনিং পিস্তলে গুলি করে প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুবরণ তবে কি? প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের জজ ডি এইচ কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুর যাত্রাকালে বারীন্দ্রকুমার দুটি রিভলভার দিয়ে তাঁদের এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করেছিলেন (এবং প্রফুল্ল নিজেই সে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন) যে, ধরা পড়ার উপক্রম হলে (পুলিসকে যাতে কিছু বলার অবকাশ না থাকে), ঐ অস্ত্রে তাঁরা আত্মহনন করবেন। (ঐ দুটি রিভলভার ছাড়াও প্রফুল্লর নিজস্ব একটি ব্রাউনিং পিস্তল ছিল)। প্রফুল্ল অক্ষরে অক্ষরে প্রতিশ্রুতি পালন করতে ঐ ব্রাউনিং পিস্তলটিই প্রয়োগ করেছিলেন। ক্ষুদিরাম তা পারেন নি, রিভলভার দুটি তাঁর কাছেই ছিল।

মজঃফরপুরে ১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিলে রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ বোমা নিক্ষেপের পর ২ মে মোকামা স্টেশনে সিংভূমের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ও কয়েকজন কনস্টেবল পরিবেষ্টিত প্রফুল্ল চাকীর অসাধ্যপ্রায় অসমসাহসিক মৃত্যু-বরণে বিশেষ কোন হৈ-চৈ বা সরব প্রচার হয়নি, স্টেশনের কিছু লোকের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল কিন্তু প্রধানত তা কতিপয় পুলিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর সনাক্তকরণও কঠিন ছিল, কেননা, তাঁর একমাত্র সঙ্গী ওয়েইনি ষ্টেশনে পুলিসকরধৃত ক্ষুদিরামও তাঁর প্রকৃত নাম-পরিচয় জানতেন না। তিনি জানতেন সঙ্গীর নাম ডি সি রয় বা দীনেশচন্দ্র রায়। এই কারণে, আত্মবিসর্জনকারী এই মানুষটির পরিচয় সন্ধানে পুলিস ধড় থেকে কেটে মাথাটি স্পিরিটের পাত্রে ডুবিয়ে কলকাতার লালবাজারে পাঠিয়েছিল এবং পরে তা কলকাতার ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের কোথাও প্রোথিত করা হয়েছিল! অর্থাৎ, সব কাজই যথাসম্ভব নীরবে নিভৃতে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে সমাধা হয়েছিল।

পক্ষান্তরে, ওয়েইনি স্টেশনে ক্ষুদিরামের দুটি রিভলভার, ৩০টি টাকা, ৩০টি

কার্তুজ ও অন্যান্য সামগ্রীসহ ধরা পড়া, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর প্রাথমিক বিবৃতি, মজঃফরপুর আদালতে দায়রাসোপর্দকারী আর এক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দ্বিতীয় বিবৃতি, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে সাক্ষ্যসাবুদসহ বিচারকার্য, দায়রা বিচার, দায়রা জজের মৃত্যুদণ্ডাদেশ, দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল, দুই পক্ষে সওয়াল, তারপর দণ্ড সমর্থক হাইকোর্টের রায় এবং তারও পর নিষ্ফল আপীল অন্তে জেল-রীত্যনুসারে 'মার্সি পিটিসান', লেঃ গবর্ণরের কাছে, সম্রাটের কাছে আবেদন—সব ব্যর্থতার শেষে ক্ষুদিরামের নির্ভয় স্মিতহাস্যে বধ্যমঞ্চে আরোহণ—স্তরে স্তরে উৎসুক উৎকণ্ঠিত জনসাধারণ্যে খণ্ডে খণ্ডে সব কিছু প্রচারিত হয়েছে, তারপর চলেছে গুচ্ছে গুচ্ছে প্রবহমান লোকসঙ্গীত। বলা বাহুল্য, এর কোনটাই নীরবে নিভৃতে অগোচরে হয়নি। কিন্তু প্রফুল্লর নামোচ্চারিত হয়নি কোথাও, না, দীনেশেরও নয়।

এই একান্ত প্রচার-প্রাচুর্যের প্রভাব এতই অপরিসীম যে, মতিলাল রায়ের মতো প্রথম সারির বিপ্লবী-লেখকেব কাছেও প্রফুল্ল চাকী শহীদ বলে গণ্য হলেন না—রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন নি বলে। শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়ের বিচারে চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে যাঁরা বাজদণ্ডে নয়, সম্মুখ-সমবে, আত্মবিসর্জন দিলেন অথবা বিনয়-বাদলের আত্মবিলোপ কিংবা জজ গার্লিক হন্তারক যে বিপ্লবী নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষলেন—তাঁরা কেউই এই শহীদের সংজ্ঞায় পড়েন না। বড়া কোম্পানীর মৌজার পিস্তল পাচারেব প্রত্যক্ষ নায়ক শ্রীশ বা হাবু মিত্তিবের স্বদেশ থেকে বহু দূরে নানাবিধ শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে আত্ম-বিলয়নেও শহীদের ছাপ পড়বে না। অথবা যতীন মুখার্জি প্রমুখ ?

শুধু তাই নয়, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহনন যদি বাজদণ্ডেব তৌলে নগণ্য হয়, তবে তারও আগে রঙপুরেব প্রখ্যাত ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র এবং মানিকতলা বাগান-গোষ্ঠির প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দিঘিরিয়া পাহাড়ে বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ আরও গৌণ। তিনি ছিলেন রাজদণ্ডের একেবারে বাইরে চির-পলাতক (বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষের কৌঁসুলি আর্ডলি নর্টন প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে পলাতক বলেই ঘোষণা করেছিলেন)।

অভিধান বলে, ধর্মযুদ্ধে নিহত বা ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আত্মোৎ-সর্গকাবী ব্যক্তিই শহীদ।[১] বস্তুত, এইটিই সঙ্গত যে, লোকহিতকর কোন সুস্পষ্ট বিপ্লববাদী আদর্শে মরণ-বাঁচনের হিসেব না করে প্রস্তুতিকাল থেকে ঘটনাকাল পর্যন্ত নিশ্চিত মৃত্যুকে নিঃসংকোচে নির্ভয়ে বরণ শহীদেরই মর্যাদাভূষিত।

সুতরাং, এই সঙ্গত বিচারে বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম নন, প্রফুল্ল চাকী নন—**প্রফুল্ল চক্রবর্তী**।

এই পটভূমিকায় বাঙলার বিপ্লবী সাহিত্য পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনও পাওয়া যায়।

(৩)

বর্তমানে পণ্ডিচেরী আশ্রমের সচিব ও তৎকালীন মানিকতলা মুরারীপুকুর বাগান-গোষ্ঠি-অন্তর্গত বিপ্লবী শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্তের "স্মৃতির পাতা"য় প্রফুল্ল চক্রবর্তী সম্পর্কে আছে: প্রফুল্ল চক্রবর্তী ছিল ভাবুক ধরণের—চিন্তাশীল, অন্তর্মুখী, লেখক ও বক্তা" (পৃঃ ৩২-৩৩)। শ্রী গুপ্তের মাণিকতলা মুরারীপুকুর বাগানবাড়িতে আসবার "কিছু পূর্বে প্রফুল্ল চক্রবর্তী যোগ দিয়েছে এসে" (পৃঃ ২৮)। উল্লেখ করা দরকার, নলিনীকান্ত নিজে এবং প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও প্রফুল্ল চাকী—সবাই উত্তরবঙ্গের মানুষ, যথাক্রমে নীলফামারী, রঙপুর ও বগুড়ার।

শ্রীগুপ্ত প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যুবরণের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি ঐ বইখানিতে লিখেছেন: "স্থান—দেওঘর, কাল—১৯০৭ সালের শেষ ১৯০৮ এর আরম্ভ; পাত্র—বারীন্দ্র, উল্লাসকর, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনী গুপ্ত, কর্ম—বোমা তৈরী। উল্লাসকর বললেন, 'Eureka' (পৃঃ ৪০)।

"বোমা তৈরি হল পুরোপুরি একটা। উল্লাসকর প্রধান কারিগর আমরা সহকারী। রেল লাইনের ওপারে ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী—দিঘিরিয়া। বিকেলের দিকে চললাম পাঁচজনই। বোমাটি বইবার ভার আমার ওপর।··· একটা জায়গা পছন্দ করা হল। প্রকাণ্ড পাথর দেখা গেল, খাড়া উঁচু, বুক প্রমাণ হবে, আর একটা দিক ক্রমে ঢালু হয়ে নীচে চলে গিয়েছে।···প্ল্যান হ'ল প্রফুল্ল ছুঁড়বে খাড়া দিকটার আবডালে পিছনে দাঁড়িয়ে ঢালুটার ওপর তাক করে, ছুঁড়েই বসে পড়বে যাতে ফাটার পরে কোন টুকরো গায়ে না লাগে। উল্লাস থাকবে প্রফুল্লর পাশে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে।···আমি রইলাম একটু দূরে গাছের উপরে যাতে সব দৃশ্যটা আমার নজরে থাকে। বারীনদা ও বিভূতি এদিক ওদিক স্থান গ্রহণ

উদ্ধৃতিগুলোর বানান মূলে যেমন আছে তাই রেখেছি

করলেন।…হঠাৎ দেখি একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল, খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কি বিকট আওয়াজ!…আমি তো পুলকিত উল্লসিত, সহর্ষে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে উপস্থিত হলাম ঘটনাস্থলে।…কিন্তু এ কি ? এ কি বীভৎস দৃশ্য ? প্রফুল্লর দেহ এলিয়ে পড়েছে উল্লাসের বুকের উপরে, উল্লাস দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। আস্তে আস্তে শুইয়ে রাখা হল—দেখা গেল, কপালেব একটা পাশ চৌচির, তার ভেতর দিয়ে খানিকটা ঘিলু বের হয়ে পড়েছে। আমবা বসে পড়লাম চার পাশে—সব চুপচাপ। বারীনদা বললেন —সব শেষ, কোন আশা নেই।·· বারীনদা বললেন, কিছু করবার দরকাব নেই, ওভাবেই রেখে চলে যাওয়া যাক। **এটা যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের এক সৈনিক দেহ দান করল—আমাদের এই প্রথম casualty**।

"উল্লাসও তো আহত· বারীনদা বললেন, এখন এঁকে বাঁচানো দবকাব, সুতবাং, তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়। আজই ফিরতে হবে কলকাতায়·· ।

"Not a drum was heard, not a funeral note ' আমি একবাব উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলাম, আমরা এসেছিলাম পাঁচজন, ফিরে যাচ্ছি চারজন। বারীনদা আমাকে ধমকে বললেন, 'No sentimentality, please। বাবীনদা ও উল্লাস সেই রাত্রিতেই কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন।

"পরেব দিন বাতে বা পবেব দিন ভোরে উপেনদা এসে পৌছোলেন বাবীনদাব সঙ্গে।·· উপেনদা জায়গাটা দেখতে চাইলেন…দূব থেকেই দেখলাম পড়ে আছে দেহটি ঠিক তেমনি ভাবে যেমনটি বেখে গিয়েছিলাম, কাপড-চোপড গায়ে তেমনি, একটু এদিক ওদিক হয়নি, গন্ধও কিছু নেই এই তৃতীয় দিনে। যেমন গিয়েছিলাম আবার ফিরে এলাম তেমনি, দেহটিকে তেমনি রেখে· ·।

"(দেওঘব থেকে) শেষ বিদায়েব আগে একবার শেষ দেখাব ইচ্ছা হল আমাদেব দিঘিবিয়ার পাহাড—ঘটনার চতুর্থ দিনে।· কিন্তু কী আশ্চর্য! কোথায় সে দেহ ? চিহ্নমাত্র কোথাও কিছু নেই। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে তল্লাস করা হল—একটি টুকরা কাপড় পর্যন্ত পাওয়া গেল না।…জিনিসটা প্রহেলিকা বয়ে গেল।"

"শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন,…প্রফুল্ল সত্যি সত্যি মাবা গিয়াছে।" (পৃঃ ৪৩-৪৬)

আলিপুর আদালতে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় ফরিয়াদী কৌঁসুলি মিঃ আর্ডলি নর্টন প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে পলাতক আসামী বলে ঘোষণা করেছিলেন (পুলিশ ঘটনার কিছুই জানত না, কোন হদিসও তাঁর পায়নি)।

আসলে, বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রথম সৈনিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন, 'first casualty', প্রথম শহীদ।

১২মে তারিখের রঙপুর সংবাদ বলে অমৃতবাজার পত্রিকার ১৩মে সংখ্যায় এই মর্মে এক সংবাদ বেরোয়: "আজ ভোরবেলা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, পুলিস ইন্সপেক্টর (সেন) এবং দুই জন দারোগা 'দেশী দোকানে' ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পেস্কার ঈশান চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা দেয় এবং খানা-তল্লাসী করে। 'দেশী দোকানে'র মালিক ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। ঈশানবাবুর বাড়িতে একটি বন্দুক, চারটি কার্তুজ-খোল ও বারুদ পাওয়া গেছে। এগুলোর লাইসেন্স আছে। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মন্তব্য করেন, 'রঙপুরে বোমা নেই, আমরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারি।"

প্রফুল্ল চক্রবর্তী সম্পর্কে কোনই জিজ্ঞাসাবাদ হয়নি। তার কারণ, পুলিস তখনও জানে না, এ বাড়িরই একটি ছেলে, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিপ্লব প্রচেষ্টায় বোমা বিস্ফোরণে মারা গেছে।

কিন্তু নরেন গোঁসাইর রাজসাক্ষী হবার পর এ বাড়িতে দ্বিতীয়বার তল্লাসী হয় ও ঈশান চক্রবর্তী বন্দী হন। নরেন গোঁসাইর হত্যার ফলে চক্রবর্তী মশাইকে কিছু করা যায় নি, ছেড়ে দিতে হয়।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "নির্বাসিতের আত্মকথা"য় লিখেছেন: "আমাদের একটি ছেলে বোমা ফাটিয়ে মারা পড়ে। আমাদের যতগুলি ছেলে ছিল তাহার মধ্যে সেইটিই বোধ হয় সব চেয়ে বুদ্ধিমান। তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে, যে তাহাকে দেখিয়াছে সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই।" (পৃঃ ২৪)

"বিপ্লবী যুগের কথা"য় প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দিঘিরিয়া পাহাড়ে উল্লাসের বোমা পরীক্ষায় ও বিস্ফোরণ দুর্ঘটনায় প্রফুল্ল চক্রবর্তীর প্রাণনাশের প্রত্যক্ষ পাঁচ সাক্ষীর যে নাম-তালিকা দিয়েছেন তাতে বিভূতিভূষণ সরকার ও নলিনীকান্ত গুপ্তর নাম নেই, আছে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও উপেন্দ্রনাথের নাম। অর্থাৎ, চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর অন্যতম নলিনীকান্ত গুপ্তর বিবৃতির সঙ্গে মিল নেই। নলিনীকান্ত গুপ্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিজের ভূমিকার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এখনও জীবিত (১৯৬০/মার্চ)। তাঁর বিবৃতির ভ্রান্তি যাঁরা দেখাতে পারতেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের কেউ নন। অবিনাশচন্দ্র স্বয়ং অথবা আর কেউ অবিনাশচন্দ্রের উপস্থিতির কথা বলেন নি। উপেন্দ্রনাথ ঘটনাবলীর

কোন্ পরবর্তী পর্যায়ে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন শ্রীগুপ্ত তারও বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং, শ্রীগুপ্তর বর্ণনাই বা তথ্যই গ্রাহ্য। তবে প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় মশাই একথা বলেছেন যে, **"প্রফুল্ল চক্রবর্তী বিপ্লবের এই পর্যায়ের প্রথম শহীদ।"**

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত তাঁর "বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার" (১৩৬১) রঙপুরের ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বিস্ফোরণে মৃত্যুর কথা বলেছেন এবং **তাঁকে "প্রথম শহীদ"** বলে অভিহিত কবেছেন (পৃঃ ৯২)। কিন্তু যে প্রসঙ্গ টেনে তিনি একথা বলেছেন তা যথার্থ নয়। তিনি বলেছেন, ১৯০৬ সালের ১৩ আগষ্ট হেমচন্দ্র কানুনগো পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে ফরাসী দেশে যান। বোমা প্রস্তুত শেখেন। মেদিনীপুরের কর্মী। মানিকতলা বাগান যুগান্তরী কেন্দ্র; এখানে বোমা হত না। প্রথম প্রচেষ্টা দেওঘরের রোহিণীতে। ব্যর্থ কিন্তু · ইত্যাদি। পড়ে মনে হবে মেদিনীপুরের কর্মী হেমচন্দ্র ফরাসী দেশে শিখে আসবার পর প্রথম বিস্ফোরণের পরীক্ষা হয়। তা নয়। দিঘিরিয়া পাহাড়ের বোমার কারিগর উল্লাস আর চারজন সহকারী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তর এই বিবৃতিই গ্রহণযোগ্য। ফরাসী দেশে হেমচন্দ্রের শিখে আসার সঙ্গে এই ঘটনা বা দুর্ঘটনার সম্পর্ক নেই। হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) মশাইও তাঁর "বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা"র কোথাও এ দাবি করেন নি। হেমচন্দ্র উৎকৃষ্টতর বোমা তৈরি শিখে এসেছিলেন, তিনি বরং তাঁর বইয়ে এই অভিযোগ করে এসেছেন যে, তিনি আসবাব পর বাবীন্দ্র উল্লাসকে চটপট হেমচন্দ্রের ফর্মুলা আয়ত্ত কবে নেবাব জন্য হেমচন্দ্রেব সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগে উল্লাসকর নিজের (বা তাঁর বাবার) লেবরেটবিতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছিলেন এবং তাবই ফল—দিঘিরিয়ার বোমা—শ্রীগুপ্তের কাহিনীতে সংবাদ পাওয়া যায়। ক্ষীরোদবাবু তাঁর বইয়ের আর এক জায়গায় বলেছেন (পৃঃ ১১২), দেওঘরে যে বোমার কারখানা ছিল, প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যুব পব তা তুলে দেওয়া হয়। হেমচন্দ্র দাসের এতে কোন ভূমিকা ছিল না।

"শহীদ প্রফুল্ল চাকী"র গ্রন্থকার কালীপদ বাগচী মশাই লিখেছেন: প্রফুল্ল (চাকী কলিকাতায়) আসিয়া প্রফুল্ল চক্রবর্তীর আশ্রয় লইয়াছিল।...১৯০৭ সনের প্রথম ভাগেই তাহাব অন্য আশ্রয়ে যাওয়ার কাবণ ঘটল। হঠাৎ প্রফুল্ল চক্রবর্তী মেস হইতে নিরুদ্দেশ। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর এই অন্তর্ধান—চিরদিনের জন্যই অন্তর্ধান।"

কিন্তু কালীপদবাবু এরপর যে গল্পের অবতারণা করেছেন তার সঙ্গে শ্রীগুপ্ত মশাইয়ের বিবরণের প্রতিপদে বিরোধ। তিনি লিখেছেন : "ফ্রান্স হইতে বোমা তৈরীর প্রক্রিয়া শিখিয়া আসিয়া হেমচন্দ্র দাস [কানুনগো] যে প্রথম বোমা তৈয়াবী করেন [অর্থাৎ উল্লাস নয়] তাহার কার্যকারিতা পরীক্ষার ভার পড়িল প্রফুল্ল চক্রবর্তীর উপর। বারীন্দ্রনাথ [নাথ নয় কুমার], উল্লাসকর এবং প্রফুল্ল চক্রবর্তী [অর্থাৎ তিনজন ; গুপ্তমশাই কথিত পাঁচজন নয়, বিভূতিভূষণ সরকার ও বোমা বহনকারী শ্রীনলিনী গুপ্ত বাদ] দেওঘর রওনা হইলেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এ কার্যে সকলেই অনভিজ্ঞ। ফিউজ-লাগানো বোমা—বিস্ফোরণের সময় নির্ণয়েরও কোন নিদর্শন বা উপায় নাই। চক্রবর্তী নেতৃদ্বয়কে বলিলেন—আপনারা দূরে যান—কোন বিপত্তি হয় আমি একাই মাথায় লইব। [এ সবই কালীপদবাবুর নিজস্ব সংযোজন, বারীন্দ্রকুমার বা উল্লাসের কাহিনীতে এসব নেই। শ্রীগুপ্তের বইয়ে তো নেইই, তথাপি কালীপদবাবু প্রত্যক্ষদর্শীর মতোই বলছেন] আকাশ কাঁপাইয়া সশব্দে বোমা বিদীর্ণ হইল। প্রফুল্লর দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ তাহার চিহ্ন মাত্র রহিয়াছে। **এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রফুল্ল চক্রবর্তীই প্রথম বলি।"**

মোটা অক্ষরের কথাগুলো বাদ দিলে কালীপদবাবুর বর্ণনাব সঙ্গে শ্রীনলিনী গুপ্তের বর্ণনার মৌল পার্থক্য ঘটেছে। কালীপদবাবু যে ঘটনাস্থলে ছিলেন না তা বলা বাহুল্য। এ বিষয়ে কোন পুলিস রিপোর্ট বা অন্য কোন নথিপত্র নেই। কারও কাছ থেকে শুনে লেখাই সম্ভব। কার কাছ থেকে উল্লেখ করলে বোঝা যেত—যেমন করেছেন শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাঁর "অবিস্মরণীয়"-নামা গ্রন্থে। নলিনীবাবুরা (চার/পাঁচজন) অন্তত "ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহের কিছু দেখতে পান নি। দেহটাই দেখেছিলেন, তিন দিন পর তাও ছিল না। কালীপদবাবুর বইয়ে আরও অনেক অসঙ্গতি আছে। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে তাঁর বর্ণনা কতটা নির্ভরযোগ্য : (১) তিনি মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের তারিখ দিয়েছেন ৩১ এপ্রিল। এপ্রিল ৩০ দিনে, ঘটনার তারিখ ৩০ এপ্রিল, এপ্রিল ৩১ দিনে হয়ও না। (২) কালীপদ বলেছেন, "চক্রের নিয়মানুসারে কেহ পরিচিতের সহিত বাস করিতে পারিবে না।" মুরারীপুকুর বাগানে একসঙ্গে চোদ্দজন ধরা পড়েন এবং তাঁরা একসঙ্গেই থাকতেন, পরস্পরের নাম-পরিচয়ও জানতেন; গোপীনাথ দত্ত লেনে কানাইলাল দত্ত, নিরাপদ রায় একসঙ্গে থাকতেন ও ধরা পড়েন ; হ্যারিসন রোড মামলায় একই সঙ্গে কয়েকজন থাকতেন ও ধরা পড়েন

ইত্যাদি। সুতরাং কালীপদবাবুর ও কথাটি ভিত্তিহীন। (৩) তিনি লিখেছেন, মজঃফরপুরের জন্য প্রফুল্ল চাকীকে নির্বাচিত করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম বসুকে করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কথাটি যে ঠিক নয়, বারীন্দ্রকুমারের বিবৃতিতে প্রকাশ পাবে। ক্ষুদিরাম ও সত্যেন্দ্রনাথ যে বাগানবাড়ির কেউ ছিলেন না, একথা বারীন্দ্রকুমারের বিবৃতিতে আছে, আরও আছে, ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লর সঙ্গী হিসেবে দেবার বা নেবার সুপারিশ করেন হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো), তিনিও মেদিনীপুরের। দাস মশাইর "বাংলার প্রচেষ্টা"য় এ খবর আছে। (৪) কালীপদবাবুর এমনিতর আরও অনেক কথার মধ্যে একথাও আছে যে, তাঁরা (অর্থাৎ প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম) যেদিন ধর্মশালায় যান সেদিন ২৮ এপ্রিল। এটা যে সম্পূর্ণ ভুল তা ক্ষুদিরামের বিবৃতিতেই ধরা পড়বে, ধর্মশালার কিশোরী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের জবানবন্দী ও জেরায়ও এর যথার্থ হিসেব পাওয়া যাবে।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ তাঁর "জাগরণ ও বিস্ফোরণ"-এর দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ২৯৩-৯৪) প্রফুল্ল চক্রবর্তীর আত্মবলিদান কাহিনী সম্পর্কে প্রধানত শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের "স্মৃতির পাতা" এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্বাসিতের আত্মকথা"র উপরই নির্ভর করেছেন ও বলেছেন: "মানিকতলা বাগানে কেন্দ্র খোলবার আগে থেকেই তোড়জোড় চলছিল নানারকম, তার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বোমা প্রস্তুত ছিল অন্যতম লক্ষ্য। এর জন্য দেওঘরের কাছে অন্য একটি ঘাঁটি খোলা হয়েছিল। সেখানে বোমা তৈরী করতে লেগে গেলেন উল্লাসকর দত্ত, ...অবশেষে বোমা নির্মাতা বললেন যে, তাঁর গবেষণা পূর্ণত্ব লাভ করেছে, এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার পরীক্ষা প্রয়োজন।" এর পর "স্মৃতির পাতা" থেকে ঘটনার পরিণতি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "অশুভ সেদিনটা ছিল ১৯০৮ জানুয়ারী ২৯।" শ্রীনলিনীকান্ত লিখেছেন "১৯০৭ সালের শেষ-১৯০৮ সালের আরম্ভ।"

শ্রীকালীচরণ ঘোষ লিখেছেন, "বোমার বিস্ফোরণ এই প্রথম এবং তাই দিয়ে হল বিপ্লবীর জীবনান্ত। অমূল্য তাঁর দান।" উপেন্দ্রনাথের কথাটুকু উদ্ধৃত করে শ্রীঘোষ আরও বলেছেন, "তাঁর খোঁজে পুলিশ বহু জেলা তোলপাড় করেছে; তাঁকে ধরবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে, কিন্তু প্রফুল্ল তখন সকল ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। পুলিশ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ঐ সাংঘাতিক লোকটি বাইরে থাকলে, কিছু অঘটন ঘটাতে পারে।......পুলিশের গোপন অনুসন্ধানের

ফল অতি উচ্চ দপ্তরে জানানো হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত, প্রফুল্ল সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে গেছেন। এটা মানিকতলা ষড়যন্ত্রের প্রথম পরিচ্ছেদ।"

শ্রীকালীচরণ ঘোষ যে লিখেছেন "পুলিশের গোপন অনুসন্ধানের ফল"—সে কি ফল তা ঘোষ মশাই বলেন নি। এই অঞ্চলের স্পেশ্যাল ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এফ সি ড্যালি বাঙলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রারম্ভকাল সম্পর্কে যে অতি গোপন রিপোর্ট দেন তার কোথাও এর উল্লেখ নেই। (১৯৬০ সালের আগষ্টে এই রিপোর্টটি শ্রীশঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত ও তাঁর নোট সহ প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে প্রফুল্ল চক্রবর্তী দূরস্থান দেওঘরের কোন খবরই নেই)।

"বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী"-তে আছে : "প্রফুল্ল চক্রবর্তী একটা কাজে যাইতে পায় নাই বলিয়া, আমার উপর অভিমান করিয়াছিল, তাহার অভিমানও রণচণ্ডী রাখিলেন, মায়ের বরে সন্তান মরিয়া বাঁচিল। সেকাজে মরিবার কথাই নহে, তবু আমাদের সব চেয়ে মনস্বী, ধীর, মহৎ চরিত্রের ছেলে প্রফুল্লই সে কাজে আচম্বিতে নির্জন পাহাড়ের শৃঙ্গে বোমা ফাটিয়া মরিল।…এই প্রফুল্লর কথাই উপেন তার 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় বলিয়াছে। [পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য]

উল্লাসকর দত্ত নিজে কিছু না বলে বারীন্দ্র-উপেন্দ্রের কাহিনীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। [বিপ্লবী সাহিত্য বা ইতিহাসের দিক থেকে উল্লাসকরের "কারাজীবনী" বিশেষ সহায়ক নয় ; অথচ এই দুর্দান্ত বিপ্লবীর জীবন ছাত্রাবস্থা থেকেই অগ্নিগর্ভ। ১৯০৫এ প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র উল্লাস লজিকের প্রফেসর রাসেলকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলেন জুতো বাঙালীদের নিন্দার অপরাধে। জুতো লেগেছিল রাসেলের বুকে। উল্লাসের ছাত্রজীবন সাঙ্গ। তারপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পিতার আড়ালে লেবরেটরিতে বোমা তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। মানিকতলা বাগানের সঙ্গে যোগাযোগ। দেওঘর—দিঘিরিয়া—দুর্ঘটনা। হেমচন্দ্র ফ্রান্স থেকে বোমা তৈরি শিখে ফিরে এলে তাঁর সহকারী হলেন। এখান থেকে তৈরি বোমা তিনি এনেছিলেন হ্যারিসন রোডের এক কবরেজী দোকানে। সেই সূত্রে এক অস্ত্র আইনের মামলায় তিনি অন্যতম বন্দী ছিলেন, কিন্তু ধরা পড়েন মুরারীপুকুর বাগানে, ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথম হয় মৃত্যুদণ্ড, হাইকোর্টের আপীলে পরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সম্ভবত হতাশায় আন্দামানে তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন। মুক্তির পরও "কারাজীবনী" সেই মানসিক অবস্থায় লেখা ; ফলে, তাঁর কাছে যা

প্রত্যাশিত ছিল তা থেকে বাঙলার বিপ্লবেতিহাস বঞ্চিত হয়েছে। বোমার প্রথম কারিগর উল্লাস আর তাঁর স্বাভাবিক প্রাণসত্তাটি ফিরে পান নি, ফলে বিপুল ক্ষতি হয়েছে আমাদের।]

প্রথম বোমা বিস্ফোরণের পঞ্চনায়কের অন্যতম বিভূতিভূষণ সরকারের মৌখিক বিবৃতি উল্লেখ করেছেন শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাঁর "অবিস্মরণীয়" প্রথম খণ্ডে ৩৯ পৃষ্ঠায়। তিনি লিখেছেন: "কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীউল্লাসকর দত্তের ফরমূলায় তৈরী বোমা পরীক্ষার জন্যে দেওঘরে কয়েকজন গেলেন। পুরাণদহ অঞ্চলে শ্রীমণি বোসের বাড়ীতে একটি গোপন সংস্থা ছিল। দিঘিরিয়া পাহাড়ের এক জায়গায় একটা বড় পাথরের কাছে সেটা ফাটানোর বন্দোবস্ত হল যাতে পরীক্ষার সময় এদের কোন ক্ষতি না হয়। স্থির হল সকলেই বসে থাকবেন—যিনি ছুঁড়বেন তিনি ছুঁড়েই বসে পড়বেন। [উদ্ধৃত নাম কয়টি শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তর অনুরূপ]। বোমা ছুঁড়লেন শ্রীউল্লাসকর দত্ত—অন্য সকলে বসে ছিলেন শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। বোমাটা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের সংস্পর্শে এসে মাটিতে পড়বার আগে সেটা ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হয়ে গেল। সঙ্গীরা দেখলেন যে, শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তীর মাথার খুলিটা উড়ে গিয়ে প্রাণহীন নিশ্চল দেহ পড়ে আছে আর শ্রীউল্লাসকরের শিরাগুলি ফেটে গুটিয়ে গেছে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পাঠানো হল।"

এই বিবরণের সঙ্গে শ্রীগুপ্তের বিবরণের অনেক পার্থক্য তো বটেই সব চাইতে মারাত্মক ভুল তারিখে। "১৯০৮এর ১লা মে।" কি ক'রে হয়? ৩০ এপ্রিল তো মজঃফরপুরেরই ঘটনা। ১ মে ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার। ২ মে প্রফুল্ল চাকীর আত্মহনন। এর বহু আগে দিঘিরিয়ার ঘটনা। শ্রীকালীচরণ ঘোষ তারিখ দিয়েছেন ১৯০৮এর জানুয়ারি ২৯, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের তারিখ এত নির্দিষ্ট নয়—১৯০৭ সালের শেষ (মানে, ডিসেম্বর), ১৯০৮ সালের আরম্ভ, (মানে, জানুয়ারি), অর্থাৎ শ্রী ঘোষ ও শ্রীগুপ্ত যদিবা কাছাকাছি (এবং নানা ঘটনা-বিচারে শ্রীগুপ্তের তারিখটিই গ্রহণযোগ্য), শ্রীচন্দ্রের উল্লিখিত তারিখ সমূলে ভুল। অথচ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষ নায়ক বিভূতিভূষণ সরকারকেই সাক্ষ্য মেনেছেন। কিন্তু ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের দিন উল্লাসের বোমা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিস্ফোরণে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বলি হতেই পারে না। পাঠক যদি কেবল শ্রীচন্দ্র মশাইর বইখানি পড়েন তো এই ভুলই তো বেদবাক্য হবে ?

অন্যতম প্রবীণ বিপ্লবী ও লেখক শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ তাঁর "Aurobindo and Jugantar"এর ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"In an improvised laboratory in the quarters of his father in the B. E. College, Sibpur, Ullaskar started experiments for making bombs. He succeeded in making *bombs* which were so powerful that the first experiment of the *bombs* near Deoghar, where they *all* went to examine the efficacy of the bombs, ended in a tragedy. A fine youngman, Prafulla Chakravarty, son of venerable Ishan Chakravarty of Rangpur, was killed by the splinters of the bomb thrown into a gorge of the hills. *Two of these bombs were exploded at Muzafferpur by Khudiram Bose and Prafulla Chaki.*"

শ্রীগুহ তাঁর আর একখানি ইংরেজী বই "First spark of Revolution" এ লিখেছেন : "The first experiment was made at Deoghar (within Bihar) which exploded rather prematurely in the hand of Prafulla Chakravarty and his body was blown to pieces " (p. 300)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের বর্ণনার সঙ্গে শ্রীগুহের বর্ণনার বহুলাংশে মিল নেই। শ্রীগুপ্ত লিখেছেন, বোমা তৈরি হল পুরোপুরি একটা। শ্রীগুহ লিখেছেন *bombs* (অর্থাৎ বোমাগুলি)। শ্রীগুহ লিখেছেন, *all* (অর্থাৎ সকলে), কারা তাঁরা বলেন নি। দেওঘর পাহাড় অঞ্চলে এক *gorge* (বা গিরিসঙ্কটে) বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তারই টুকরো লেগে প্রফুল্ল নিহত হয়েছেন, শ্রীগুহ বলেছেন। অথবা প্রফুল্ল নিহত হবার সংবাদ ছাড়া আর সবই তাঁর অনুমানের তত্ত্ব। তার প্রমাণ—তিনি বলেছেন, মজঃফরপুরে এমনই দুটি বোমা (একটি নয়) ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বিদীর্ণ করেছেন। প্রথমতঃ, বারীন্দ্রের উক্তিতে পাওয়া যায়, উল্লাসের সহযোগে হেমচন্দ্র দাসের একটি হাতলওলা বোমা। ক্ষুদিরাম স্বয়ং একটি বোমার কথা বলেছেন। মামলার সাক্ষীদের মধ্যে অবশ্য মিঃ উইলসনসহ তিনজন সাক্ষী দুটি বিস্ফোরণের শব্দের কথা বলেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজ একটি বোমার কথাই গ্রাহ্য করেছেন। [প্রফুল্ল চাকী সম্পর্কে আলোচনা-কালে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের আরও একখানি ইংরেজী বই "First Spark of

Revolution—1900—1920" সহ এবিষয়ে আরও বিশদ বলা হবে। আপাততঃ প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রসঙ্গ]

Sedition Committee Report (p. 20) বলেছে (আসলে এ বারীন্দ্র-কুমার ঘোষের স্বীকারোক্তিরই পুনরাবৃত্তি) : Among other yongmen came to be admitted to our circle was Ullaskar Datta. He said that, as he wanted to come among us and be useful. he had learnt the preparation of explosives. He had a small laboratory in his house without his father's knowledge and he experimented there...With his help we began preparing explosives in small quantities in the garden house at 32, Muraripukur Road. In the meantime, ahother friend of ours, Hemchandra Das, after, I think, selling part of his property, went to Paris to learn mechanics and, if possible, explosives. When he came back he joined Ullaskar Datta in preparing explosives and bombs."

এই উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটি কথা স্পষ্ট। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিস্ফোরণ উল্লাসের প্রস্তুত বোমা নিয়েই এবং সে পরীক্ষা হেমচন্দ্র দাসের যোগদানের আগে। সুতরাং, উল্লাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বোমা বা বোমাগুলি নিয়ে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর যান নি। ফ্রান্স-ফেরত বোমা-বিশেষজ্ঞ হেমচন্দ্র দাসের সাহচর্যে যে বোমা, সেই উন্নততর বোমা নিয়েই তাঁরা গেছলেন। সুতরাং, শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ নয়, অর্থাৎ, এই বোমাগুলিরই দুটি ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে বিদীর্ণ করেন—একথা ঠিক নয়। প্রফুল্ল চক্রবর্তী যে-বোমার বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন তা একান্তভাবে উল্লাসের (শ্রীনলিনী গুপ্তের কথাই ঠিক), উল্লাস-হেমের সমবায় ফল নয়। সিডিসান কমিটি দিঘিরিয়া বিস্ফোরণের কোন খবরই পান নি (কেননা, বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তিতে তার উল্লেখ নেই)। উল্লাস প্রথম একা, হেমদাস আসবার পর দু'জনের যোগাযোগ—মধ্যবর্তীকালে দিঘিরিয়ার বিয়োগান্ত ঘটনা। হতে পারে এবং তাই স্বাভাবিক, পুলিস দিঘিরিয়ার ব্যাপারটা জানে না বলে বারীন্দ্রকুমারও চেপে গেছেন (যদিও বারীন্দ্রকুমার আগ

বাড়িয়ে পুলিসের অজানা কোন কথা যে বলেন নি তাও নয়)। মোট কথা, দিঘিরিয়া ও মজঃফরপুরের বোমা ও বিস্ফোরণ গুণগত বিচারেও পৃথক।

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্তের আরও একখানি বই আছে, নাম—"ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি"। তাতে কিন্তু তিনি লিখেছেন, "প্রথম বোমা তৈরীর চেষ্টা হয় উল্লাসকরের উদ্যোগে। এই বোমার পরীক্ষা হয় দেওঘরের রোহিনী পাহাড়ে।" দিঘিরিয়া রোহিনী হলে অত ক্ষতি নেই, কিন্তু তিনি যখন লিখেছেন, "এখানে বোমা তৈরী করতে গিয়ে [ছুঁড়তে গিয়ে নয়] প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রাণ দিলেন" তখন তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তবে তিনি এই বইয়েও লিখেছেন, "**প্রফুল্ল চক্রবর্তীই বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ।**"

মণি বাগচী তাঁর "বিপ্লবী রাসবিহারী বসু"র ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট মজঃফরপুরের জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো। তখন তার বয়স হয়েছিল উনিশ বছর। **বিপ্লবী বাংলার তিনিই প্রথম শহীদ।**"

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর "ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব"-নামা এক বিরাট গ্রন্থে প্রথম শহীদ সম্পর্কে এক অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি ঐ গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, সম্মুখ যুদ্ধে বাঙলার 'প্রথম শহীদ' প্রফুল্লকুমার। মতিলাল রায়ের মতো ভূপেন্দ্রকিশোরও একটি বিশেষণে ভূষিত করেছেন: 'সম্মুখ-যুদ্ধে'। ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "সম্মুখ-সংগ্রামে বাঙলায় প্রথম আত্ম-বিলয়ন করে 'শহিদ' হলেন প্রফুল্ল চাকি। ফাঁসির মঞ্চে প্রথম আরোহণ করে 'শহিদ' হলেন ক্ষুদিরাম। দুইভাবে এঁরা দুজনেই বাংলার "**প্রথম শহীদ।**"

অথচ ভূপেন্দ্রকিশোরই একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "এঁদেরও পুরযায়ী দুজন শহীদ বিপ্লবী-বঙ্গে জন্ম নিয়েছিলেন। একজন তরুণ বিপ্লবী পুলিশের হাত থেকে সশস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা [?] করেছিলেন চন্দননগরের ধারে কাছে, চলন্ত ট্রেনের নীচে আত্মদান [!] করে।" [তৃতীয় বন্ধনীর জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধক চিহ্ন দুটি আমার।] "অপর তরুণ উল্লাসকর দত্তের ফরমুলা অনুসারে তৈরি 'বোমা' পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন 'দিঘিরিয়া' পাহাড়ে। সেই তরুণ কিশোরের নাম প্রফুল্ল চক্রবর্তী। বোমা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রফুল্ল গেছেন বৈদ্যনাথে [?]। সেটা **১৯০৮ ফেব্রুয়ারি মাস।** দিঘিরিয়া পাহাড়ে সেই বোমা নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করার মুহূর্তে ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল। পাহাড়, বন, দিক-দিগন্ত কাঁপিয়ে ফেটে গেল যথাসময়ের পূর্বেই

ভীষণ বোমা। প্রফুল্ল নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলি হলেন বিদ্রোহী কিশোর। কেউ জানল না, কেউ শুনল না, কি করে একটি বালক-তাপস তাঁর আরব্ধ কর্ম সফল করতে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে আপন হৃৎপিণ্ড শত খণ্ড করে দান করে জননীর ঋণ শোধ করলেন !"

এখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। প্রথমত, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ঘটনা ও সময়ের ক্রমানুসারে গাণিতিক বিচার, ভাবাবেগের নয়। প্রথম মানে শ্রেষ্ঠতম নয়। দ্বিতীয় মানে প্রথম থেকে নিকৃষ্টতর নয়। সব শহীদ সমান শ্রদ্ধেয়। কিন্তু ইতিহাস লিখতে সময়, ক্রম ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ১ বা প্রথম একই, তারপর ২ দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। কেউ হেয় নয়। ভাবাবেশে আমিও তো স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের সবাকে একই সঙ্গে উচ্চারণ করতে চাই সমতুল শ্রদ্ধায় কিন্তু তাতে তো ইতিহাস লেখা হয় না। ইতিহাস দিন তারিখ মিলিয়ে ক্রমান্বিত ঘটনা-পরম্পরা। আজ আমাদের ইতিহাস চাই—ভাবাবেগ নয়। তা ঢের হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, একই ঘটনায় একই মামলায় বহু প্রাণ বিসর্জন হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই আছে: কানাই-সত্যেন থেকে লেবংয়ে গবর্নর এণ্ডার্সন হত্যা প্রচেষ্টা পর্যন্ত প্রচুর দৃষ্টান্ত। কিন্তু তারা ইতিহাসের যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত এবং বক্তধারার সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম। ভূপেন্দ্রকিশোরবাবু সেই বিন্যাসের রীতিকে মানলে একই সঙ্গে চারজনকে প্রথম করবার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন না।

তৃতীয়ত, ভূপেনবাবুর বর্ণনা মতো প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের "পূর্বযায়ী" আরও দু'জন শহীদ থাকলে প্রফুল্ল ক্ষুদিরাম এককভাবে হোক বা যুগ্মভাবে হোক প্রথম শহীদ হন না। "পূর্বযায়ীরাই" বহুবচনে প্রথম হন—দু'জন দু'ভাবে হলেও। পূর্বযায়ী-যুগলও প্রথম, পরবর্তীযুগলও প্রথম—যে যে-ভাবেই মৃত্যুবরণ করে থাকুন, ইতিহাসে তা গ্রাহ্য বা মান্য নয়।

চতুর্থত, সশস্ত্র অবস্থায় রেলে কাটা পড়ে যিনি আত্মবলি দিলেন, তাঁর নাম নেই, ধাম নেই, অন্য কোন পরিচয় বা স্মৃতিচারণায় তাঁর সংবাদ পাওয়া যায় না। এটি নতুন সংবাদ বা তথ্য। সুতরাং, এটি ইতিহাসে গ্রাহ্য হতে হলে আরও কিছু নির্ভরযোগ্য সমর্থক তথ্য চাই।

পঞ্চমত, প্রফুল্ল চক্রবর্তী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার তারিখ আছে কিন্তু ঘটনার বিবরণ সর্বতোভাবে ভুল ও বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে বিভ্রান্তিকর।

ষষ্ঠত, প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম মানিকতলা বাগানবাড়ি থেকে যান নি, উল্লাসকরের

ফরমুলায় প্রস্তুত বোমা নিয়েও যান নি। তখন ফ্রান্স থেকে হেমচন্দ্র দাস বোমা তৈরি শিখে এসেছেন। মজঃফরপুরে ওঁরা যে বোমা নিয়ে যান তা হেমচন্দ্র-উল্লাসের যুগ্ম সহযোগিতায় তৈরি। একান্তভাবে উল্লাসের ফরমুলায়ও নয়, ওটি বাগানবাড়িতেও তৈরি হয়নি।

শেষ কথা, প্রফুল্ল চক্রবর্তীব মৃত্যু "সবাব অলক্ষ্যে হয়নি," বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর, নলিনী গুপ্ত ও বিভূতিভূষণের দৃষ্টিগোচরেই তা হয়েছে, ঘটনার পবিণতির প্রত্যক্ষদর্শী উপেন্দ্রনাথও—যদিও ঘটনা মুহূর্তে তিনি ছিলেন না।"

আর যা কেউ জানল না, শুনল না, তা ভূপেন বাবু জানলেন কি করে?

ভূপেন্দ্রকিশোরের আর একটি প্রাসঙ্গিক ভুল, প্রফুল্ল চাকী রঙপুরের নন, বগুড়ার। প্রফুল্ল চক্রবর্তী অবশ্য রঙপুরের।

বিচিত্র ফেনিল ভাষায় সব চাইতে উদ্ভট তথ্য দিয়েছেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "অগ্নিযুগেব অগ্নিকথা"য়। তিনি "নাছোড়বান্দা" হয়ে বলেছেন [গ্রন্থের প্রারম্ভিক সমস্যা দ্রষ্টব্য], "অগ্নিকথা ঠিক ইতিহাস নয়, বরং গল্প।" গল্পই বটে। "এই সময়ে দল কোন কারণে কতকগুলো বোমা তৈরী কবে প্রফুল্ল চক্রবর্তি বলে একজন বিশ্বাসী কর্মীকে দিয়ে একস্থানে পাঠাবাব ব্যবস্থা কবল। প্রফুল্ল চক্রবর্তি তাজা বোমা নিয়ে পথে বেবিয়ে পডলেন। কিন্তু চক্রবর্তির আর দলের দুর্ভাগ্য-বশতঃ হঠাৎ পথের মাঝে বোমাগুলো ফেটে গেল। আর বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্তির পেশীবহুল দেহটাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। আহত আর জর্জরিত দেহপিঞ্জব থেকে প্রাণবায়ুটুকুও টুক করে বেরিয়ে গেল।

"দলের কাজ করবার আগেই দলের জন্য প্রফুল্ল চক্রবর্তি প্রাণ দিলেন। এই চক্রবর্তিব দলেব উপর নিষ্ঠাও যেমন ছিল অটুট, তেমনি তাঁর কাজ করবার সাহসও ছিল অদম্য। তাজা বোমা যে কোন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা কবে বোমার মালিকেরই জীবন ধ্বংস করতে পারে জেনেও তিনি দলের আদেশ পালন করবাব জন্য নির্বিকারচিত্তে বোমাগুলোকে নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন।

"দেশের জন্য অত্যাচারী শাসককে হত্যা করে চক্রবর্তি মনের সাধ পূর্ণ করে যেতে পারলেন না, কিন্তু দেশের জন্য দলের আদেশ নিজের জীবন দিয়ে পালন করে নিজের নশ্বর জীবনের গৌরব বাড়িয়ে গেলেন।

"অগ্নিযুগের ইতিহাসে দেশের কাজে আর দলের কাজে বাংলার বাঙালীদের মধ্যে প্রফুল্ল চক্রবর্তি সর্বপ্রথম রক্ততর্পণ করে **বাংলার প্রথম শহীদের** রক্ততিলক ধারণ করে চলে গেলেন।

"দলের প্রধান কেন্দ্র মুরারীপুকুর বাগানে যখন এই দুঃসংবাদ পৌছল, তখন সকলেই যেন শোকে আর দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন।" (পৃঃ ১৩৬-১৩৭)

দিঘিরিয়া পাহাড়ে সমস্ত ঘটনাকে উড়িয়ে দিয়ে সুশীল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় "কোন কারণে" "কতকগুলো তাজা বোমা" দিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে তো বাব করলেন। রাতে না দিনে, নির্জন অবণ্যপথে না লোকালয়েব রাজপথে তা বললেন না। "বোমাগুলো ফেটে গেল।" অন্য কোন পথচারী, পথিপার্শ্বে গৃহবাসী অথবা আব কেউ সঙ্গী ছিল কিনা খবব নেই। কে শুনেছে কে দেখেছে তাও লেখা নেই। খবব পৌছল মুরারীপুকুব বাগানে, কি করে বলা নেই, কিন্তু পুলিসের কানে বিস্ফোরণের শব্দ গেল না, "টুক করে প্রাণ বেবোবার" পব যে দেহ বা চূর্ণবিচূর্ণ অংশ তা নিয়েও পুলিশ মাথা ঘামালো না। এক অসম্ভব কাণ্ড! তবে **এই গল্পের একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে প্রথম শহীদ বলে স্বীকৃতি।**

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় কিছু ভিন্ন প্রকৃতির লেখক। বারীনবাবু-দলভুক্ত এবং অরবিন্দসহ গ্রে স্ট্রীটের একই বাড়িতে ধৃত প্রখ্যাত বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য নগেন্দ্রবাবুর "শহীদ যুগল" বইখানির ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যুসংক্রান্ত একটি উদ্ধৃতাংশ ভুল বলে জানিয়েছেন। অন্যথা নগেনবাবুর "শহীদ যুগল" বহু দুষ্প্রাপ্য, বিরল ও মূল্যবান চিত্র, আলেখ্য, উদ্ধৃতি ও ফ্যাকসিমিলিতে বেশ সমৃদ্ধ। নগেনবাবু নির্ভবযোগ্য মনে করে যে বইখানি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা অবিনাশবাবুরই ছোট ভাই উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা। নাম— "স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"। উদ্ধৃতিটি এই :

"উল্লাসকরের বোমা পরীক্ষা করিবার জন্য বাবীনবাবু, উপেনবাবু, অবিনাশ বাবু এবং উল্লাসকর এবং তাঁহার সহকর্মী প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে লইয়া দেওঘরে রোহিনী পাহাড়ে গমন করিলেন। সেখানে প্রফুল্ল চক্রবর্তী বোমাটি নিক্ষেপ করিবার ভাব গ্রহণ করিলেন এবং তাহাব নিকটে বহিলেন উল্লাসকর। বারীন বাবু, উপেনবাবু ও অবিনাশবাবু, কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বোমাটি দড়িব সাহায্যে পাহাড়েব নীচের দিকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু ফাটিয়া সেখানকাব পাহাড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া প্রবলবেগে উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে ক্ষতবিক্ষত কবিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িল। ইহাতে উল্লাসকরও গুরুতর আহত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কাজেই ইহারা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর শবদেহ সেখানে রাখিয়া উল্লাসকরের শুশ্রূষা

-করিবার জন্য তাঁহাকে কাঁধে করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসেন।…” (শহীদ যুগল, পৃঃ ১৭৩)।

অবিনাশবাবু তাঁর ভূমিকায় এই উদ্ধৃতির মধ্যে ভুল উল্লেখ করে বলেন, “দেওঘরের জঙ্গলে বোমা পরীক্ষার জন্য উল্লাসকর, বারীন, বিভূতি ও প্রফুল্ল চক্রবর্তী যায়।” অর্থাৎ উপেনবাবু ও অবিনাশবাবু যান নি। অথবা চারজন। বলা বাহুল্য, অবিনাশবাবুর এই বিবরণে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তর নাম বাদ! তাঁকে নিয়ে পাঁচজন। অবিনাশবাবু ভূমিকায় আবও বলেছেন, “শ্রীঅরবিন্দ, শৈলেন বসু ও আমি গ্রে স্ট্রীটের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তাব হই, বাগান থেকে নয়।…এরূপ আরও দুই চারিটি ভুল ভ্রান্তিব কথা এই পুস্তকে ‘উদ্ধৃত’ হয়েছে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর জীবনকথায় এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি না হওয়াই উচিত।…কোন কিছু উদ্ধৃত করবার পূর্বে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। তিনি বারীনবাবুব কিছু লেখাও উদ্ধৃত কবেছেন, তাতেও ভুল আছে। · অনেক কথা যা তিনি এখন বলছেন তা তাঁর ˙শোনা কথা।” অবিনাশবাবু এজন্য কাউকে দোষ দেন নি। তিনি বলেছেন, কারও ভুল উদ্ধৃতি বা বিববণেব ভুল ইচ্ছাকৃত নয়। “বহু দিনের কথা স্মরণে নাই।” সম্ভবত এমনি বিস্মৃতি কারণেই অবিনাশবাবুও বাগানের শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তব ঘটনাস্থলে উপস্থিতির কথা বলতে পাবেন ।ন। ঘটনাব বিবরণে সহোদর ভাইয়ের ও শ্রী গুপ্তব বিবরণে যে পার্থক্য তারও উল্লেখ করেন নি। কেননা, তিনি ঘটনাস্থলে নিজে উপস্থিত ছিলেন না।

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী তাঁর “অগ্নিযুগেব কথা”য় লিখেছেন: “জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম” (পৃঃ ১৫)। প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী বরবাদ!

হেমন্ত চাকীর “অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী”-তে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যুর খবর আছে, কিভাবে সে মৃত্যু ঘটেছে সে সংবাদ নেই। অবশ্য বইয়ের নামকবণেই শহীদ হিসাবে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর অস্বীকৃতি আছে।

সম্ভবত অজ্ঞতাবশত, হয়তো অনাবশ্যকবোধে, কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা দলগত নীরবতার ষড়যন্ত্রও হতে পারে, নিম্নোক্ত বইগুলোতে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর কিছুমাত্র উল্লেখ নেই:

‘আমার দেখা বিপ্লব” (মতিলাল রায়), ‘বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি’ (ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি), ‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ (ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত), ‘বিপ্লবের পথে’ (পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত), ‘বিপ্লবী জীবন’ (প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী), ‘বিপ্লবের পথে’

(সুবোধকুমার লাহিড়ী), 'বিপ্লবীর জীবন স্বপ্ন' (মনোরঞ্জন গুপ্ত), 'বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু' (বীরেন বসু), 'বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল' (মতিলাল রায়), 'বিপ্লবী বাঙলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস' (রাজেন্দ্রলাল আচার্য), 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়' (ফকিরচন্দ্র রায়), 'কর্মবীর রাসবিহারী' (বিজন বিহারী বসু), 'শহীদ ক্ষুদিরাম' (ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র), 'Aurobindo on Himself and on the Mother', (শ্রীঅরবিন্দ), 'বিপ্লবের সন্ধানে' (নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'জেলে ত্রিশ বছর' (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী), 'রক্তের অক্ষরে' (কমলা দাশগুপ্ত), 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' (গিরিজা শঙ্কব বায় চৌধুরী), 'বিপ্লবীর জীবন দর্শন' (প্রতুল গাঙ্গুলী), 'অগ্নিযুগের ব্রহ্মা' (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য), 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' (সুপ্রকাশ রায়), 'কারাকাহিনী' (অরবিন্দ ঘোষ), 'অগ্নিযুগের নায়ক' (অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ), 'বাংলায় বিপ্লববাদ' (নলিনীকিশোর গুহ), 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (অনন্ত সিং), 'মলঙ্গাব হাবু ও বডা কোম্পানীর অস্ত্র লুঠ' (সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), 'অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু' (বিনয় জীবন ঘোষ), 'বাংলাব বিপ্লব প্রচেষ্টা' (হেমচন্দ্র কানুনগো), 'বন্দী জীবন, এক ও দুই' (শচীন সান্যাল), 'বারীন্দ্রের আত্মকথা' (বারীন্দ্রকুমাব ঘোষ), 'অগ্নিযুগের কথা' (সতীশ পাকড়াশী), 'আন্দামানে দশ বছর' (মদন ভৌমিক), বিপ্লবী পুলিন দাস' (ভবতোষ রায়), 'স্বাধীনতার সন্ধানে' (যোগেশ চট্টোপাধ্যায়), 'Freedom Struggle and Anushilan Samiti' (edtd. by Buddhadev Bhattacharjee), 'বঙ্গভঙ্গ' (সমুদ্র গুপ্ত), 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' (ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত)।

গোষ্ঠী-মানসিকতায় কোন শহীদ-নামের অনুল্লেখ নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ, অজ্ঞতাও নিরপরাধ নয়। অজ্ঞতা নিয়ে ইতিহাস লেখার চেষ্টা বা কোন কথা বা ব্যক্তির ওপর জোর দেওয়াও অন্যায়। ক্ষুদিরামকে প্রথম শহীদ বা প্রফুল্ল চাকীকে প্রথম শহীদ বলে ঘোষণার মধ্যে সেই অন্যায় যে ঘটে উল্লিখিত বইগুলোই তার প্রমাণ। মতিলাল রায় মহাশয়ের রায় এই বিষয়ে সুস্পষ্ট : ক্ষুদিরামই প্রথম শহীদ, প্রফুল্ল চক্রবর্তী দূরস্থান, প্রফুল্ল চাকীও নন। কেননা, শেষোক্ত দুজনের রাজদণ্ডে জীবনাবসান ঘটেনি। যদি বিস্ফোরণে আহতাবস্থায় প্রফুল্ল চক্রবর্তী ধরা পড়তেন ও তাঁর মৃত্যুদণ্ড হত কিংবা প্রফুল্ল চাকী আত্মহনন না করে ধরা দিতেন, তারপর ব্রিটিশ বিচারালয়ে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ফাঁসী যেতেন তো তিনি মতিলাল রায়ের শহীদ সংজ্ঞায় পড়তেন ও কেবল-

তখনই হয়তো প্রথম হতে পারতেন। তা হন নি, যেহেতু তিনি নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজে দিয়েছেন। জানিনে এর মধ্যে যৌক্তিকতা কি। সম্ভবত এই মানদণ্ডের বিচারেই তিনি আরও একখানি বই লিখেছেন, তার নাম 'বিপ্লবী শহীদ কানাই-লাল'। কালীপদ বাগচীর 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী', হেমন্ত চাকীর 'অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী', ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রেব 'শহীদ ক্ষুদিবাম'—এই শ্রেণীর বই। বলেছি, নগেন্দ্রকুমাব গুহ বায়ের 'শহীদ যুগল' বইখানিব প্রকৃতি কিছু পৃথক।

(৪)

মতিলাল বায় মহাশয়েব বইয়েব ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত ডঃ কালিদাস নাগ (১৩৬৪)। তাতে তিনি লিখেছেন: "প্রধানত স্মৃতিব উপর নির্ভব করেই তিনি বোগশয্যা থেকে বলে গেছেন—কাবণ, 'অগ্নিযুগেব' অগ্নিপরীক্ষায় কাগজেব দলিল বক্ষা পায় না।" মতিলাল নিজেই ৮৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "ভুলভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক—স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া।"

তাঁব মত শ্রদ্ধাস্পদ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখে এ সবলোক্তি মানায় কিন্তু তাঁর মত মানুষের স্মৃতিবিভ্রম সরল বিশ্বাসী পাঠকেব পক্ষে মারাত্মক, সে তো তাই আপ্ত বাক্য বলে মেনে নেবে, যাচাই কবে নেবাব প্রশ্নই তাব মনে আসবে না। অথচ কি ধবণের স্মৃতিবিভ্রান্তি ঘটেছে তাব কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে তাঁব বইখানি কতটা নির্ভবযোগ্য হয়েছে। তিনি লিখেছেন, ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হল। আসলে সালটা ১৯১১। আবদুল রসুলকে লিখেছেন রসিদ, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনকে আবু হোসেন। লিখেছেন, "১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবব বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা কায়েম হয়।" প্রকৃত তারিখটি অতি সুবিদিত ১৬ অক্টোবর। বাংলা তাবিখটা অবশ্য ৩০ আশ্বিন (১৩১২)। বাবীন্দ্রকুমাবের স্বীকাবোক্তিতে (বা নবেন গোঁসাইব স্বীকাবোক্তিতে) চন্দননগবের মেয়ব তার্দিভেলের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ কাণ্ডে কানাইলাল বা মতিলালের থাকাব কথা নেই, অথচ মতিলাল (১৭ পৃষ্ঠায়) এমন আভাষই দিয়েছেন এবং ২১ পৃষ্ঠায় এমন কথা বলতে চেয়েছেন যে, প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুব রওনা হবাব আগে কানাইলালেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কানাইলাল অবশ্যই গোপীনাথ দত্ত লেনে নিরাপদ রায়ের সঙ্গে থাকতেন, এ বাড়ির সঙ্গে হেমচন্দ্র দাস ও উল্লাসকরের যোগাযোগ ছিল। প্রফুল্ল চাকী থাকতেন মুরারীপুকুর বাগানে।

ক্ষুদিরাম বাগানবাড়ির কেউ ছিলেন না। উল্লাসকর গোপীনাথ দত্ত লেন থেকে বোমা বোঝাই বাক্স হ্যারিসন রোডের বাড়ি নিয়ে যান এ খবরও পাওয়া যায়। কিন্তু কানাইয়ের সঙ্গে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের সাক্ষাৎ-বার্তা হেমদাসের গ্রন্থে, বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি বা গ্রন্থে অথবা কানাইয়ের গুণমুগ্ধ উপেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি বা গ্রন্থে নেই। অসম্ভব নয়, কিন্তু কোথাও এর সমর্থনও নেই।

মতিলাল ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "তাঁহারই (অর্থাৎ, কিংসফোর্ডেরই) গাড়ীতে চড়িয়া মিসেস কেনেডি কন্যাসহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।" এই উক্তি সর্বতোভাবে ভুল। কিংসফোর্ডের গাড়ি, এমন কি ঘোড়াও, হুবহু মিঃ কেনেডির গাড়ি ঘোড়ার মতো ছিল। মিসেস ও মিস কেনেডি নিজেদের গাড়িতে ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, ভ্রমণে বেরোন নি।

মতিলাল লিখেছেন: "দুইজন বিপ্লবী ধরা পড়িলেন। প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরাম।" পড়ে মনে হতে পারে দুইজন একই সঙ্গে একই জায়গায় ধরা পড়লেন। প্রথমত প্রফুল্ল ধরা পড়েনও নি ধরা দেনও নি।' তিনি ধরা পড়ার উপক্রমেই আত্মহনন করেন মোকামে স্টেশনে। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন আর এক জায়গায়, পৃথকভাবে, ওয়েইনি স্টেশনে।

মতিলাল প্রফুল্লর আত্মহননের ঘটনা যেভাবে বিবৃত করেছেন, এক নিঃশ্বাসে পড়ে মনে হবে প্রফুল্লর মৃত্যুবরণ ক্ষুদিরামের উপস্থিতিতেই হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "দুইজন বিপ্লবী ধরা পড়িলেন। প্রফুল্ল চাকি আর ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল চাকি ভীম অগ্নিনালিকা বাহির করিয়া নির্দেশমত মুখগহ্বরে তালুতে লক্ষ্য করিলেন। ভীষণ গর্জনে তালু বিদীর্ণ করিয়া গুলী ছুটিল। তিনি ধরাশায়ী হইলেন।" ক্ষুদিরাম কি করলেন? তা বললেন না।

আর, প্রফুল্লর মৃত্যু বা আত্মহনন ঠিক ঐভাবে হয়নি। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের বইয়ে আছে বটে যে, "প্রফুল্ল রিভলভার হাতে নিয়ে বলত, 'ধরা পড়লে আমি কিন্তু বেঁচে থাকতে চাইব না, পুলিসের অত্যাচারও সহ্য করব না, কিম্বা স্বীকারোক্তির প্রলোভন কাছে আসতে দেব না, দেখ, এই রকমে দেব নিজেকে শেষ করে' বলে, হা-করে, মুখের ভিতরে পিস্তলের নলটা ঢুকিয়ে দিত আর ঘোড়া বা ট্রিগারটায় আঙুলের চাপ। আরও বলত, 'এই রকমটাই sure'··"। কিন্তু ঘটনাটি ঠিক এই রকমে হয়নি। মোকামে স্টেশনে নন্দলাল ব্যানার্জীর চক্রান্তে কনস্টেবল-বাহুবন্ধনে বেষ্টিত দৃঢ়পণ প্রফুল্লকুমার চাকী আত্মহননে যেভাবে কঠিন স্বহস্তধৃত ব্রাউনিং পিস্তলটি ব্যবহার করেছিলেন তার বর্ণনা

একেবারেই পৃথক ও অনন্যসাধারণ। প্রফুল্লকে জীবন্ত গ্রেপ্তার-প্রচেষ্টাব মূল নায়ক, সিংভূমের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি এবং এক্ষেত্রে নন্দলালের সঙ্গী আব এক সাব-ইন্সপেক্টর শর্মার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই বেশি নির্ভরযোগ্য; কেননা, তাবাই অতি-ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষদর্শী, মতিলাল নন বা অন্য কোন প্রত্যক্ষদর্শীও তাঁকে বলে নি। নন্দলাল বহু কথাব মধ্যে ঠিক আত্মহনন সংক্রান্ত কাহিনীতে বলেছে, "আমি মনঃস্থিব কবে ফেলেছি যে, তাকে গ্রেপ্তার কবব। স্টেশন মাষ্টাবেব কাছে দুটি লোক চাইলাম। তাবা তক্ষুনি এল। বেরিয়ে আসতেই এস-আই শর্মাব সঙ্গে দেখা। মজঃফবপুবেব পুলিস সাহেবেব কাছ থেকে একটা তারও পেলাম। তাবটি পডবাব পর ঐ তরুণটিকে বললাম, 'আমি তোমায় সন্দেহ কবি' বলে যেই ধরতে গেছি অমনি সে দৌড দিল। আমি হৈ হৈ কবে উঠলাম। রেলেব পুলিস কনস্টেবলবা বিপরীত দিক থেকে দৌড়ে এল। দুটো গুলিব আওয়াজ শুনলাম, দেখি, একজন বাঙালি গুলি ছুঁড়ছে এবং এক কনস্টেবল তাকে ধবে ফেলেছে। এস-আই শর্মাব সঙ্গে যে কনস্টেবল ছিল সেও তাকে ধরেছে। এবপব আবাব দুটি গুলির শব্দ এবং সন্দেহভাজন লোকটি মারা গেল।" (অমৃতবাজাব পত্রিকা, ২২মে ১৯০৮) সুচতুর নন্দলালেব ঘটনাটি অতি-সবলীকরণের দুশ্চেষ্টা এস-আই শর্মা ভেঙে দিয়েছে। শর্মাব সাক্ষ্য এই: শাদা পোষাকে দশজন কনস্টেবল নিয়ে মোকামে স্টেশনেব দিকে এগোতে এগোতে প্রত্যেক স্টেশনে দু'জন কবে কনস্টেবল নামিয়ে দিতে লাগলাম। সমস্তিপুরের রেল পুলিসকেও নজব রাখবাব নির্দেশ দিতেও আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। মোকামে পৌছে ২ মে আমি মোকামেঘাটেব সাড়ে দশটার গাড়িব জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম নন্দলাল ব্যানার্জি একটি তরুণ বাঙালিব সঙ্গে ট্রেন থেকে নামছেন। আমি শাদা পোষাকে ছিলাম। আমি জি আব পিতে নন্দলাল ব্যানার্জিকে লেখা এবটি 'তাব' পেলাম। যার উদ্দেশে ঐ 'তাব' সে আসবার আগেই ওটি আমাকে দেওয়া হল। বাঙালি তরুণটি নন্দলালেব পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার সর্বাঙ্গে নতুন পরিচ্ছদ। ইতিমধ্যে নন্দলাল তাবটি পড়ে ফেলেছে এবং তরুণটিকে বলল, 'আমি তোমায় সন্দেহ কবি এবং আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলাম।' শুনেই তরুণটি যেন প্ল্যাটফর্মের পশ্চিমপানে ছুট দিল। আমিও কনস্টেবল শিবশঙ্করকে নিয়ে ওর পেছন ছুটলাম। নন্দলালকে লক্ষ্য কবিনি। শিবশঙ্কর তরুণটিকে ধরে ফেলল এবং আমাব মোটা লাঠিটা দিয়ে তরুণটির কাঁধে বাড়ি মারিল। তারপর গুলির শব্দ, দেখি

বাঙালিটির হাতে পিস্তল। **কনস্টেবল জামির আমেদ আর এক দিক থেকে আসছিল। সে তাকে পেছন থেকে ধরল এবং শিবশঙ্কর তাকে জাপটে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমেদও এল। শিবশঙ্কর ও জামির এক সঙ্গে ধরল। তরুণটির হাত দুটো বুকে চেপে বসেছে। এইভাবে ধরা পড়ার পর তরুণটি পর পর অতিদ্রুত দুটি গুলি ছোঁড়ে। তরুণটি মরে গেল।** তার বুকে একটি, ঘাড়ের তলায় আর একটি গুলির আঘাত চিহ্ন দেখলাম।"

সুতরাং, বাগানবাড়িতে নলিনীকান্ত গুপ্ত মশাই-কথিত প্রফুল্লর আত্মহননের মহড়া ও মতিলাল রায় মশাই-কথিত ঐ পদ্ধতিতে প্রফুল্লর আত্মহনন হয়নি।

মতিলাল লিখেছেন: "নিশ্চয়ই পুলিসের পাশবিক অত্যাচারে তাহার মুখের যেটুকু স্বীকারোক্তি বাহির হইয়াছিল, তাহার ফলেই পরদিন প্রভাতেই ২রা মে মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করিয়া ৩৪ জন বিপ্লবীকে ধরা হইল।"

পক্ষান্তরে, বারীন্দ্রকুমার তাঁর প্রাথমিক স্বীকারোক্তিতে স্পষ্টতই বলেছেন: "ক্ষুদিরাম মানিকতলা বাগানবাড়ি বা গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ির খবর রাখত না। আমরা বাইরের কাউকে বিশ্বাস করতাম না।" ক্ষুদিরাম বাইরের লোক কি করে হলেন? প্রথমত, ক্ষুদিরাম কখনও মানিকতলা বাগানবাড়ি যান নি, থাকেন নি। মানিকতলা বাগানবাড়ির লোক ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। বারীন্দ্রকুমার ঐ স্বীকারোক্তিতে বলেছেন: "প্রফুল্ল চাকী জেদ ধরল, সে বোমা ফেলে কিংসফোর্ডকে মারবে। হেমচন্দ্র ও উল্লাস ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে [মুরারীপুকুর বাগানবাড়িতে নয়] একটা হাতলওলা বোমা তৈরি করলেন। আমি ও উপেন্দ্রনাথ সায় দিলাম। হেমচন্দ্র ক্ষুদিরাম বসু বলে মেদিনীপুরের একটি ছেলের নাম সুপারিশ করলেন। তাকে যেতে দেওয়া হল।" সুতরাং, ক্ষুদিরামের পক্ষে বাগানবাড়ির কোন কথা বলা সম্ভব ছিল না।

ক্ষুদিরামের উপর পুলিসের "পাশবিক অত্যাচারের" কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। ক্ষুদিরাম ওয়েইনি স্টেশনে জিতুরামের দোকানে মুড়ি খেয়ে জলপানের সময় ধরা পড়েন সকাল সাতটা নাগাদ। খবর পেয়ে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর্মস্ট্রং ২-২৫ মিনিটের ট্রেন ধরে সেখানে পৌছান। চারটের ট্রেন ধরে সাড়ে ছয়টায় মজঃফরপুরের স্টেশন ক্লাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যানের কাছে হাজির করেন। তাঁর কাছে ক্ষুদিরাম যে প্রথম বিবৃতি দেন তাতে "পুলিসের পাশবিক অত্যাচারের" কোন নালিশ নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের চোখে পড়বার মতো কোন

আঘাতচিহ্নও ছিল না। ক্ষুদিরাম দ্বিতীয় বিবৃতি দেন দায়রা-সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্থউডের কাছে। এই দুই বিবৃতির মধ্যে কিছু কিছু তথ্যগত পার্থক্য আছে; কিন্তু কোনটিতেই পুলিসী অত্যাচারের কোন কথা নেই। দায়রা জজ মিঃ কার্নডফের কাছেও অত্যাচার-জনিত বিবৃতি প্রত্যাহারের সুযোগ ছিল, ক্ষুদিরাম সেখানেও কোন প্রকার পীড়নের কথা বলেন নি। পক্ষান্তরে, তার মূল বক্তব্য একই ছিল।

বিবৃতিগুলো থেকে বোঝা যায়, ক্ষুদিরাম "নিশ্চয়ই পুলিসের পাশবিক অত্যাচারে" স্বীকারোক্তি করেন নি, যা করেছেন স্বেচ্ছায় করেছেন এবং "তাঁহার ফলেই পরদিন প্রভাতে· ·মুরারীপুকুর ঘেরাও" হয়নি। কেবল তো মুরারীপুকুর নয়, হ্যারিসন রোড, গ্রে স্ট্রীট, নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, শ্রীরামপুর ইত্যাদি—স্থানের কোন খবরই তো জানতেন না, একই সঙ্গে এসব জায়গায় পুলিস হানা দিল কি করে? আর, মুরারীপুকুর বাগান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-উল্লাস প্রমুখ চোদ্দজনকে, মতিলাল-কথিত ৩৪ জন নয়। ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড থেকে **পাঁচ জনকে**, ৪৮ নং গ্রে স্ট্রীট থেকে শ্রীঅরবিন্দ সমেত **তিন জনকে**, ৩৮।৪ নবকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে হেমচন্দ্র দাসকে (মানে, **এক জনকে**); ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে কানাইলাল সহ দুই জনকে। শ্রীরামপুরে নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইকে। অন্যত্র আরও কয়েকজনকে। অর্থাৎ প্রথম কিস্তিতে বাগানবাড়ি ও অন্যান্য ঠিকানা মিলিয়ে মোট ৩১। ম্যাজিস্ট্রেট একজনকে (এক মালীকে) ছেড়ে দেন। দ্বিতীয় কিস্তিতে ধরা পড়েন আরও ছয়জন। ৩০+৬==৩৬। দেখা যাচ্ছে, মতিলাল যে বন্দীসংখ্যা দিয়েছেন তা তথ্যসম্মত নয়।

ক্ষুদিরাম সম্পর্কে তিনি আরও যে একটি খবর দিয়েছেন তা যতখানি চমকপ্রদ ততখানি ভিত্তিহীন। তিনি বলেছেন: কলিকাতার বহু ব্যবহারজীবীর সহিত পরামর্শ করিয়া ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা হইল। জেলে কয়েদীর সহিত সাক্ষাৎকার করার সুযোগ লইয়া উকিল ক্ষুদিরামকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার কথা জানাইলেন। ক্ষুদিরাম বারের ন্যায় পুলিসের নিকট সকল উক্তি প্রকাশ্যে অস্বীকার করিলে ইংরাজ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন।"

চরম বিস্ময় এই যে, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে দায়রা জজের আদালতে শুনানির কোন পর্যায়ে এ বিবরণ পাওয়া যায় না, হাইকোর্টের সওয়ালেও এর কোন উল্লেখ নেই। বস্তুত, ক্ষুদিরাম স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে এবং পুলিসী অত্যাচার

বিন্দুমাত্রও প্রতিপন্ন হলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়াত। ক্ষুদিরাম নিজে অপরাধ স্বীকার না করলে ও যথার্থ সুবিচার হলে ক্ষুদিরাম যে আদৌ আততায়ী বা আততায়ীর সঙ্গী তা প্রমাণ করতে সরকারপক্ষকে সবিশেষ বেগ পেতে হত, তা একরকম অসম্ভবই হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে, ম্যাজিস্ট্রেট-স্তরে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন উকিল ছিলেন না। সন্ত্রস্ত স্থানীয় উকিলেরা সাহসই পান নি। ফলে, নিয়মমতে ম্যাজিস্ট্রেট বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে চান কি না বললে ক্ষুদিরাম নিজেই ছেলেমানুষের মতো সংশ্লিষ্ট এক কনষ্টেবলকে এমনভাবে জেরা করেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এইভাবে প্রশ্ন করে তিনি নিজেই নিজেকে অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবেন। দায়রা-বিচার-স্তর থেকে ক্ষুদিরাম আইনজীবীর সাহায্য পান, কিন্তু যা অনিষ্ট হবার হয়েছে এবং দায়রা বিচারকালেও অপরাধ-স্বীকার প্রত্যাহার করেন নি। দায়রা জজও ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তির উপরে নির্ভর করতে চান নি, তাহলে মামলা সংক্ষিপ্ত হত, অত সাক্ষ্যসাবুদের মধ্যে না গেলেও চলত। দায়রা জজ স্বীকারোক্তি যথাযথ গ্রহণ না করে রীতিমত মামলা শুনেছেন। কিন্তু মামলার প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তিই মামলার পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করেছে, হাইকোর্টের অত ভালো সওয়ালও তার মোড় ঘোরাতে পারে নি। অতএব ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার সম্পর্কে মতিলাল যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে প্রকৃত তথ্যের কোন মিল নেই।

মতিলাল বলেছেন: "মানিকতলা বাগানে হেমচন্দ্র দাস বোমা প্রস্তুত করিতেন।" পক্ষান্তরে, হেমচন্দ্র দাসের যে-তিনটি আস্তানার খবর হেমচন্দ্রই তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন তার মধ্যে মানিকতলার বাগানবাড়ি নেই। একটি ভবানীপুরে, একটি গোপীমোহন দত্ত লেনে, আর একটি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে। "মুরারীপুকুর বাগানে সাধন-ভজন compulsory ছিল।" (বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র দাস, পৃঃ ২৩৭)।

হেমচন্দ্র তাঁর ঐ বইয়ে আরও লিখেছেন: "বাগানবাড়ীর অনেক অসুবিধা ছিল। নতুন লোক গেলে লোকের নজরে পড়ত (পৃঃ ২৩৭)। ঘনবসতি অঞ্চলে কোন বাড়ীতে বোমা তৈরির আড্ডা বসাতে বারীনকে রাজী করানো গেল (পৃঃ ২৩৮)। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কর্ণধার যাঁরা তাঁরা নারায়ণগড় সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে নামক একজন ভারতীয় পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টরকে বিশেষভাবে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছিলেন (পৃঃ ২৩৯)।

বজনী মিত্র কি ঐ নামের একজনকে দেশেব জন্য বিগলিত প্রাণটা উৎসর্গ কবতে ক বাবুর কাছে নাকি পাঠান হয়েছিল। তিনি মুরারীপুকুবে বাবীনবাবুর কাছে তাকে পাঠান। বাবীন ঐ রজনীকে আনন্দমঠের সত্যানন্দ কায়দায় সম্মোহিত কববাব জন্য কোথায় বোমা মজুত ছিল, কোথায় রিভলভাব, কোথায় রাইফেল, কোথায় বোমাব খোল ঢালাই হয় দেখাতে লেগে গেল। সে কিন্তু আর দ্বিতীয়-বার বাগানে আসেনি। কিন্তু যাবা বাগানে যাতায়াত কবেছিল তাদের পেছনে বা বাগানেব মানুষবা যেখানে যেখানে যেত সেইখানেই পুলিশের চব বিবাজমান থাকত।" (পৃঃ ২৪০)।

হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) বাবীন্দ্র-বিপ্লবী-গোষ্ঠিব অন্যতম নায়ক, বোমা-বিশেষজ্ঞ এবং মানিকতলা বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলাব অন্যতম প্রধান সাবিব বন্দী ও আন্দামান ফেরত। তাঁব এই বিবরণের পব মতিলাল বায় যে বলেছেন, পুলিসেব "পাশবিক অত্যাচাবে" ক্ষুদিবামেব স্বীকাবোক্তিব ফলে মানিকতলা বাগানে তল্লাসী হয় এ কথাটি একেবাবেই অবান্তর হয়ে পড়ে। মানিকতলা বাগানবাড়িব আবিষ্কাব ও তাব লোকজনের গতিবিধি ক্ষুদিবাম ধবা পড়ার আগেই পুলিসেব খাতায় 'বিবাজমান' ছিল।

বাগানবাড়িতে বোমা তৈবিব কথাও ঠিক সেভাবে কানুগোব বইয়ে নেই, বাগানবাড়িতে যা ছিল তা তিনি অবশ্যই বলেছেন আর বলেছেন : "ভবানীপুরে ১৯০৮ মার্চেব মাঝামাঝি [খেয়াল বাখা দবকাব, উল্লাসেব বোমা পবীক্ষা-নিবীক্ষাব মাস দুই তিন পব] একটা বাড়িতে বোমা শেখানো আবম্ভ হল। চাব পাঁচজন ছাত্র জুটেছিল। তাব মধ্যে কানাইলাল। আব ছিল শ্রীমান ইন্দুভূষণ বায়। আব নিবাপদ ওরফে নির্মল বায়" (পৃঃ ২৪০)।

'ভবানীপুবেব আড্ডা তুলে দিতে হয়েছিল। সি আই ডি পেছনে লেগেছিল। পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ও এক ভৈববী।"

তাবপর "গোপীমোহন দত্ত লেনেব বাড়ি। ভবানীপুব থেকে মালপত্তব নিয়ে আসতে গাডী ও লোকজন ছাডাছাড়ি। সকাল দশটা থেকে খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যে-বেলা শ্যামবাজার পুলেব কাছে (পাওয়া যায়)। এখানেও (অর্থাৎ গোপীমোহন দত্ত লেনেও) সকাল-সন্ধ্যে গোয়েন্দা পাহাবা। (পৃঃ ২৬৫)

"গোপীমোহন দত্ত লেনে যে তিনটি বোমা তয়েব হয়েছিল তার একটা পরীক্ষা করে দেখা হল আশানুরূপ কাজ দেবে।" (পৃঃ ২৬৬)। কোথায় ও ঠিক কবে সে পরীক্ষা হয়েছিল তার উল্লেখ নেই।

"পুলিশ যে আমাদেব পেছনে লেগেছে তা কিন্তু বারীনকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নি। ক বাবুও বাবীনকে সাবধান হতে বলেছিলেন। বারীন সবার কথাই উডিয়ে দিয়েছিল। বারীন অন্যকেও সতর্ক হতে দিল না। মুরারী-পুকুর বাগানে যেখানে যেমনটি ছিল সেখানে তেমনই বইল। গোপীমোহন দত্ত লেনে বইল কানাই, নিরাপদ।" (পৃঃ ২৬৮)

হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর মতো একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি যেখানে এসব কথা বলেছেন সেখানে এটা নিঃসংশয় যে, ক্ষুদিবামেব উপরে "পুলিসের পাশবিক" অত্যাচাবে **স্বীকারোক্তির ফলে তল্লাসী হয়েছে** এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই আবেগচালিত অনুমান মাত্র।

(৫)

কিন্তু হেমচন্দ্র দাসও তাঁর বইয়ে সঙ্গীদের সম্পর্কে যেসব মন্তব্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন তা প্রথম পথিকৃৎ বিপ্লবীদের প্রতি সুবিচার বলা চলে না। অপ্রিয় হলেও অনেক স্পষ্ট অভিযোগ আছে। কিছু নৈবাশ্যেব বিরূপতা আছে। আবাব অপছন্দ ব্যক্তিব অনুল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁব দুটি গুণ: (১) বারীন্দ্র প্রমুখেব মতো তাঁদেব অনুরোধ এবং পুলিসেব প্রলোভন বা ভীতি-প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি কোন স্বীকাবোক্তির প্রস্তাব দৃঢতাব সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। (২) বোমা প্রস্তুত ব্যাপাবে তিনিই ছিলেন বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তাঁব বাংলাব বিপ্লব প্রচেষ্টা গ্রন্থটি তথ্যের আকব না হয়ে বিদ্বেষেব আকব হয়ে উঠেছে। নলিনীকিশোর গুহ তাঁব "বাংলায় বিপ্লববাদ"-এ তাব সঙ্গত আপত্তি জানিয়েছেন।

নলিনীকিশোব গুহ তাঁব বইয়েব ২০৩ পৃষ্ঠা থেকে ২১১ পৃষ্ঠা অবধি ব্যাপ্ত হেমচন্দ্রেব জবাব দিয়েছেন, এটি তাঁবই সম্পাদিত সাপ্তাহিক "সোনার বাংলা" থেকে সংক্ষিপ্ত পুনরুদ্ধৃতি:

"বিপ্লবীদলেব সঙ্গে হেমবাবুব পবিচয় অতি সামান্য। ১৯০৮ সালে ধৃত হন। তাবপব যান দ্বীপান্তবে। সেখানে নিজ 'দুষ্কৃতিব' ফল ভোগ কবিয়া ১৯২০ সালে রেহাই পান। তিনি যাহা কবিয়াছেন—সেই ভুল—সেই ভুলের অনুতাপ, ভুলের জন্য সঙ্গীদের উপর বিদ্বেষই সমস্ত পুস্তকে ছড়ান। তিনি গুন কয় বিপ্লবী কর্মীর কথা আলোচনা কবিয়া প্রমাণ করিয়াছেন আমাদের জাতীয় চরিত্র। গ্রন্থকার বাবীনবাবু ও 'ক' বাবুর আলোচনাতেই সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের সমালোচনা

বলিয়াছেন। কারণ 'এঁরা দুজনই আদি গুরুদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সবচেয়ে দেশপূজ্য ও আদর্শ বলে গণ্য।'

"'ক' বাবু ওরফে অরবিন্দবাবু দেশপূজ্য, বিপ্লবী বলিয়া নহেন, কেন সে কথা শিক্ষিত বাঙালী জানেন। বারীনবাবুকে 'দেশপূজ্য' বা 'আদর্শ পুরুষ' বলিয়া দেশের লোক মানে—ইহা আমরা জানি না। তবে বিপ্লবযুগের অন্যতম পাইওনিয়ার বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। এই যে কানুনগো মহাশয় জাতির ও বিপ্লবীদের নিন্দারূপ অপকার্য করিতেছেন—তাঁহাকেও লোকে তেমনি অন্যতম পাইওনিয়ার বলিয়া গণ্য ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বাংলার বিপ্লব চেষ্টায় ১৯০৮ সালের পর ১৯১৫-১৬-১৭ সালে এবং পরে যে সকল কর্মী দেখা দিয়াছেন—তাঁহারা কর্মী হিসেবে,—ত্যাগী হিসেবে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখাইয়াছেন। মৃত ও দণ্ডিত বহু ব্যক্তির নাম করা যায়—যাঁহারা কি ত্যাগ, কি সাহস, কি শৃঙ্খলা, কি সঙ্কল্প, কি বিপ্লবনিষ্ঠা, কি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় হেমবাবুর বর্ণিত 'ফাঁকিবাজ ধোঁয়াটে' নহেন।...আমরা বলি না বা বিশ্বাস করি না যে, তিনি যে সকল বিপ্লবীর কুৎসা কীর্তন করিয়াছেন তাঁহারা সবাই হুবহু ঐ রকমই।...আমরা অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মী দেখিয়াছি যাঁহারা নাম চান নাই—'মন্ত্রগুপ্তি যাঁহাদের ছিল ব্রত পালনের মতো। দ্বীপান্তর গিয়া বা জেলে গিয়া ইঁহাদের মত বদলায় নাই।'

"হেমবাবু লিখিয়াছেন আলিপুর মামলায় নাকি অনেকেই গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে ব্যস্ত, খালাস পাইবার জন্য দোষ স্বীকারে ব্যস্ত—এবং ইহাই সমগ্র বিপ্লবীদের স্বভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিন্তু [এখানে নলিনীবাবু একের পর আর মামলার দৃষ্টান্ত তুলে দেখিয়েছেন] এঁরা কেউ একরার করেন নি, খালাস পাবার জন্য ব্যস্ত হন নি, দীর্ঘ দণ্ড, অপরিমেয় দুঃখ বরণ করেছেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, সোনারঙ্গ মামলা, রাজেন্দ্রপুর, নড়িয়া, বাহ্রা ডাকাতি, রাজা-বাজার বম্ কেস, বড়া আর্মস কেস, দক্ষিণেশ্বর বম কেস, গৌহাটি গুলি মামলা, পাবনা গুলি মারা মামলা ইত্যাদি। বহু ব্যক্তিরও নামোল্লেখ করেছেন: লক্ষ্ণৌয়ে সুশীল লাহিড়ী, চারুচন্দ্র বসু, যতীন রায়চৌধুরি; 'প্রথম দু'জনের ফাঁসি, তৃতীয় জনের কারাদণ্ড।' কেউ কিছু বলেন নি। আরও অনেক নামের মধ্যে আছে, যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পূর্ণ দাস, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, নরেন সেন, ভূপতি মজুমদার, প্রতুল গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, গিরিন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি সেন, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ,

রমেশ চৌধুরি, সুরেশ দাস, জীবনলাল চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত, বালেশ্বর যুদ্ধের যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ, নলিনী বাগচী, প্রবোধ দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়।"

হেমচন্দ্র দাস সব চাইতে বেশি অবিচার করেছেন প্রফুল্ল চাকী সম্পর্কে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম অথবা ইস্টবেঙ্গল এণ্ড আসামের বীভৎস চরিত্র স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারেব বধ-প্রচেষ্টায় প্রফুল্লব নাম দেখা যায়। কিন্তু হেমচন্দ্র ঐ কাজের ব্যর্থতা নিজের গা থেকে অনায়াসে ঝেড়ে ফেলে বারে বারে প্রফুল্লর নামটি উচ্চারণ করে গেছেন। তারপর সকলেব যোগ্যতা সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ নিয়ে গেলেন ফ্রান্সে (আগস্ট ১৯০৬)। সেখানকার ক্রিয়াকর্মেব বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেব ডিসেম্বরে নেপলস বন্দর থেকে স্বদেশ বওনা হন। তাঁব মতে বাংলায় বোমাব সূচনা নাবায়ণগডে (এখানে বাঙলার লেঃ গবর্নর স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবাব চেষ্টা হয়েছিল) এবং এইটিই সম্ভবত গোপীমোহন দত্ত লেনে "যে তিনটি বোমা তয়ের হয়েছিল" তাব পবীক্ষার বোমাটি। হেমচন্দ্র নিজে অবশ্য স্পষ্ট কবে বলেন নি। পক্ষান্তবে, অভিযোগ করেছেন, "আমার বিলেতে অর্জিত বিদ্যেটা চটপট মেরে নিতে (বারীন) উল্লাসভায়াকেও পাঠিয়েছিল (পৃঃ ২৩৫)।"

হেমচন্দ্র দাস লিখেছেন: "বোমা দিয়ে মানুষ মাববার কেবদানি শেখাবার জন্য বারীনের কাছে দু'একটি যুবক চেয়েছিলাম। প্রথমে পাঠিয়েছিল শ্রীমান সুশীলকে। সেই সঙ্গে **কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার আদেশ দিয়েছিলেন কর্তারা।** সাহেব কোন্ হোটেলে থাকেন, কোন্ পথে কখন আদালতে যান, কোন্ পথে আসেন আব শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়—গোয়েন্দা বিভাগের আসল মালিক—কোথায় থাকেন, সন্ধ্যার পর কোথায় যান, তাঁব গতিবিধি ইত্যাদি অনুসন্ধানের কাজে সুশীল যেরকম বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল, তা দেখে মনে হয়েছিল এমন ছেলে বেঁচে থাকলে একজন প্রকৃত নেতা হবে। তবে কেন এরূপ নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যাপারে ভবিষ্যতের আশাস্থল এমন একজনকে বারীন মনোনীত করল? কাবণ সে (সুশীল) নাকি বাগানে নাক টেপাটেপির ফলাফল সত্য কথায় প্রকাশ করে ফেলত। কাজেই তার নাম খরচের খাতায় উঠেছিল।

"বাগানে দুই স্তরের কর্মী: নাক টেপায় বিশ্বাসী, তাঁরাই উচ্চস্তবের এবং যোগ্য। নাক টেপায় সন্দিহান বা শ্রদ্ধাহীন, তারা নিম্নস্তরের (পৃঃ ২৫৭)। সুশীলের বিচারক নিহত হলে জিনিসটা অন্যভাবে গৃহীত হবে বলে তাকে বিদায়

দিয়ে মানিকতলার আড্ডা থেকে আর একজন নিম্নস্তরের কর্মীকে আনা হয়েছিল (পৃঃ ২৬২)।

বলা বাহুল্য, এই নিম্নস্তরের কর্মীটি প্রফুল্ল চাকী। এও বলা বাহুল্য, হেমদাস ১৯০৬এর আগষ্ট থেকে ১৯০৭এর ডিসেম্বর অবধি তো বটেই, ১৯০৮এর জানুয়ারি পর্যন্ত যোগবিচ্ছিন্ন ছিলেন, কেননা, ঐ সময়ের বেশির ভাগ সময় তিনি প্রবাসে ও অন্যত্র ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে বাগানবাড়িব কেউ ছিলেন না। অনেকটাই অনুমান ও শ্রুতিনির্ভর বলে প্রফুল্ল সম্পর্কে হেমদাসের কথা ষোল আনা গ্রহণ-যোগ্য নয়। প্রফুল্ল চাকী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ক্রিয়াকর্মে কি ও তাঁর কতখানি যে, ভূমিকা ছিল তা বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশ। পরম বিস্ময়ের বস্তু এই হেমচন্দ্র দাসের বইয়ে প্রফুল্ল চাকীর প্রতিশ্রুতিমতো আত্মহননেব শৌর্য সম্পর্কে একটু কোন প্রশংসাবাক্যও নেই। নিজে যা পারেন নি, প্রফুল্ল তা পেরেছেন বলে একটু কৃপণ প্রশংসাও তো করতে পারতেন ?

হেমচন্দ্র দাস বাগানের বিপ্লবী-গোষ্ঠীর আত্মানুশীলন বা আত্মোপলব্ধির চেষ্টাকে যে 'নাক টেপাটেপি'র কটাক্ষে কৃত্রিম প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তার বিপরীত এক সংবাদ পাওয়া যায় নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের ভাষায় নির্যাতিত বিপ্লবী অমর নন্দীর 'বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী' শিরোনামার গ্রন্থে। গুহ রায় মশাই তাঁর 'শহীদ যুগল'-এ ঐ বই থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা এখানে অতি সংক্ষেপে পুনরুদ্ধৃত হল : "এই সম্পর্কে তাঁহার এক ভগিনী-পতির সহিত শ্রীঅমর নন্দীর যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রফুল্লর জ্যেষ্ঠা সহোদরা কুসুমকামিনী দেবীর স্বামী বগুড়া সহরের অধিবাসী শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার। অমরবাবু লিখিয়াছেন : 'তিনি একদিন লেখকের সঙ্গে প্রফুল্লর কর্মাবলীর আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, সেই মহৎ জীবনের কতটুকুই বা জানি, কী-ই বা বলব। চল্লিশ বছর আগে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, আমার বয়সও আশীর কাছাকাছি।...সেদিন হঠাৎ গীতাব প্রসঙ্গ উঠল। আমি ভাবছিলাম, ছেলেমানুষ, ও আবার গীতার আলোচনা আমার সঙ্গে কী করবে ? কিন্তু আমার ধারণায় যে কত বড ভুল ছিল সেদিন বুঝলাম।..বিশেষতঃ অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকের সে এ রকম সুন্দর ব্যাখ্যা করে যেতে লাগল যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই আলোচনায় কেটে গেল। প্রফুল্লর দিদি খাওয়ার জন্য দুইবার ডেকে গেলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি। প্রফুল্ল আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে চলেছে। কথা শুনতে শুনতে

আমার চোখের সামনে প্রফুল্লর জীবনের একটা অংশের আবরণ যেন খসে পড়ল। বুঝতে পারলাম, এ শুধু ওর মুখের বুলি নয়, ওর প্রাণের কথা। আরও বুঝলাম যে জীবনে একটা কঠোর ব্রত ও গ্রহণ করেছে। সে ব্রত দেশের সেবা। দুঃসহ কর্তব্যের ভার সে নীরবে বহন করেছে। অন্তরে ওর শক্তি যোগাচ্ছে গীতার ধর্ম।" (পৃঃ ১৭৭)

প্রফুল্লর গীতাপাঠ সম্পর্কে প্রফুল্লর বিপ্লবী সহকর্মী বিভূতিভূষণ সরকার একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। 'শহীদ যুগলে' উদ্ধৃত (পৃঃ ২৪৬)। গল্পটি এই :

"মুরারীপুকুরের বাগানে থাকা কালে একদিন প্রফুল্ল বাগানের একটি গাছে উঠিয়া বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছিল। গীতা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—'আমি কি তা জানা দরকার। যদি এখন নীচে পড়ে যাই, তাহলে বুঝতে পারব শরীরের ধর্ম কি।' এই বলিয়া সে নীচে পড়িয়া গেল এবং ব্যথা পাইল। তারপর বলিল—'শরীরের ধর্ম আঘাতের অনুভূতি'।"

পক্ষান্তরে, ক্ষুদিরাম সম্পর্কে হেমদাসের বইয়ে ১১১ পৃষ্ঠা থেকে ১১৬ পৃষ্ঠা অবধি এমন অনেক কথা আছে যাকে প্রশস্তি বলা যায়। পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। উভয়েরই বাড়ি মেদিনীপুরে। হেমচন্দ্র লিখেছেন, "এক সন্ধ্যেবেলা সে আমার কাছে রিভলভার চেয়েছিল [ঘটনাটি মেদিনীপুরে]। তখন তার বয়স ১৪, মনে হয়েছে ১২।১৩। প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, এক সাহেব মারবে। ধমকে দিয়েছিলাম। সত্যেনের কাছে খোঁজ নিয়েছিলাম। কয়েকটি গুণের পরিচয় পেয়েছিলাম। কারও অন্যায় অত্যাচার সে সহ্য করতে পারত না (পৃঃ ১১১)। সকল রকম বিপদ, এমন কি, প্রাণনাশের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে যে কাজ করলে লোকে ধন্যবাদ দেয়, এমন দুঃসাধ্য কাজ করবার সহজ প্রবৃত্তি, যাকে সৎসাহস বলে, ক্ষুদিরামের স্বভাবে তা অত্যন্ত প্রবল ছিল (১১৫)। Tenacity of purpose ক্ষুদিরামের স্বভাবে বিশেষভাবে ছিল। যা করতে হবে একবার সে স্থির করত তা সাধনকালে যত কঠিন বলে অনুভূত হোক না কেন তা সম্পন্ন করতে মৃত্যু আসন্ন হলেও সে কার্য সে অসম্পূর্ণ রেখে ছেড়ে দিত না। নিজ হাতে অন্যায়ের প্রতিবিধানের চেষ্টা করবার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি ও সৎসাহস ক্ষুদিরাম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য" (পৃঃ ১১৬)।

বলা বাহুল্য, ক্ষুদিরামের এই গুণাবলী সাধারণের মধ্যে তো বটেই, বিপ্লবী-দলগত অনেকের মধ্যেও দুর্লভ। সম্ভবত, এই কারণেই, ক্ষুদিরাম বাগান বাড়ির

কেউ না হলেও, "আমরা বাইরের কাউকে বিশ্বাস করতাম না" বারীন্দ্রের এই মন্তব্য সত্ত্বেও হেমচন্দ্র ক্ষুদিরামকে কিংসফোর্ড নিধন-যাত্রায় প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গী হিসাবে সুপারিশ করেছিলেন। ফ্রান্সে ফলপ্রসূ বোমা তৈরি শিখে আসবার পর বারীনের বিপ্লবীদলে হেমচন্দ্রের এমন একটি ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁর সুপারিশ বারীন ও উপেন অগ্রাহ্য করতে পারেন নি।

হেমচন্দ্র বলেছেন: "অবশেষে মেদিনীপুর সমিতির কাউকে না জানিয়ে ক্ষুদিরামকে আনান হয়েছিল [মানে, হেমচন্দ্রই আনিয়েছিলেন]। সপ্তাহখানেক তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে পূর্বোক্ত প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে মজঃফরপুরে পাঠান হল। তারা সন্ধ্যেবেলা যাত্রা করেছিল বলে পুলিশ খোঁজ পায়নি। তাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ছিল, কাজ হাসিল করার পূর্বে সাঙ্কেতিক প্রথায় আমাদের খবর দেবে। তখন আমরা গা ঢাকা দেব।" (পৃ: ২৬৭)।

তা হয়নি। এঁদের দুজন কেউই "সাঙ্কেতিক প্রথায় খবর দেবার অবসর পান নি। কিন্তু খবরের অভাবে তাঁরা তল্লাসির মুখে ধরা পড়েছেন তাও নয়। কোন সহৃদয় পুলিসসূত্রে তাঁদের (বিশেষ করে বাগানবাড়ির লোকেদের) তল্লাসি ও ধরপাকড়ের অগ্রিম খবর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যথেষ্ট সতর্ক হন নি বা কেউ গা-ঢাকা দেন নি—একমাত্র অরবিন্দর আস্তানা থেকে একটি রাইফেল স্থানান্তর করা ছাড়া।

অন্যদিকে মজঃফরপুর ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম দু'জন দু'দিকে পলায়ন ও আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টাও পুলিসের অত্যন্ত তৎপর বেড়াজালে পড়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। ক্ষুদিরাম ওয়েইনি স্টেশনের বাইরে একটি মুড়ির দোকানে ধরা পড়েন। প্রফুল্ল সমস্তিপুর ছেড়ে মোকামেঘাট স্টেশনে কনস্টেবলদের কঠিন বাহুবন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় নিজেরই দৃঢ়করধৃত পিস্তলের গুলিতে আত্মহনন করেন ও কোনপ্রকার বলা-কওয়ার বাইরে চলে যান। পুলিস তখনও তাঁর প্রকৃত নাম জানে না। মৃতদেহ সনাক্ত করার সময় ক্ষুদিরামের মুখে যে নাম প্রকাশ পায় তা দীনেশচন্দ্র রায় বা ডি সি রয়; প্রফুল্ল চাকী নামটি সঙ্গী ক্ষুদিরামেরও অজ্ঞাত ছিল।

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের 'শহীদ যুগল'-এ ভুল উল্লেখ করতে গিয়ে বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য যথার্থই লিখেছেন: 'প্রফুল্লের বাড়ীঘর ইত্যাদি যাবতীয় পরিচয় ক্ষুদিরামের জানা সত্ত্বেও পুলিস তাহার নিকট হইতে সঠিক বিবরণ জানিতে পারিল না'—একথা ঠিক নহে। ক্ষুদিরাম সত্য কথাই বলেছিল।

সে প্রফুল্ল সম্বন্ধে কিছুই জানত না। আমাদের নিয়ম ছিল কোন কাজের সংস্পর্শে এলে যেটুকু জানা দরকার তার বেশী কাহাকেও জানতে দেওয়া হবে না। কর্মীরা সকলে সকলকে জানতে পারত না। ভিন্ন ভিন্ন কর্মীদের বিভিন্ন স্থানে রাখা হ'ত। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পূর্বে কেও কা'কে চেনে নাই। **ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর হতে আনিয়ে** প্রফুল্লকে দেখিয়ে বলে দেওয়া হয়, এর নাম দীনেশচন্দ্র রায়। বাঁকুড়াব একজন কর্মী। আর ক্ষুদিরামকে হরেন সরকার বলে প্রফুল্লকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সাবধানতার জন্যই ঐরূপ করা হয়। যদি কোন কাজে কেউ ধরা পড়ে এবং পুলিসের অত্যাচারে কিছু বলতে বাধ্য হয় তা'হলে সে প্রকৃত কথা বলতে পারবে না। **তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হ'ত।**"

প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের মজঃফরপুর যাত্রা, ঘটনা ও তার পরিণতি সম্পর্কে নানা বইয়ে বিচিত্র সংবাদ বেরিয়েছে, পরস্পর-বিরোধী, কাল্পনিক ও একদেশদর্শী। আজ নির্মোহ চিত্তে সেই অবান্তর অরণ্য সরিয়ে সত্যের দেউলে পৌঁছোনো দরকার হয়ে পড়েছে। আরও কালহরণ মানে অসত্যের মূলগুলো আরও দৃঢ় হতে দেওয়া। কোন কোন বইয়ে প্রফুল্লর নামোল্লেখমাত্র আছে ক্ষুদিরামের সঙ্গে, যেন নিতান্তই গৌণ সঙ্গীমাত্র। এমন কি, এফ, সি, ড্যালি (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস, এস ডি), ১৯১১ সালের ৭ আগষ্ট তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে গোপন রিপোর্ট পেশ করেন প্রথম বিপ্লবীদের সম্পর্কে তাতেও প্রফুল্লকে গৌণ করার চেষ্টা হয়েছে। লক্ষণীয়, তাঁর রিপোর্ট ১৯০৮ এপ্রিলে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের বছর তিনেক পরে এবং তাতে সাধারণ্যে ইতিমধ্যে প্রচলিত ধারণাই স্থান পেয়েছে। সরকারি মহাফেজখানাও যে তুষ মেশানো চাল এবং তুষ সরিয়ে চাল বেছে নিতে হয় এবং সর্বৈব নির্ভর-যোগ্য নয় এটি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিভাবে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের হত্যার উদ্দেশ্যে মনোনীত হয়েছিল তার কোন খবরই গোয়েন্দা প্রতিবেদকের জানা ছিল না, যা তিনি গোপন চিহ্নিত করে পেশ করেছেন তা ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে।

শ্রীশঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত 'ফার্স্ট রিবেলস'-নামা ড্যালির রিপোর্টের ৪২ পৃষ্ঠায় আছে : "Prafulla Chaki *who had accompanied* Khudiram Bose etc." কোন্ ক্ষুদিরাম ? "the boy *who actually threw* the Muzaffarpur bomb (পৃঃ ২৬)। আবার ২৯৩ পৃষ্ঠায় : Prafulla

Kumar Chaki alias Dinesh Chandra Roy (1888—1908) was sent *along with Khudiram Basu* to kill Kingsford, then Sessions Judge at Muzaffarpur in Bihar. The bomb was thrown by *them* at *Kingsford's carriage* on 30 April 1908 etc. (পৃ: ২৯৩)।

প্রথমত কে কার সঙ্গে গিয়েছিল বা সঙ্গী হয়েছিল, এ সম্পর্কে বলবার যথার্থ অধিকার নিশ্চয়ই বারীন্দ্র ও হেমচন্দ্রের বেশি। দ্বিতীয়ত, যেখানে প্রথমে বলা হল নিশ্চিত ক্ষুদিরাম বোমা ফেলেছে সেখানে পরে বলা হচ্ছে **তারা** বোমা ফেলেছে। তৃতীয়ত, **গাড়িটা কিংসফোর্ডের নয় কেনেডিদেরই**। গাড়ি ও ঘোড়া—কিংসফোর্ড ও কেনেডির—একই রকম দেখতে ছিল। তাই থেকে সব ভুল।

প্রফুল্ল চাকী কারও গৌণ নয়। তাঁর মতো মৃত্যুবরণ সেকালে কেউ করতে পারেন নি। সেদিক থেকে প্রফুল্ল অনন্য। বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় বারে বারে তাঁর নাম উঠেছে। তাঁকে আসামী করা যায়নি বা দণ্ড দেওয়া যায়নি বলে পুলিস ও প্রশাসনের আক্রোশের অবধি ছিল না। প্রতিহিংসাবশে সনাক্তকরণের নামে তাঁর দেহ থেকে মুণ্ড তো ছিন্ন করেইছে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে সেই মুণ্ড মাটিতে কবরও দিয়েছে। প্রফুল্লর বাড়ির লোকেদেরও হেনস্তার অবধি ছিল না। বাগানবাড়ির মামলায় তাঁর দাদাকে সাক্ষ্য দিতে এবং সরকারি কৌঁসুলি আর্ডলি নর্টনের পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরার মুখে পড়তে হয়েছে, প্রফুল্লর স্বগৃহে তাঁর কোন চিহ্ন পর্যন্ত রাখতে দেয়নি। স্পষ্টতই প্রফুল্লর মধ্যে একটি দৃঢ়মনা বিপ্লবী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬)

প্রফুল্লর জীবনী লিখেছেন (১) কালীপদ বাগচী 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী' শিরোনামায়; (২) হেমন্ত চাকী 'অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী' শিরোনামায়; (৩) ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র 'শহীদ ক্ষুদিরাম' বইখানির সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্টরূপে। (৪) নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় লিখেছেন 'শহীদ যুগল'। দুটি অংশে বিভক্ত দুই শহীদের জীবন-চরিত। অনেক সূত্র থেকে নানা খবরও আছে। তৃতীয় বইখানি প্রণয়ন বা প্রকাশের কাল ১৯৪৮, চতুর্থ বইখানিও তাই, দ্বিতীয় খানির ১৯২২, প্রথম খানির ১৯৬২। অর্থাৎ এতদিনে সমস্ত তথ্য জেনে যাবার

কথা। এবং একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রত্যাশিত ছিল। সব চাইতে পরিতাপের বিষয়, ১৯৮০ সালে প্রফুল্লর জন্মশতাব্দী পালনের প্রস্তাব নিয়ে একটি সংস্থা অনাবশ্যক বিতর্কের সৃষ্টিও করেছিল। অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। ১৯৮৮তে প্রফুল্লর জন্মশতাব্দী হবে।

ঈশান মহাপাত্র-লিখিত 'শহীদ ক্ষুদিরাম'-এর শেষাংশে প্রফুল্লর জীবনীতে বলা হয়েছে, তাঁর ডাকনাম ছিল ফুলু। বিপ্লবী নাম দীনেশ চন্দ্র রায় (পৃঃ ১১৮)। রংপুরেই প্রফুল্লর বিপ্লবী জীবনের সূচনা হয় (১২০)। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ গবর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার ভার হেমচন্দ্র ও প্রফুল্ল চাকীর উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু লাটসাহেবের চতুরতার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় (পৃঃ ১২১) [হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা'-য় এ সম্পর্কে কিছু বিশদ বিবরণ আছে]। মানকুণ্ডু চন্দননগর এলাকায় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বাঙলার লাটসাহেব [এণ্ডরু ফ্রেজার] হত্যার চেষ্টায় প্রফুল্ল, বারীন্দ্র, বিভূতি-ভূষণের ব্যর্থ আয়োজন হয়। লাট সাহেব ওপথে আসবেন না শুনে মাইন তুলে নিয়ে চলে আসেন। আবার ঐ তিনজন নারায়ণগড়ে। প্রথম দিন লাটসাহেব আসেন না। পরদিন। কিন্তু ট্রেনের বিশেষ ক্ষতি হয় না। পরদিন ৭ ডিসেম্বর (১৯০৭) মেদিনীপুর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগ দেন (পৃঃ ১২১)।

ক্ষুদিরাম সঙ্গী হবার বহু আগে মানিকতলা বাগানবাড়ি বিপ্লবী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রফুল্ল চাকীর যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এই সংক্ষিপ্ত বিবরণেই তা প্রমাণিত। অথচ এই বইখানির মূল কথা শহীদ ক্ষুদিরাম। বইখানি ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত, ১৩৫৪ সালে 'শনিবারের চিঠি'তে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত একটি গল্প এই বইয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে। লেখক উপেন্দ্রনাথ সেন। সমস্তিপুর মজঃফরপুর থেকে ৩২ মাইল। প্রফুল্ল সমস্তিপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। "দুপুরের কাছাকাছি এক বাঙালি কর্মচারী দেখিলেন মাঠের মধ্য দিয়া একটি উসখুস মুখ বাঙালি ছাত্র আসিতেছে। পূর্বরাত্রিতে ওখানে বোমা দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে ! বুঝিলেন এটি পলাতক বিপ্লবী। যত্ন করিয়া নিজের বাড়ীতে আনিলেন এবং স্নানাহারের ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রিতে কলিকাতার টিকিট কিনিয়া নিজে গিয়া ইন্টারক্লাশে উঠাইয়া দিলেন (পৃঃ ১২২-২৩)।"

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের 'শহীদ যুগল'-এও উপেন সেন মশাইর এই গল্পটি উদ্ধৃত আছে। তাতে এখবরও আছে "সকালবেলা ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে পাঠাইয়াছিলেন স্টেশনের সংলগ্ন মুদির দোকান হইতে মুড়ি

কিনিবার জন্য। ক্ষুদিরাম হিন্দি জানিতেন না। দোকানদারকে 'মুড়ি দে' বলিতেই পার্শ্বে দাঁড়ান সাদা পোষাকের কনস্টেবল তাঁহাকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল।…

ক্ষুদিরাম ধৃত হইবার পর প্রফুল্ল সেই আমবাগানের আশ্রয় হইতে সমস্তি-পুরের দিকে রওনা হইলেন।…সমস্তিপুরের দূরত্ব ৩২ মাইল।…রেল কর্মচারীদের বাসভবনের সংলগ্ন মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার কালে একজন বাঙালী রেল কর্ম-চারীর দৃষ্টি পড়িল পথচারী বাঙ্গালী যুবকের উপর।…ইত্যাদি

অনেক সময় প্রকৃত ঘটনা উপন্যাসের চাইতেও বিস্ময়কর হয় বটে এবং নন্দলালের বিপরীত মহানুভব স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে সন্দেহ নেই কিন্তু কিছু সংশয়ের প্রশ্নও জাগে। নন্দলালের সঙ্গে সমস্তিপুরে প্রফুল্ল চাকীর যখন দেখা তখন নন্দলালের বর্ণনামতো প্রফুল্লর গায়ে নতুন পাঞ্জাবী, নতুন ধুতি, নতুন পাম্পস্থ। পুলিস-নন্দলালের চোখে সন্দেহ সঞ্চারের এও একটা কারণ। গল্পের শেষাংশে আছে: "নন্দলাল প্রফুল্ল এক সঙ্গে গঙ্গা পার হইলেন।" নন্দলাল ইতিমধ্যে সরে পড়েছিল; তাকে না দেখে প্রফুল্ল হাওড়া-গামী গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় পাঁচজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে (নন্দলাল) "প্রফুল্লর কাছে আসিয়া বলিল, 'আমি তোমায় গ্রেপ্তার করছি।' 'বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করতে চাও? বিশ্বাসঘাতক, এই নাও তার প্রতিদান।' এই বলিয়া তিনি পিস্তল ছুঁড়িলেন। সৌভাগ্যবশত, নন্দলাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইল। জনতা প্রফুল্লর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল ও তিনি তাদের প্রতি গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দারুণ মানসিক চাঞ্চল্যবশত তাঁহার সব গুলি ব্যর্থ হইল। শিবশঙ্কর নামে একজন কনস্টেবল তাঁহাকে ধরিবার পূর্বেই তিনি নিজের কণ্ঠদেশের দিকে পিস্তলের মুখ ঘুরাইয়া দুইবার গুলি করিলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহার প্রাণহীন দেহ প্ল্যাটফর্মে পড়িয়া গেল। এইরূপে ২রা মে প্রাতঃকালে **মোকামা জংশনে বাঙ্গালার প্রথম শহীদের** জীবন বলি হইয়া গেল (পৃঃ ১২৪)।

সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ও সাব-ইন্সপেক্টর শর্মার বিবরণের সঙ্গে এ বিবরণের অমিল আছে। নতুন পরিচ্ছদ সম্পর্কে প্রশ্ন এই, আনকোরা নতুন হলে ভদ্রলোক প্রফুল্লকে সম্ভবত সঙ্গে নিয়ে দোকান থেকে ওগুলো কিনেছেন। প্রফুল্লর সঙ্গে টাকা ছিল না, সব টাকা ক্ষুদিরামের কাছে ছিল। দোকান থেকে দোকানে কেনাকাটা নতুন লোকের জন্য অনেকের দৃষ্টিতে পড়বার কথা এবং তদন্ত বা

মামলাকালে দোকানদারদের জিজ্ঞাসাবাদ করার এবং সেই সহৃদয় ব্যক্তির বিপন্ন হবার কথা। জুতো না হয় ময়দানে ফেলে এসেছেন, পুরোনো ধুতি জামা কোথায় পুলিসের অগোচরে পরিত্যক্ত হল? দ্বিতীয়ত, পশ্চাদ্ধাবমান জনতার উদ্দেশে "গুলিবর্ষণ", একটি পিস্তলে কয়টি গুলি থাকে? দুই বিবরণের মধ্যে আদালতে শপথ নিয়ে দুই সাব-ইন্সপেক্টর যে বিবরণ দিয়েছে তাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করি। 'শনিবারের চিঠি'র লেখক উপেন্দ্রনাথ সেন নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষদর্শী নন, হ'লে তাঁর সহ-আসামী অথবা সাক্ষী হবার আশঙ্কা থেকে যায়। লেখকের, অনুমান করি, ঈশান পাত্র মহাশয়েরই, উপসংহার—**প্রফুল্ল চাকী বাঙ্গালার প্রথম শহীদ।** বলা বাহুল্য, লেখকের বা **ঈশানবাবুর প্রফুল্ল চক্রবর্তীর কথা** জানা ছিল না।

(৭)

১৯৪৮ সালের পর ১৯৫২ (বাং ১৩৫৯) হেমন্ত চাকী মহাশয়ের "অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী"। পূর্ণাঙ্গ জীবনী। হেমন্তবাবু প্রফুল্ল চাকীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর পক্ষে পারিবারিক কিছু-শ্রুতিপরম্পরা খবর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র হয়েও প্রফুল্লর জীবনের কতটা হেমন্তবাবুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কতটা নিছক শ্রুতিনির্ভর ভেবে দেখতে হবে—বিশেষ যেখানে বিপ্লবীদের 'মন্ত্রগুপ্তিই' ছিল নিয়ম—অর্থাৎ, পরিবারের লোকের কাছেও তাঁদের ক্রিয়াকর্ম বা গতিবিধি থাকত অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি দাবি করেছেন, "প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের যে যে কাহিনী শুধু কঙ্কালসার হইয়া আছে, বগুড়া, রংপুর, কলিকাতা, মেদিনীপুর, মোকামাঘাট, পাটনা, সমস্তিপুর, মজঃফরপুর হইতে নানা তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছি। সরকারি দলিলপত্র, ক্ষুদিরামের মামলার কার্যবিবরণী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এক মজঃফরপুরেই তিন বৎসরকাল অতিবাহিত হয়।"

সন্দেহ নেই, কোন বিষয়ে ডক্টরেট পেতে যে অক্লান্ত শ্রম ও স্বেদপাত করতে হয়, সত্যানুসন্ধানে সেই শ্রমস্বীকার ও সময় ব্যয় করার জন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। বিপ্লবীসাহিত্য রচনায় যথাযথ তথ্যোদ্ধারে এর চাইতে বড় কাজ আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং, অত্যন্ত সতর্কতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বইটির বিশ্লেষণ অপরিহার্য কর্তব্য। হেমন্তবাবু এক বিশাল পটভূমিকায় তাঁর

আহৃত তথ্যরত্নগুলো বিন্যস্ত করেছেন এবং প্রাসঙ্গিকবোধেই তা করেছেন। গ্রন্থকারের নিজস্ব নিবেদন ছাড়াও মানিক ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটি ভূমিকা আছে (১৯৫১/১ বৈশাখ ১৩৫৮)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পৃঃ ১৮-৫৯) আছে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭), সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭), কংগ্রেসের জন্ম (১৮৮৫)। আছে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কথা। 'বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার' ইতিহাস আছে তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃঃ ৫০-৮৩)। বঙ্গভঙ্গ, প্রতিরোধ আন্দোলন, জাতীয় বিদ্যালয়, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার কথা আছে। নেই প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিপিন পালের কথা, অনুশীলন সমিতির উল্লেখ; সূচনা বারীন্দ্রকুমারকে নিয়ে, 'সন্ধ্যা'-ব্রহ্মবান্ধব-কৌসুলি চিত্তরঞ্জন, এণ্ডুজ ফ্রেজারের ট্রেন ধ্বংস চেষ্টার কথা আছে।

চতুর্থ অধ্যায় (৮৪-৯০) থেকে প্রফুল্ল চাকী প্রসঙ্গ।

কিন্তু গ্রন্থকারের নিবেদনে একথা কেন বলা হল সহজে বোধগম্য নয় যে, "একক প্রফুল্ল চাকী অনেকাংশেই সম্পূর্ণ—ক্ষুদিরাম মিলিত হইয়া প্রফুল্ল চাকীকে পূর্ণ ও সার্থক জীবন করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলার সেদিন ক্ষুদিরাম না থাকিলে প্রফুল্ল ফুটিয়া উঠিতে পারিতেন না। ইঁহারা দুইজনেই একই সময়ে বিপ্লবধর্মে দীক্ষিত হন। একসঙ্গে কাজ করেন এবং এক সঙ্গে থাকিতেন এবং একসঙ্গে দেহত্যাগ করেন বলিলেও চলে। জীবিতকালে জীবনের দুঃখদৈন্য তাঁহারা একসঙ্গে ভোগ করিয়াছেন।"

ব্যাখ্যা করলে কথাটা হয়তো এই দাঁড়ায় যে, "প্রফুল্লর অনেকাংশে সম্পূর্ণ" জীবন (কিয়দংশ যা অসম্পূর্ণ ছিল), ক্ষুদিরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা "পূর্ণ ও সার্থক হল। প্রফুল্লর কিংসফোর্ডকে হত্যার ইচ্ছাপূরণে বারীন্দ্রকুমার ও উপেন্দ্র-নাথ প্রফুল্লকে নিয়ে এলেন গোপীমোহন দত্ত লেনে বোমাসহ মজঃফরপুর রওনা করে দিতে। [বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তি দ্রষ্টব্য] তখন প্রফুল্ল (হেমন্তবাবুর মতে) "অনেকাংশে সম্পূর্ণ মাত্র"। হেমচন্দ্র দাস যখন ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লর সঙ্গী হিসাবে যেতে দেবার সুপারিশ করেন [হেমচন্দ্র দাসের 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' দ্রষ্টব্য] এবং বারীন্দ্র উপেন্দ্র সম্মত হন [বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি দ্রষ্টব্য] তখন প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম মিলিত হলেন। হেমন্ত বাবুর মতে এই মিলনই প্রফুল্ল চাকীকে "পূর্ণ ও সার্থক জীবন করিয়া তুলিয়াছিল।" মিলন—কিন্তু কেউ কাউকে চেনেন না। ক্ষুদিরাম প্রথমাবধি ক্ষুদিরাম—প্রফুল্ল মধ্যবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র রায় বা

ডি সি রয়, ক্ষুদিরামও শেষ পর্যন্ত তাই জানতেন. [ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি ও সনাক্তকরণ দ্রষ্টব্য] প্রফুল্ল চাকী বলে জানতেন না—সনাক্তকরণের জন্য স্পিরিটে ডোবানো কাটা মাথা নিয়ে এলে আবার স্বনামে উদ্ভাসিত হন প্রফুল্ল চাকী। দুই ম্যাজিস্ট্রেট, মিঃ উডম্যান ও মিঃ বার্থুডের কাছে ক্ষুদিরামের বিবৃতিতে দুই অপরিচিতের মিলন-কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

"দুইজনেই একই সময়ে বিপ্লব ধর্মে দীক্ষিত হন"—একথারই বা কি তাৎপর্য ? প্রফুল্লর জন্মস্থান বগুড়া জেলার এক গ্রামে। ক্ষুদিরামের জন্মস্থান মেদিনীপুরে। প্রফুল্লর শিক্ষাদীক্ষা বগুড়া-রঙপুরে, ক্ষুদিরামের মেদিনীপুরে। প্রফুল্লর সঙ্গে রঙপুরে বারীন্দ্রের সংযোগ, প্রফুল্ল রঙপুর ছেড়ে কলকাতা আসেন, এখানে ওখানে থাকবার পর মুরারীপুকুরের বাগান বাড়িতে। বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি অনুসারে ক্ষুদিরাম বাগান বাড়ির কেউ ছিলেন না। একই সময়ে ওঁদের দীক্ষা হ'ল কি করে ? মজঃফরপুরে মেহতা ধর্মশালায় থেকে কিংসফোর্ডের গতিবিধি নজরে রাখার সময় অবশ্যই তাঁরা "একসঙ্গে কাজ করেন ও একসঙ্গে থাকিতেন।" কিন্তু সে ক'দিন ?

প্রফুল্ল ২ মে, ১৯০৮, আত্মহনন করেন, ১১ আগস্ট, ১৯০৮, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। সময়ের এই সুস্পষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও কি "একসঙ্গে দেহত্যাগ" বলা যাবে ? দেহত্যাগের তারিখেরই ফারাক শুধু নয়, দেহত্যাগের ধরণও আলাদা, একজনের ইচ্ছামৃত্যু, আর একজনের রাজদণ্ডে মৃত্যু। একজনের ঘটনার তৃতীয় দিনে রাজদণ্ডের কোন অবকাশ না দিয়ে, আর একজনের পুলিস হেফাজতে, জেল হাজতে থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার, সোপর্দ হয়ে দায়রা বিচার, দায়রা বিচার থেকে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন সূত্রে হাইকোর্টে সওয়াল, মৃত্যুদণ্ড সমর্থনের পর মার্সি পিটিসান ইত্যাদি অনুষ্ঠান অন্তে (এবং ইতিমধ্যে প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রচার ইত্যাদি শেষে) জীবনাবসান। ইতিমধ্যে, প্রফুল্ল চাকীই কি ওরফে দীনেশচন্দ্র রায়ই কি, জনমানসে বিস্মৃত (বেদনার কথা, বাউলের কল্পলোকে দ্বীপান্তরিত কোন্ এক অভিরামের নাম উচ্চারিত)। দুটি মৃত্যুর প্রকৃতি আলাদা—প্রচারও পৃথক। অর্থাৎ, প্রফুল্লর মৃত্যু লোকগোচরে আসেনি, লোকপ্রচারেও স্থান পায়নি। অজ্ঞতাই এর মূল কারণ এবং এই অজ্ঞতাই তৎকালীন ও পরবর্তী প্রজন্ম লালন করে এসেছেন।

"প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের প্রসঙ্গে" বারীন ঘোষ লিখিয়াছেন :—(১৩৫৪ শারদীয় যুগান্তরে প্রকাশিত 'অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম')

'ওরা দুজনে এক বৃন্তে দুইটি যুগ্ম পদ্ম—দেশ জননীর চরণে অর্পিত পূজার ফল, নিবেদিত অর্ঘ্য, একই আত্মদান রূপ পুণ্য-ব্রতে ব্রতী ; তাই ক্ষুদিরামের নাম করতে গেলে, এক নিঃশ্বাসে প্রফুল্ল চাকীর নামও যে উচ্চারণ না করে উপায় নাই। আত্মদান তারা দু'জনে একসঙ্গে করেছিল বটে **কিন্তু বন্ধনপীড়িতা দেশলক্ষ্মীর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবার গৌরব যে প্রফুল্ল আগে অর্জন** করেছে, তাই **প্রথম** শহীদের স্বর্ণমুকুট তাহারই আগে প্রাপ্য—সে দিক দিয়ে সে-ই অগ্রজ।"—নগেন্দ্র কুমার গুহ রায়ের 'শহীদ যুগল' ১৮৭ পৃষ্ঠায় পুনরুদ্ধৃত।

১৩৫৪ সালে বারীন্দ্রকুমার স্পষ্টতই এখানে প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তীর কথা বিস্মৃত হয়েছেন।

অথচ 'শহীদ যুগল'-এই আছে : "প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পিতা স্বর্গগত ঈশান চক্রবর্তীকে বারীনবাবুরা পূর্বোক্ত ঘটনায় [অর্থাৎ দিঘিরিয়া পাহাড়ে বিস্ফোরণ পরীক্ষয়] মৃত্যু সংবাদ জানাইলে তিনি পুত্রশোকে বিচলিত না হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র মণিকেও (সুরেশচন্দ্রের ডাক নাম) মায়ের কাজের জন্য দিলেন। এই সম্পর্কে বারীনবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

'রঙপুরে আমাদের সমিতিব একটি ঘাঁটি ছিল। সেখানকাব পেস্কার ঈশান চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি বলতেন আমি একে একে দেশের জন্য আমার সবগুলি ছেলে দেব, মাতৃপূজায় তোমরা বলি দিও। তাঁর বড ছেলে চলে এল। [এর পর বিস্ফোরণ পরীক্ষার ফলাফলের বর্ণনা আছে] তার বাবাকে আমরা এই মৃত্যু সংবাদ জানালাম। ঈশানবাবু লিখলেন, বেশ, এবার আমার আর একটি ছেলেকে পাঠলাম, মাতৃপূজায় উৎসর্গ করো। এল সুরেশ চক্রবর্তী—মণি।' (পৃঃ ১৭৫)

এ বিষয়ে সুরেশচন্দ্র চক্রবতীর বিবরণ কিছু পৃথক। বিবরণটি সুরেশ চক্রবর্তী স্বয়ং অনুরুদ্ধ হয়ে 'শহীদ যুগল'-এব লেখক নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে লেখেন : "রংপুরে আমাদের একটি বৈপ্লবিক দল ছিল এবং আমরা তিনজনই [প্রফুল্ল চাকী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী] তার অন্তর্গত ছিলাম।... বারীন্দ্রকুমার-দের দলের সঙ্গে আমার কোন যোগই হয়নি। যদিও ঠিক ছিল যে ১৯০৮এ ম্যাট্রিক (বা Fifth Standard) পাশ করে কলিকাতায় গিয়ে ঐ দলেই আমি যোগদান করব, যেমন আমার অগ্রজ প্রফুল্ল চক্রবর্তী করেছিলেন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে

ম্যাট্রিক (বা Fifth Standard) পাশ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বারীন্দ্রকুমাররা ধরা পড়ে গেলেন। আমি ম্যাট্রিক (বা Fifth Standard) পাশ করার পূর্বেই বারীন্দ্রকুমাররা ধরা পড়ে যাওয়াতে আমার আর তাঁদের দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়নি।" (পৃঃ ১৭০-৭১)

হেমন্ত চাকী মশাই আরও বলেছেন: "জীবিতকালে জীবনের দুঃখদৈন্য তাঁহারা একসঙ্গে ভোগ করিয়াছেন।" ক্ষুদিরামের হিসাবমতো মজঃফরপুরের ধর্মশালায় পাঁচদিন মাত্র ছিলেন। হেমন্তবাবু অকারণ অতিশয়োক্তি করেছেন। তাঁরই লেখা প্রফুল্ল চাকীর জীবনী একথার অকাট্য প্রমাণ। তাঁর বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় থেকে সে-জীবনের আরম্ভ।

(৮)

১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২৭ অগ্রহায়ণ (ইংরেজী তারিখ নেই) বগুড়া জেলার অন্তর্গত ভাম্বিহার গ্রামে প্রফুল্ল চাকীর জন্ম। কালীপদ বাগচী প্রণীত 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী'তে ইংরেজী তারিখ আছে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ ১০ ডিসেম্বর। মঙ্গলবার। গ্রামের নাম বিহার। কালীপদবাবু 'প্রফুল্ল চাকী স্মৃতি সমিতি'র লেখক। মেদিনীপুরের উকিল ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রের 'শহীদ ক্ষুদিরাম'-এ আছে ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৯, ৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামের জন্ম (পৃঃ ২)। অর্থাৎ প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের এক বছরের বড়। হিসাব মতো এঁদের যখন প্রথম মিলন হয় (১৯০৮) তখন প্রফুল্লর বয়স কুড়ির কাছাকাছি, ক্ষুদিরামের ১৯-এর কাছাকাছি। আত্মহনন ও ফাঁসির সময়েও তাই।

প্রফুল্ল চাকীর পিতার নাম রাজনারায়ণ চাকী, চার ছেলের মধ্যে প্রফুল্ল কনিষ্ঠ। হেমন্ত চাকীর হিসাবে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে পিতার মৃত্যুকালে প্রফুল্লর বয়স তিন (পৃঃ ৯৩), কালীপদ বাগচী বলেছেন, প্রফুল্লর জন্মের দুই বৎসর পরই পিতা স্বর্গারোহণ করেন। ক্ষুদিরামের যখন সাত বছর বয়স তখন তিনি পিতৃহীন। মা গেছেন ছ'বছর বয়সে (হেমন্ত চাকী পৃঃ ১১৪)।

হেমন্তবাবু ও কালীপদবাবু দু'জনই বলেছেন, বিহার গ্রামের নিকটবর্তী গ্রাম নামুজা, সেখানকার স্কুলে পাঠ আরম্ভ। হেমন্তবাবু স্কুলের নাম দিয়েছেন 'নামুজা জ্ঞানদাপ্রসাদ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়।' তারপর তিনি রঙপুরের উচ্চবিদ্যালয়ের এবং বয়সের উল্লেখ করেছেন ১৪। এই সময় সরকারি এক সার্কুলারের বিরুদ্ধে

এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি গঠিত হলে প্রফুল্ল তাতে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে এজন্য শাস্তিও পান। অন্যান্য বলতে সুরেশ চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক—উত্তরকালে যাঁদের ভূমিকা নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই সরকারি স্কুল ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেন। (ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা অন্তর্গত মধ্যপাড়া গ্রামেব অধিবাসী এবং প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক) নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙপুবের ঐ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (পৃঃ ৯৪)।

হেমন্তবাবু প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু সম্ভবত অজ্ঞতা-বশতই কি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে তার কোন বিবরণ দেন নি। তিনি বলেছেন, বারীন ঘোষেব রঙপুর ভ্রমণকালে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। (পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ গবর্নর স্যার) ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার উদ্দেশ্যে বারীন এক সহকর্মীকে নিয়ে রঙপুর আসেন। (ঐ অঞ্চলে যে) এক ডাকাতির চেষ্টা হয় তাতে প্রফুল্ল অংশ গ্রহণ করেন। ফুলারের ধুবড়ী থেকে রঙপুর আসবার কথা ছিল। আরও কথা ছিল যে, সংকেত পেলে রঙপুর থেকে মাইলখানেক দূরে (রেল লাইনে) বোমা বাখা হবে। না ফাটলে লাইনে লাল বাতি রেখে ট্রেন থামিয়ে প্রফুল্ল ও আর একজন রিভলবার নিয়ে লাটের কামরায় উঠে (তাঁকে) খুন করবেন। লাট ঐ লাইনে আসেন নি ; স্টীমারে গোয়ালন্দ রওনা হয়েছেন। শুনে প্রফুল্ল ও তাঁর সঙ্গী গোয়ালন্দ রওনা হন। পৌঁছে শোনেন লাট কলকাতা চলে গেছেন। এইরকম পশ্চাদ্ধাবন আবারও হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্যামফিল্ড ফুলাব পদত্যাগ করেন (পৃঃ ৯৫-৯৭)।

বাবীনেব 'সহকর্মী' বা প্রফুল্লর 'সঙ্গী' হচ্ছেন হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)। তিনি স্বয়ং এই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' বইয়ে। এই বর্ণনায় তিনি নিজেকে "ডন কুইকযোটের [বারীনের] স্যাঙ্কো পাংশা" বলে অভিহিত করেছেন।

লিখেছেন : "ফুলার বধের জন্য কে একজন হাজাব টাকা বায়না স্বরূপ দিয়েছিলেন। এই হাজার টাকা ও দুটো তথাকথিত বোমা, দুটো রিভলবার নিয়ে বারীন reconnoiter করবার জন্য ফুলার লাটের গ্রীষ্মাবাস শিলং যাত্রা করল। প্রথমে একজন রাজী হয়ে পরে কোন কারণে যেতে পারেন নি। তারপর ক্ষুদিরামের নাম। কিন্তু পতিতাসংক্রান্ত কথার জন্য হোক [?] বা ছেলেমানুষ বলে হোক বাদ গেল। তারপর মেদিনীপুরের আর একজন যেতে রাজী। শিলং

থেকে তার এল। গোয়ালন্দ যাত্রা। সম্ভবত ১৯০৬ মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। সঙ্গে দুটি রিভলবার, সাহেবী পোষাক। স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেছলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। গোয়ালন্দ হোটেলে লঙ্কার ঝাল। গৌহাটি স্টীমার। পেটের অসুখ। ইত্যাদি (পৃঃ ১১৮-১২৩), ষষ্ঠ দিন গৌহাটি। টোঙ্গায় শিলং রওনা। পথে বারীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বারীন বলল, শিলংয়ে নয় গৌহাটিতে। গৌহাটিতে এসে শুনল, অনেকের কাছে বারীনের ফাঁকিগুলো ধরা পড়ে গেছে (পৃঃ ১৩৭-৩৮)। ফুলার-বধটাই বারীনের সব চেয়ে বড় কায ছিল না। বিপ্লববাদ ও তার সঙ্গে আত্মপ্রচারটাই ছিল মুখ্য কায (পৃঃ ১৪৭)। তখন সে খানিকটা অনুমান করতে পেরেছিল, ফুলার-বধের সম্ভাবনা কম। অথচ বারীনের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে গেলে তার সঙ্গে বনিবনা তো হবেই না, অধিকন্তু ক বাবুর [অরবিন্দর] বিরাগভাজন হতে হয়। কাযেই এখন থেকে ডন কুইক-যোটের স্যাঙ্কো পাংশার মতো তাকে আজ্ঞাবহ অনুচর হতে হল। গুপ্ত বিবরণী থেকে জানতে পেরেছিল বরিশালে গিয়ে (লাট) সাহেবকে ধরতে পারবে (পৃঃ ১৪৮)। অতএব বরিশালে। কাতারে কাতারে বিস্তর লাল পাগড়ী। অভ্যর্থনা সেরে ফুলার সাহেব সহরে প্রবেশ করলেন। সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ চলে গেলে নতুন কাঁচা শিকারীদের যে সোয়াস্তি-মিশ্রিত আফশোস হয় ফুলার-শিকারীদেরও প্রায় তাই হয়েছিল (পৃঃ ১৪৯)। পুণ্যে বিশাল বরিশালে কিছুই করা গেল না (পৃঃ ১৫২)। আবার গৌহাটি। গৌহাটি এসে জানতে পারল লাটসাহেব রঙপুর যাবেন। তারাও রঙপুর রওনা দিল (পৃঃ ১৫৪)। স্থির হল লাইনের নীচে এমনভাবে বোমা পুঁতে রাখতে হবে যাতে গাড়ী লাইনের ওপর এসে পড়া মাত্র ফাটে (পৃঃ ১৫৬)। ধুবড়ীতে একজনকে পাঠানো হল, লাটসাহেব স্পেশ্যাল রওনা হলেই সে রঙপুর টেলি করবে। রেল লাইনে বোমাপাতার চেষ্টা ছাড়াও আর এক জায়গায় লাল আলো দেখে গাড়ী থামলে দু'জন রিভলবার নিয়ে লাটসাহেবের গাড়ীতে উঠবে। ইতিমধ্যে ডাকাতির চেষ্টা, কেননা, ফুলার সাহেবের আসতে দেরী আছে (পৃঃ ১৫৭)। স্যাঙ্কো প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে ফুলার বধের জন্য গোয়ালন্দ রওনা হল (পৃঃ ১৬৭)। বন্যার জন্য লাট-অভ্যর্থনা স্থগিত। তারা কলকাতার টিকিট কিনে ফেলল। নৈহাটি স্টেশন, লাল পাগড়ীতে স্টেশন ভরে আছে। লাটের গাড়ী সেখানেই দাঁড়াবে। শিয়ালদহ স্টেশনে নামবার সময় সুযোগ। কিন্তু সেখানে আরও বেশী পুলিশ থাকবে আশঙ্কায় এখানেই কার্য-সমাধায় প্রফুল্ল ও স্যাঙ্কো নেমে

পড়ল। এবার গাড়ী তাদের কল্পিত পথের বিপরীত দিকে চলে গেল (পৃঃ ১৭০)। ক্রমেই গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপের মধ্যে থাকতে থাকতে নেতাদের স্বরূপ যতই হৃদয়ঙ্গম হতে লাগল, ততই তাঁদের ভারত স্বাধীন করবার মুরোদ সম্বন্ধে চোখ ফুটতে লাগল। গুপ্ত সমিতি গঠনের সামর্থ্য ক বাবুর বা অন্য কোন নেতার ছিল কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ জন্মেছিল (পৃঃ ১৭৬)। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ফ্রান্সের মার্শাই বন্দর পর্যন্ত টিকিট কিনে ফেললাম। তখন পাশপোর্টের হাঙ্গামা ছিল না (পৃঃ ১৭৮)।

ইতিমধ্যে একটি প্রসঙ্গ থেকে কিছু বাধ্য হয়েই দূরে সরে পড়েছি। প্রসঙ্গটি পরে পটভূমিকা ক্ষেত্রে বিশদ বলা যাবে, আপাতত তার খানিকটা উল্লেখ করা দরকাব। হেমচন্দ্র দাস বলেছেন, "কিংসফোর্ডকে মারবার আদেশ দিয়েছিলেন কর্তারা।" ড্যালির গোপন প্রতিবেদন অনুসারে তাঁরা হলেন (রাজা) সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চারুচন্দ্র দত্ত ও অরবিন্দ ঘোষ। সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও অরবিন্দ ঘোষের সংযোগ ও সংস্রব অতি সুবিদিত। কিন্তু চারুচন্দ্র দত্তের নামটি অত সুবিদিত নয়। তিনি কোচবিহার দেশীয় রাজ্যেব দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের ছেলে এবং ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস উত্তীর্ণ (আই সি এস), বোম্বের জজ। ড্যালি আরও বলেছেন, এই চারুচন্দ্র দত্ত ১৯০৭এ প্রফুল্ল চাকীকে দার্জিলিং নিয়ে যান লেঃ গবর্নরেব উপর বোমা ফেলবার জন্য। শ্রীশঙ্কব ঘোষ ড্যালির প্রতিবেদন সম্পর্কে যে নোট লিখেছেন, তাতে আছে: যুগান্তর গোষ্ঠি যে গুপ্ত "আদালত" স্থাপন করেছিলেন তাব অন্যতম সদস্য ছিলেন চারুচন্দ্র দত্ত। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, তিনি যে ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে রাজি হয়েছিলেন তাব উদ্দেশ্য ছিল, এতে তিনি ইংলণ্ডে সামরিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি অবসর গ্রহণ মুহূর্ত পর্যন্ত সিভিল সার্ভেণ্ট ছিলেন।" (পৃঃ ১৮)

বারীন্দ্রকুমাব ঘোষ ১৩৫৪ সালে 'যুগান্তব-শারদীয়' সংখ্যায় 'অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম' প্রবন্ধে লিখেছেন: "জজ কিংসফোর্ডের হাতে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ থেকে অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মীর বিচার ও শাস্তি হয়, বালক সুশীল সেনকে বেত মারার হুকুম দিয়েছিলেন এই শ্বেতাঙ্গ বিচারক কিংসফোর্ড। তাই আমাদের গুপ্তচক্রের তিনজন নেতা অরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক ও চারু দত্ত মহাশয়ের আদেশে এই জজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। (নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের 'শহীদ যুগল'। (পৃঃ ১৮২)

সম্ভবত এখানে আর একটি প্রসঙ্গও বলে রাখা দরকার। প্রসঙ্গটি (স্যার) স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর 'এ নেশন ইন মেকিং'-এ আছে, (শ্রীশঙ্কর ঘোষও তাঁর নোটে উদ্ধৃত করেছেন)। "বরিশাল ঘটনার [পটভূমিকায় বরিশাল ঘটনার বিশদ উল্লেখ করা হবে] মাস কয়েক পর ছুটি তরুণ ব্যারাকপুরে আমার বাড়ি এল এবং আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে চাইল। আমি ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করতে তারা বলল, ব্যাপারটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও দুরূহ; দরজাটা বন্ধ করে দিলেই ভাল। আমরা তিনজন রুদ্ধদ্বার কক্ষে রইলাম, ওদের একজন, দেখে মনে হল মেডিকাল ছাত্র, আলাপ আরম্ভ করল। সে বলল, 'অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। আমরা স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে গুলি করবার পরিকল্পনা নিয়েছি; এবং আজ আমরা যাচ্ছি—আজ রাত্রেই এই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?' এরকম একটি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, প্রস্তাবটিও অসামান্য, একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। বললাম, 'স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে গুলি করতে চাও কেন? তিনি কি করেছেন?' তরুণটি সুস্পষ্ট ভাবাবেগে বলল, 'বানারিপাড়ায় মোতায়েন তাঁর গোর্খারা আমাদের মেয়েদের লাঞ্ছিত করছে, আমরা তার পাল্টা প্রতিবিধান করতে চাই।' আমি বললাম, 'তোমরা ধরা পড়বেই এবং তোমাদের ফাঁসি হবে।' তারা বলল, 'আমরা সুযোগ নেব এবং দরকার হলে, মেয়েদের সম্মান রক্ষায় দুঃখবরণ করব।'

"অনায়াসেই অনুমেয়, আমার এর চাইতে সঙ্কটতর অবস্থা আর হতে পারে না। এই ছুটি তরুণ, আইনের সাহায্যে প্রতিকার হবে না এই বিশ্বাসে, মেয়েদের সম্মানরক্ষায় প্রতিহিংসা চরিতার্থে দৃঢ়মনা; তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে হবে। সৌভাগ্যবশত, ঐ সময়ে এক জোর গুজব রটেছিল, এবং সে গুজবের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি ছিল বলেই আমার বিশ্বাস যে, স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার পদত্যাগ করেছেন। আমি তাদেব বললাম, 'তোমরা জান কি, স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার পদত্যাগ করেছেন? মৃতকে গুলি করে কি লাভ? অন্যদিকে তোমাদের এই প্রচেষ্টা জনস্বার্থের পক্ষে নিদারুণ এক ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াবে। লেঃ গবর্নর হিসাবে আমরা সবাই তাঁর অপসারণ চাই। তোমরা যদি ব্যর্থকাম হও—তোমরাও নিশ্চিত নও যে, তোমরা সফল হবেই—তাঁর পদত্যাগপত্র নিশ্চিত প্রত্যাহৃত হবে এবং তিনি স্বপদেই থেকে যাবেন। তোমরা স্বদেশের এ অকল্যাণ ঘটাতে চাও?

"এতেই কাজ হল। তরুণ দুটি তৎক্ষণাৎ ঐ ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে ও প্রস্তাবটি বাতিল করতে সম্মত হল। আমিও সেই সুযোগে তাদের পেড়ে ধরলাম, বললাম, তবে তোমাদের এই ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তারা সহজেই আমার আবেদনে সাড়া দিল, আমি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তবু কিছু সমস্যা ছিল। তারা বলল, তাদের তো এক্ষুনি রাত্রের ট্রেনেই সে জায়গায় যেতে হবে এবং এটা বন্ধ করতে হবে। অথচ সঙ্গে টাকা নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে তারা যা চাইল অগ্রিম দিলাম। তারা কে আমি জানতাম না, আমি তাদের নাম আদৌ জিজ্ঞাসা করি নি, আজও জানিনে তারা কে, আমি একবারও তাদের নাম জানতে চাই নি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারি এবং সত্যিই ডাক মারফৎ টাকা আমি ফেরত পেয়েছিলাম।" (এ নেশন ইন মেকিং, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, পৃঃ ৩৩-৩৪)

ড্যালি অবশ্য মড়ারেট নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে বিপ্লবীদের সংস্রব সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন, ষড়যন্ত্র-কারীদের পরিকল্পনার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্রব সম্পর্কে আমরা কখনও কোন খবর পাইনি; অবশ্য দুটি ইনফরমার (খবর-জোগাড়ে) বলেছিল যে, তিনি (সুরেন্দ্রনাথ) ষড়যন্ত্রকারীদের এবং তাদের বোমার কার্যকারিতার পরীক্ষার অভিপ্রায় জানতেন এবং একবার ষড়যন্ত্রকারীদের দু'তিনজন সত্যিই তাঁর কাছে গেছলেন ও একটি বোমা দেখিয়েছিলেন। তিনি দেখে হেসে উঠেছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন কি করতে পার দেখ। (শ্রীশঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত 'ফার্স্ট রিবেল্‌স, পৃঃ ১৮)।

পক্ষান্তরে, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "History of Freedom Movement in India, vol II, p. 275"-এ লিখেছেন:

"Barindra and his friends were engaged in manufacturing bombs with a view to killing the Government officials who adopted repressive measures against the revolutionaries or were finally instrumental in doing the same. The first bomb was prepared with the definite object of killing Sir Bamfylde Fuller, the Lt. Governor of Eastern Bengal......It is interesting to note that Surendranath Banerjea, the leader of the Moderates, instigated the crime and even promised to raise

seven to eight thousand rupees for the purpose. Prafulla Chaki, a youngman of 17, was specially deputed to carry out the scheme, but he did not succeed."

(৯)

দেখা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র দাস-কথিত ফুলার-বধ-প্রচেষ্টার একটা ভিত্তি আছে—যদিও ব্যাপারটা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন নয়। কারা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন একথা সুরেন্দ্রনাথ যেমন জানতেন না, ড্যালিও তেমনি জানতেন না। বাঙলার বৈপ্লবিক ইতিহাসে তা অজ্ঞাত। কিন্তু এটি নিঃসন্দেহ যে, হেমচন্দ্র দাস প্রফুল্লর সঙ্গে যুগ্মভাবে এবং চারুচন্দ্র দত্তের উদ্যোগে প্রফুল্ল এককভাবে এ চেষ্টা করেছেন। পরমাশ্চর্য এই, ১৯০৭এর ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর হেমচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর একদা ফুলার-বধের সঙ্গী প্রফুল্ল চাকীর মজঃফরপুর যাত্রার উল্লেখ আছে মাত্র, তাঁর অসামান্য মৃত্যুবরণের কোন কথাই নেই। তাঁর গ্রন্থে বারীন-উপেন্দ্র-উল্লাস প্রমুখের উপর সকল দোষ চাপিয়ে তাঁরা সবাই একটা গুলি বা বোমা না ছেড়ে কেমন অহিংস সত্যাগ্রহীর মতো এক লপ্তে ধরা দিলেন সে বিবরণ আছে বটে। (হেমচন্দ্র দাসের গ্রেপ্তারকালে অন্যথা কিছু হয়েছে এখবরও অবশ্য নেই, তবে, শক্ত মানুষ, বারীন প্রমুখের মতো ধরা পড়ার পর ভেঙেও পড়েন নি, যথেষ্ট চাপ সত্ত্বেও কিছু বলেন নি)।

এই সর্বাত্মক পরিপ্রেক্ষিতে প্রফুল্ল চাকীর সমগ্র আচরণ ও চরিত্র আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফুলার-বধ প্রচেষ্টায় বা ডাকাতির উদ্যোগে নিরাশ হয়ে প্রফুল্ল কোথাও চলে যান নি। জীবনীকার হেমন্ত চাকীর পঞ্জিকামতে "১৯০৭ সনের প্রথম ভাগে" অর্থাৎ হেমচন্দ্র দাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনেক আগে প্রফুল্ল "মুরারীপুকুর বাগানে" যান। সেখানে "বারীন্দ্র, উল্লাস, উপেন, ইন্দ্রনাথ নন্দী [?], প্রফুল্ল চাকী, বিভূতি ভূষণ সরকার দলের প্রকৃত কার্যকারক ('অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী', পৃঃ ৯৮)।" চামুণ্ডারূপের পূজামন্ত্র প্রফুল্লর বড় প্রিয় ছিল। হেমন্ত চাকী তাঁর গ্রন্থে স্তবটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, তাঁর "আমৃত্যু এই চণ্ডীর উপাসনা ছিল" (পৃঃ ৯৯-১০০)। মুরারী-পুকুর বাগানে বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে [প্রফুল্লর] সাক্ষাৎ হয়। লেলে তাঁকে যোগশিক্ষায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। প্রফুল্ল রাজী হন নি (পৃঃ ১০২)। চারু

দত্তের ব্যবস্থাপনায় দার্জিলিংয়ে বাংলার লাট এণ্ডরু ফ্রেজারের হত্যার চেষ্টায় প্রফুল্ল ব্যর্থকাম হন ; ফ্রেজার চারু দত্তের অনুমিত পথে আসেন নি (১০৪)। আবার দার্জিলিংয়ে গবর্নরস এলেভেন বনাম কোচবিহার টিমের ক্রিকেট ম্যাচ উপলক্ষ। "শিকার আসিল না!" বাঁকুড়ায় ডাকাতির প্রস্তুতি, শেষ পর্যন্ত হয়নি (১০৫-৬)। লাটসাহেবের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় চন্দননগর-মানকুণ্ডুর মাঝামাঝি যাঁবা নিষ্ফল আয়োজন করেছিলেন প্রফুল্ল তাঁদের অন্যতম। নারায়ণ-গড স্থান নির্বাচন বিভূতিভূষণ সরকার ও প্রফুল্ল চাকীর—ওখানে মাইন রাখা হয়েছিল (১০৬)। "মুরারীপুকুর রোডের আশেপাশে পুলিশের ঘোরাঘুরি বাড়িয়াছে দেখিয়া উপেন, উল্লাস, বিভূতি দেশ ভ্রমণে" বেরোলেন, সাধুসঙ্গ, তীর্থদর্শন ইত্যাদির পর আবার বাগানে (১০৭-৮)। প্রফুল্ল একবার বিহার গ্রামও ঘুরে এলেন, শেষবারের মতো। (সম্ভবত এই সময়ই স্থানান্তরে উদ্ধৃত প্রফুল্ল ও তাঁর ভগ্নীপতির সাক্ষাৎকাব হয়)। অরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক, চারু দত্ত কিংসফোর্ডেব মৃত্যু-বিধান করলেন এবং সে কার্য সমাধার ভার অর্পণ করলেন প্রফুল্লর ওপব (১০৮)। হেমচন্দ্র দাস ক্ষুদিরামকে পাঠাতে চান, অনুমতি দেওয়া হয়। **প্রফুল্ল হাওড়া ষ্টেশনে মিলিত হন।** ক্ষুদিরাম মুবারী-পুকুবের বাগান বা গোপীমোহন দত্ত লেনেব কথা জানিতেন না (১১০)।"
[বারীন্দ্রকুমার ও হেমদাসের কথা স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য]

ঘটনা-পবম্পরায় দেখা যাচ্ছে, প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের সঙ্গে একটা নামোচ্চারণ মাত্র ছিলেন না, বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-উল্লাসেব বিপ্লবী-গোষ্ঠিতে বিশেষ মুখ্য স্থান অধিকাব করে ছিলেন এবং প্রতিশ্রুত যোগ্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, কালক্রমে তাঁর স্থান হয়েছে গৌণ, অনুল্লেখ্যপ্রায় কৃপাবিন্দুতে স্থিত, নিতান্ত নাম করতে হয় বলেই যেন লোকে বলে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরামের স্মৃতিরক্ষা যে-পরিমাণে আয়তনে বিস্তারিত হয়েছে ঠিক প্রফুল্লর স্মৃতি বা নামোচ্চারণ ততখানি সঙ্কুচিত হয়েছে, কোন স্মৃতিসভা, স্মৃতিসৌধ, মূর্তিপ্রতিষ্ঠার আয়োজনমাত্র নেই। [এই মন্তব্য এই পাণ্ডুলিপি লেখাব কাল (১৯৮১-৮২) পর্যন্তও সত্য]।

দ্বিতীয় জীবনীকার কালীপদ বাগচী তাঁর 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী' বইখানির নিবেদনে লিখেছেন, "বাংলার রাজধানী প্রফুল্লর কর্মভূমি কলিকাতায় তাহার কোন স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং জনসমক্ষে স্থাপনের ব্যবস্থা হয় নাই। স্মৃতিসমিতি-সভায় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পাকিস্থানের ডেপুটি

বাগচী মশাইর বইখানির ভূমিকা লিখেছেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি প্রসঙ্গত লিখেছেন, "১৯০৬ খৃঃ ব্যামফিল্ড ফুলারকে নিহত করিবার জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টাকল্পে ৺বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অবিনাশ রায়, মণি লাহিড়ী (পাবনার লোক) প্রথম ফুলারকে ধাওয়া করেন। কিন্তু গৌহাটিতে মণি লাহিড়ী নিজের রিভলবারে নিজের হাত জখম করাতে তাকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। তার বদলে হেমচন্দ্র দাসকে বারীনের কাছে পাঠানো হয়। উভয়ে রঙপুরে উপনীত হন। সেই স্থলেই ইঁহাদের সহিত প্রফুল্লের পরিচয় হয়। ইহার পর হেমচন্দ্র দাস ও প্রফুল্ল কলিকাতাভিমুখে আসেন, বারীন রঙপুরে স্থিতি করেন।"

প্রফুল্লর ব্যায়াম চর্চার কথা উল্লেখ করে কালীপদ বাগচী লিখেছেন, "বগুড়ার নবাববাড়িতে" এই স্বাস্থ্যচর্চা হত এবং প্রফুল্ল 'বাচ্চা বাবু' নামে সমস্ত সর্দার ও লাঠিয়ালেব প্রিয়পাত্র ছিলেন। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিমলা ব্যায়াম সমিতির বীরেন্দ্রনাথ বসু লিখিত 'বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু স্মরণে' পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, উত্তরকালে কলকাতায় থাকতে প্রফুল্ল বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'মহেশালয়'-এ আসতেন, লাঠি খেলতেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মারফৎ প্রফুল্লর সঙ্গে অতীনবাবুর পরিচয় হয়।] রঙপুরে অবিনাশ চক্রবর্তীর প্রেরণায় অবিনাশ চন্দ্র বায় ও জিতেন্দ্রনারায়ণ 'বান্ধব সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। [এফ সি ড্যালির গোপন প্রতিবেদনে বাবু অবিনাশ চক্রবর্তীর পরিচয় আছে "পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকাবের মুন্সেফ, অধুনা পদচ্যুত। এই অবিনাশ চক্রবর্তীই ডাকাতি করে তহবিল সৃষ্টির বুদ্ধি জোগান। এটা সুনিশ্চিত যে বাবু অবিনাশ চক্রবর্তী যুগান্তর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ; মানিকতলা দলের সঙ্গে তখনই তাঁকে মামলায় যুক্ত করা হবে কিনা কথা উঠেছিল। নিঃসন্দেহে তিনি আরও অনেকের

রঙপুরে প্রফুল্লর সহপাঠী, দুর্গাবাবুর পুত্র জ্ঞানদা ও অবিনাশ চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পুত্র সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী [নলিনীকান্ত গুপ্তর সমকালীন প্রখ্যাত লেখক]—সকলেই জেলা স্কুলের ছাত্র—বান্ধব সমিতির সদস্য হন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে রঙপুরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রফুল্ল পুরোভাগে ছিলেন এবং এইভাবে রঙপুর ও বগুড়ায় সেতুবন্ধের কাজ করেছেন তিনি। কার্লাইল সার্কুলারের পর সভায় যোগদানের জন্য ২০০ ছাত্রের মধ্যে দেড়শ ছাত্রের জরিমানা হয়, জরিমানা না দেওয়ায় প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কৃষ্ণজীবন সান্যাল প্রমুখ বহিষ্কৃত হন। এঁদের নিয়ে যে জাতীয় বিদ্যালয় হয় তা ১৯১৩ অবধি চলেছিল। অন্যতম শিক্ষক ছিলেন পরবর্তীকালে প্রখ্যাত আইনজীবী ও সাহিত্যিক অতুল গুপ্ত। (কালীপদ বাগচী প্রণীত 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী'—পৃঃ ২৯)।

রঙপুর সমিতির সঙ্গে "যুগান্তর" পত্রিকার যোগসূত্র স্থাপিত হবার পর ডাঃ দুর্গাদাস লাহিড়ীর পুত্র মহেন্দ্রলাল লাহিড়ী পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় অর্থাভাব ঘটলে, রঙপুর থেকে ৫০০ টাকা এনে দেন। সমিতির প্রথম সদস্যদের মধ্যে দুই প্রফুল্ল, কৃষ্ণজীবন, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক ছিলেন। বারীন্দ্র রঙপুর সমিতি পরিদর্শনে আসেন। ১৯০৬ সালে রঙপুর স্টেশনে যে ডাকলুটের পরিকল্পনা হয়, তার মধ্যে প্রফুল্ল ছিলেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা সফল হয়নি। জিতেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে প্রফুল্ল তিন মাস পাবনা-বগুড়া-জলপাইগুড়ি সফর করে আসেন (পৃঃ ৩১-৩৪)। প্রফুল্লদের জঙ্গলে যুদ্ধের মহড়া হত। প্রফুল্লর দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা এবং কুলগুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ।

তৃতীয়বার ফুলার-বধের পরিকল্পনা নিয়ে বারীন্দ্রের আগমন, আবার ডাকাতির

নিষ্ফল চেষ্টা—নরেন গোস্বামী, হেমচন্দ্র দাসের উদ্যোগ, ডাকাতির পর নির্গমনের ব্যবস্থাভার প্রফুল্লর উপর ছিল (পৃঃ ৩৭)। ফুলারের দার্জিলিং যাত্রা, তাঁর জীবননাশে প্রফুল্ল মনোনীত। দার্জিলিং যাত্রা। শিলিগুড়িতে বারীন্দ্র-সাক্ষাৎ। প্রচেষ্টা নিষ্ফল (পৃঃ ৩৮)। অক্টোবর ১৯০৬, রঙপুর সমিতি থেকে বিদায়, প্রফুল্লর কলিকাতা যাত্রা। কলিকাতায় এসে প্রথমে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর আশ্রয় গ্রহণ। এখানে নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের 'শহীদ যুগল'-এ উদ্ধৃত সুরেশ চক্রবর্তীর বিবরণ কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য।

"১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যখন আমি ও প্রফুল্ল চাকী দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন প্রফুল্ল চাকী পড়াশুনায় ইতি করে কলিকাতায় চলে যান ও বৈপ্লবিক দলে যোগ দেন। মদীয় অগ্রজ (প্রফুল্ল চক্রবর্তী) তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। সুতরাং প্রফুল্ল চাকীই প্রথমে কলিকাতায় যান ও মুরারীপুকুরের যুগান্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হন।" (—শহীদ যুগল, পৃঃ ১৭০)

প্রফুল্লর হঠাৎ চিরতরে অন্তর্ধানের পর ১৯০৭ এর প্রথম ভাগে প্রফুল্ল চাকী স্থানান্তরে যেতে বাধ্য (পৃঃ ৪২)। [এখানেই কালীপদ বাগচী প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বিস্ফোরণে মৃত্যু সম্পর্কে বিভ্রান্তিকব উক্তি করেছেন]

প্রফুল্ল চক্রবর্তী বিস্ফোরণ-পরীক্ষায় বলি হবার পর প্রফুল্ল চাকীর নতুন ঠিকানা চাপাতলা ফার্স্ট লেনে। বই, কাগজ বিক্রি করে স্বোপার্জনে অন্ন সংস্থান।* এই বই কাগজের মধ্যে 'যুগান্তর', 'মুক্তি কোন্ পথে', 'বর্তমান রণনীতি' ইত্যাদি। এর পর প্রফুল্লর বাসস্থান হল ভবানী দত্ত লেনে (পৃঃ ৪৩-৪৫)। এ সময়ে বাঙলার লাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা [মেদিনীপুব অন্তর্গত] নারায়ণগড়ে। কালীপদ বাগচীর বিবরণ মতো এই কাজের প্রধান ভার প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকারের উপর ছিল, বোমা বিদীর্ণ হয় দেরীতে, গাড়ি প্রায় অক্ষত অবস্থায় চলে যায়। "সামান্য একটু ক্ষতি হইয়াছিল। দীর্ঘ দুই রাত্রে পায়ে হাঁটিয়া প্রফুল্ল কলিকাতা ফিরিলেন" (পৃঃ ৪৫)।

---

* বাঙলার বিপ্লবেতিহাসের এই এক বৈশিষ্ট্য। গৃহহারা বিপ্লবীদের দল থেকে অন্নবস্ত্র বা আশ্রয়ের সংস্থান একরকম ছিলই না। আমাদের কালে, ২৫-৩৭ সালে, দাদারা এ নিয়ে যেন মাথা ঘামাতেন না বা ঘামাবার মতো অর্থ সংস্থানও তাঁদের থাকত না। ছেলেরা নিজের প্রাণের তাগিদে বিপ্লবী হত এবং প্রাণ রাখতে অন্নসংস্থানের গরজও তাদের। কার্যত প্রফেসানাল বিপ্লবী কিন্তু খরচের ভার কেউ বিশেষ নিতে চাইতেন না, দল একটা নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব মাত্র ছিল। এই স্বাবলম্বনের সাধনা কী ভয়ঙ্কর, আজকালের বেতনভুক ক্যাডাররা তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

(১০)

এই বিবরণের সঙ্গে খোদ বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তিব বা এই সূত্রে যে মানিকতলা বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল তার সাক্ষ্যসাবুদের মিল নেই। বাবীন্দ্রকুমার স্বীকারোক্তি না করলে পুলিস, প্রশাসন, জজ জানতেই পারতেন না এই কর্মকাণ্ডটি বিপ্লবীদের—যদিও গোয়েন্দা-প্রবক্তারা এই থেকে বিপ্লবীদলেব সূত্রানুসন্ধান পেয়েছে বলে মিথ্যা বাহাদুরি করে থাকে। পরমাশ্চর্য এই যে, কতকগুলো কুলিকে এব নায়ক বলে হাইকোর্টেও সমর্থিত যে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল তার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিস অফিসার পুরস্কৃত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বারীন্দ্রকুমারই প্রথম ঘটনা ফাঁস করে দেন। ওটি হাইকোর্ট বিচাবেরও এক কলঙ্ককর ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত। যতই ওপরে যাবে ততই বিচার নিঃসংশয় হবে এধারণাও ভ্রান্ত, অনেক সময় উল্টোও হতে পারে, যত দূরে ততই বরং ভ্রান্তির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শ্রীশঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত ড্যালির গোপন রিপোর্টের পয়লা পৃষ্ঠায়ই আছে: ১৯০৭-এর শেষে হত্যা ও বৈপ্লবিক অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বাঙলায় গুপ্ত সমিতি সমূহের অস্তিত্ব প্রথম পরিষ্কার ধরা পড়ে। ঐ সময়, ১৯০৭-এর ৭ ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড়ে লেঃ গবর্ণর এণ্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশ্যাল ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা হয়। সাংবিধানিক আন্দোলনের বদলে বলপ্রয়োগ-নীতি অবলম্বনে যে একদল রাজনৈতিক আন্দোলক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল বলে ১৯০৫ সাল থেকেই বাঙলার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ যেসব খবর পায়, এই ঘটনায় তা নির্ভুল প্রতিপন্ন হল। ২২ পৃষ্ঠায় আবাব একথাবই পুনবাবৃত্তি আছে, তবে এই-টুকু লক্ষণীয় সংশোধন আছে যে, এর মাসখানেক আগে হুগলী জেলায় লেঃ গবর্ণরের স্পেশ্যাল ট্রেনের ওপর যে দুটি চেষ্টা হয়েছিল এ খবর আমরা পরবর্তী স্বীকাবোক্তিগুলোয় পাই। [অর্থাৎ, স্বীকারোক্তির আগে তা পুলিসের অজ্ঞাত ছিল।] নাবায়ণগড ঘটনার আগের দিন ২৪ পরগণার চিঙড়িপোতা রেল স্টেশন মাস্টারের অফিসে একটা রাজনৈতিক ডাকাতি হয়; সিন্দুক থেকে ছয় শতাধিক টাকা লুন্ঠিত হয়। [কের সাহেবের 'পলিটিকাল ট্রাবল ইন ইণ্ডিয়া' থেকে উক্ত বইয়ের ৭৫ নং নোটে উদ্ধৃত; নোটে বলা হয়েছে, সিডিসান কমিটি রিপোর্টে এর উল্লেখ নেই।]

বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তিতে আছে: "তৃতীয়বারের জন্য গেলাম খড়্গপুরে। আমি, প্রফুল্ল, বিভূতি। গাড়িতে নারায়ণগড় গেলাম। রেল

লাইনের সমান্তরাল পাকা রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত নটা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে নারায়ণগড়ের এক মাইল উত্তরে খড়্গপুরের দিকে মাইন পুঁতলাম। ছয় পাউণ্ড ডিনামাইট দিয়ে মাইনটা তৈরি। একটা পুরু লোহার পাত্রে রেখেছিলাম, তার ঢাকনার মাঝখানে ছিল একটা ফুটো। ফিউজ অবশ্যই ছিল। একটা কাগজের টিউবে পিকরিক কম্পাউণ্ড রেখেছিলাম। পাছে রুদ্ধ হয়ে যায় এজন্য একটা সীসের পাইপও বসিয়েছিলাম।"

কি ফল হয়েছিল ? কিছু নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে এ নিয়ে যে মামলা হয়েছিল তার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি মিঃ হোমউড (Holmwood) বলেছেন, নারায়ণগড় স্টেশন ছেড়ে গেলে ট্রেন ড্রাইভার তিনটি ঝাঁকুনি অনুভব করে ও শব্দ শুনতে পায়। গাড়িটা থামানো হয়। দেখা যায়, একটা জায়গায় রেল লাইনের নীচে গর্ত ও রেল লাইনটা দুমড়ে গেছে। খড়্গপুরে ইঞ্জিনটা মুক্ত করে নেওয়া হয়। বিচারপতির রায়ে ঘটনার তারিখ আছে ৬ ডিসেম্বর ১৯০৭, রাত ২-৪৫ মিনিট। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫ আগষ্ট, ১৯০৮) সিডিসান কমিটি রিপোর্টেও তাই ; কিন্তু ড্যালি তারিখ দিয়েছেন ৭ ডিসেম্বর, শুধু তাই নয়, ৬ তারিখে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ওটা তখন বি এন রেলওয়ে। তারই ভারপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার মিঃ এইচ ডাফ মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, লেঃ গবর্ণরকে পাহারা দেবার জন্য তিনি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে যান। ৫ ডিসেম্বর রাত ন'টায় কটকে তিনি লেঃ গবর্ণরের ভার নেন। "৬ ডিসেম্বর সকাল দুটো কি তিনটের মধ্যে একটা কাঁপা কাঁপা ঘষার শব্দে জেগে উঠি। বিস্ফোরণের শব্দ শুনিনি। ট্রেনটা থেমে গিয়ে নিশ্চল হয়ে থড়ে। নীচে নেমে গিয়ে মাটির বড় গর্তটা দেখি, আর দেখি, রেল লাইনটা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।" ডাফের মতে গর্তটার ব্যাস ছিল পাঁচ ফুট এবং গভীরতা আট ফুট।

এই ঘটনা সম্পর্কে স্থানান্তরে বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে বলা হবে। আপাতত প্রফুল্ল প্রসঙ্গ। সেই প্রসঙ্গেই বলা যে বাঙলার প্রথম বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডটি নিতান্ত অনুল্লেখ্য নয় এবং প্রফুল্ল এই কর্মকাণ্ডের তিন নায়কের অন্যতম। নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের 'শহীদ যুগল'-এ প্রফুল্লর এমন একটি পরিচয় আছে যা আর কোথাও তেমন করে নেই। "যুগান্তর বিপ্লবীদলের অন্যতম" এবং "হুগলী জেলার অধিবাসী" যতীন্দ্রনাথ বসু "সতীর্থ প্রফুল্ল চাকী সম্পর্কে স্মৃতিকথার আকারে" লিখেছেন :

"১৯০৬ সালে কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তখন প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৩ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কার্যালয়ে। প্রফুল্ল সে সময় লিয়াকৎ হোসেনের চারণদলে যোগ দিয়াছিল। বগুড়া ও কুচবিহারেব কয়েকটি কর্মীর সঙ্গে সেও তখন 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে শ্রদ্ধেয় নেতা 'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিল।

"এই ছেলেটিকে দেখিয়া উপাধ্যায় মহাশয় আকৃষ্ট হন এবং তিনি আমার সহিত তাহার পবিচয় করাইয়া দেন। তাহাব চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্পের ভাব প্রকাশ পাইত। দেখিলেই মনে হইত, যেন কোনও মহৎ কাজ করিবার জন্ম ভগবান তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। আমাব মনও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া সত্যই আমি সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রফুল্লর বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু এবং পবিত্রতা-মাখানো মুখ আপনা হইতেই তাহার প্রতি অন্যকে আকর্ষণ করিত।

"সে বৎসব (১৯০৬) আমি শিবাজী উৎসবেব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলাম। আমার পরিচালিত বাহিনীতে প্রফুল্লও একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিল। যখনই তাহাকে কোন কাজের ভার দিয়াছি, তখনই সে সৈনিকের ন্যায় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সহিত তাহা সুন্দবরূপে সম্পন্ন করিয়াছে। বিশ্রাম সে চাহিত না, চাহিত শুধু কাজ। তখন মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে কেশব সেন স্ট্রীটে) হরিদাস দত্তর ('বাঘাহোরে') শিবাজী সমিতিতে এবং নরেন সেন স্কোয়ারে আমি যুবকদের কুচকাওয়াজ শিক্ষা দিতাম। এই শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক দলে প্রফুল্লও ছিল। অন্যান্য ছেলেব চাইতে সে অল্পদিনে অনেক কিছু শিখিয়া নিয়াছিল।··

"প্রফুল্ল জামা জুতা পরিতে চাহিত না। বলিত, ভারত যতদিন স্বাধীন না হয়, ততদিন মহারাণা প্রতাপের মত ত্যাগী ও তপস্বী হইয়া থাকা উচিত। উপাধ্যায় মহাশয় এবং আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম। আমরা বলিলাম, যুদ্ধ কবিতে হইলে একটা ইউনিফর্ম···আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে···আমাদের যুক্তি সে মানিয়া নেয় এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের মত জামা জুতা ও পাগড়ী পরিতে থাকে।···

"উৎসব সমাপ্তির পর হইতে প্রফুল্ল এবং আরো কয়েকটি ছেলে ঘোড়া চড়া শিখিবার জন্য আমাদের ৬১ নং বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে যাতায়াত করিত।··
ইহার পর তাহাবা প্রত্যেক কাজেই আমার সঙ্গে থাকিত।

"১৯০৭ সনে আমাদের দলের নেতারা স্থির করিলেন যে, বাংলার লাট স্যার এনড্রু ফ্রেজারকে বধ করিতে হইবে। বিজয়া দশমীর পরদিন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের আদেশে আমি প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে লইয়া…দার্জিলিং সহরে যাই। প্রফুল্ল তখন মুরারীপুকুর বাগানে থাকিত। দেখিলাম সে আবার জামা জুতা ছাড়িয়াছে। শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও আমি তাহাকে আবার বুঝাইয়া জামা-জুতা পরাই। দার্জিলিং যাইয়া আমি উঠিলাম শ্রীচারুচন্দ্র দত্তের (অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস) বাড়ীতে, আর প্রফুল্ল রহিল অন্যস্থলে।…

"…বিফল মনোরথ হইয়া আমাদের ফিরিয়া আসিতে হইল।"

কালিপদ বাগচীর বইখানি তথ্যে দুর্বল এবং কোথাও কোথাও ভ্রান্তিপূর্ণও। তিনি লিখেছেন, "নারায়ণগড হইতে ফেরার পর প্রফুল্ল মুরারীপুকুরে স্থান পাইলেন। প্রধান উপদেষ্টা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৪৬)। বাঙলার বিভিন্ন স্থানে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রফুল্ল উত্তরপাড়া, নৈহাটি, কুমারখালি, রাজবাড়ি, কুস্টিয়া ভ্রমণ করেন। উল্লাস দুঃসাহসিক কাজে প্রফুল্লকে সঙ্গে লইতেন। বিপ্লবাত্মক পুস্তক-বিক্রয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বারীন্দ্র বলিয়াছেন —তাঁহারা তিনজনমাত্রই (উল্লাস, উপেন, বারীন) জানিতেন। অন্য সকলে কাগজ-বিক্রেতা ও শ্রমিক বলিয়াই জানিতেন" (পৃঃ ৪৭)। বারীন্দ্র কোথায় এই কথা বলেছেন, কালিপদবাবু যদি তার হদিস দিতেন নিঃসংশয় হওয়া যেত। কুস্টিয়া স্টেশনে ইংরেজ স্টেশন মাষ্টার আক্রান্তের খবরটি নতুন, আর কোন বইয়ে এর সমর্থন পাওয়া যায় না, সুতরাং, এর সূত্রটি দিলে সহজগ্রাহ্য হত। তিনি লিখেছেন, "সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল, কিংসফোর্ড ডাকে পুস্তক পাইয়াছেন।" এ খবরটিও নতুন। কেননা, নলিনীকান্ত গুপ্তের বিবরণ অনুসারে ওটি ডাকে যায়নি, পরেশ মৌলিক পিয়ন সেজে কিংসফোর্ডের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর, "বোমা বইটি"র খবর পাওয়া যায় অনেক পরে, মামলা শুরু হবার পর। কালীবাবু কোন্ সময় কোন্ সংবাদপত্রে এটি দেখেছেন উল্লেখ করলে ভাল হত। কিংসফোর্ড কলকাতা থাকতে ? এই "বই বোমার" উল্লেখ অনেক বইয়েই আছে; কিন্তু তা বিচিত্র।

রাজেন্দ্রলাল আচার্যের (১৩৫৬, ১ বৈশাখ) "বিপ্লবী বাঙ্গলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস"-এর ২৪০ পৃষ্ঠায় আছে মজঃফরপুর ঘটনার "কিছুদিন আগে কিংস-ফোর্ডকে ডাকযোগে পুস্তক বোমা" পাঠানো হয়। (তিনি) "পুস্তকের পার্শেলটি খোলেন নি বলে বেঁচে গিয়েছিলেন"। 'শহীদ ক্ষুদিরামের' লেখক

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র এই বিষয়ে সিডিসান কমিটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন (পৃঃ ১০০)। সিডিসান কমিটি রিপোর্টে আছে: Mr Kingsford had formerly been Chief Presidency Magistrate and had resided at *Garden Reach*, Calcutta, and the assassins had been sent to Muzaffarpur, far away in Bihar, to commit the crime. The police had received information 10 days before that the murder of Mr. Kingsford was intended, and during the next year a well-known revolutionary, when in custoday, said that before this outrage a bomb had been sent to Mr. Kingsford in a parcel. Upon search being made, a parcel was found which Mr. Kingsford had received but not opened, thinking it contained a book borrowed from him. The parcel did contain a book; but the middle portion of the leaves had been cut away and the volume was thus in effect a box and in the hollow was contained a bomb with a spring to cause its explosion if the book was opened". (p. 32)

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দুটি পুলিশ-প্রদর্শনীতে বিপ্লবীদের ব্যবহৃত উপকরণের মধ্যে একটি বর্ণনারূপ বই-বোমা সন্নিবেশিত হয়। বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-উল্লাসের স্বীকারোক্তি বলে যতটুকু পেয়েছি (অমৃতবাজার পত্রিকা) তাতে এতবড় একটি ঘটনার উল্লেখ না থাকায় আমার মনে এই সংশয় হয়েছিল যে, এই কারুকার্য পুলিসেরই—উদ্ধারের বাহাদুরি দেখাবার জন্য এ স্থান পেয়েছে। ঐ প্রদর্শনীর প্রথমটি পুলিসেরই উদ্যোগে, দ্বিতীয়টি ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে আয়োজিত এক মেলায় হয়। কিন্তু শ্রীনলিনী-কান্ত গুপ্তর "স্মৃতির পাতা" পড়বার পর আমার এ সংশয় কাটে।

শ্রীনলিনী গুপ্ত একটি প্রসঙ্গের জের টেনে বলেছেন, "তাইতো আমরা পরেশ মৌলিককে ঠাট্টা করতাম—নন্দলালের বংশধর বলে [এ নন্দলাল, প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দেওয়ায় সচেষ্ট সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি নয়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্লেষরসাশ্রিত কবিতার নন্দলাল—দেশের সেবা করবে বলে যে মৃত্যুর আশঙ্কা এড়িয়ে সতত আত্মরক্ষা করত]। কারণ তাকে পাঠান হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড-এর কাছে একটা জলজ্যান্ত বোমা পৌঁছে দিতে, একটা বইয়ের

খোলসের মধ্যে—বইটা খোলামাত্র কেটে যাবে বোমাটা। **পরেশ গিয়েছিল কোন সাহেবের বেয়ারার সাজে।** কিন্তু রোজই আমরা অপেক্ষা করি কিংসফোর্ডের দুর্ঘটনার জন্যে—কাগজে দেখব। কিন্তু কিছুই না—ম্যাজিস্ট্রেট নিত্যকার মত কোর্ট করে চলেছেন—কিছু ঘটল না। তাই আমরা পরেশকে জিজ্ঞাসা করতাম সত্যসত্যই সে পৌছে দিয়েছিল, না, নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্য কোথাও ফেলে দিয়েছিল। যা হোক পরে বোমাটা আবিষ্কৃত হয়েছিল কিংসফোর্ডের পুস্তকের গাদায়—কিন্তু ছিল নির্বিবাদে, কোন দুর্ঘটনা ঘটায়নি তা (পৃঃ ৩৪৮ এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮, শুন্বস্ত)।

শ্রীনলিনীকান্ত এই বোমা কখন কিভাবে আবিষ্কৃত হল তা বলেন নি।

এই সম্পর্কে মতিলাল রায় মশাই "আমাব দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী "বই খানির ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "কিংসফোর্ড সাহেব যখন **খিদিরপুরে** বাস করিতেন, সেই সময়ে তাঁহাকে একটি পুস্তকের **পার্সেল প্রেরণ করা** হয়। তাঁহাকে হত্যা করাব প্রচেষ্টা চলিতেছে—গোয়েন্দা পুলিশেব মুখে একথা তিনি বিদিত ছিলেন। এই **পার্সেলটি তিনি নিজে না খুলিয়া বিস্ফোরক-পদার্থবিদদের নিকট দেন।** তাঁহারা সতর্ক হইয়া পার্সেল খুলিয়া দেখেন যে, উহা বোমা। একখানি বৃহৎ পুস্তকেব মধ্যভাগে গর্ত করিয়া সাংঘাতিক বিস্ফোরক দ্রব্য স্থাপন কবা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষগণ কিংসফোর্ডের সাহেবের প্রাণরক্ষাব জন্য পুলিশ আদালত হইতে সরাইয়া তাঁহাকে মোজাফবপুরের দায়রা জজ করিয়া দিলেন।"

যাদুগোপাল মুখার্জির "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি"র ২৮৩ পৃষ্ঠায় এইটুকু মাত্র আছে যে, "একটি বইয়ের মধ্যে বোমা পুরে কিংসফোর্ডকে পাঠান বারীনবাবুর দল। এঁরা এসময় অনুশীলন সমিতি থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্রভাবে শ্রীঅরবিন্দের নায়কত্বে কাজ করছিলেন। দলের মধ্যে দল গড়ে উঠেছিল।" কিন্তু বোমাটির কি হল সে সম্বন্ধে কোন খবব দেন নি।

প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "বিপ্লবী যুগের কথা"য় শুধু এইটুকু আছে: "ইহার কিছুদিন পূর্বে (অর্থাৎ নারায়ণগড়, চন্দননগরের পূর্বে) পুস্তকের মধ্যে **বোমা প্রেরিত হয়**" (পৃঃ ৩৩-৩৪)।

বইয়ের মধ্যে বোমা সম্পর্কে শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত তাঁর "বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার"-এর ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "আলিপুর বোমার মামলার স্বীকারোক্তিতে এ কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে" (পৃঃ ১২৩)।

এই দুটি উদ্ধৃতিতে বিশদ খবরের অভাব রয়েছে। প্রথমটি কিভাবে প্রেরিত বা কে প্রেরণ করেন তা নেই, দ্বিতীয়টিতে কে বা কারা স্বীকারোক্তি করেন সে তথ্য নেই।

"অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র" বইয়ের লেখক শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "অরবিন্দ, চারু দত্ত, সুবোধ মল্লিক—কিংসফোর্ডকে হত্যার নির্দেশ দেন। কিংসফোর্ডের বধের অস্ত্র হিসাবে **যে বোমাটি হেমচন্দ্র প্রস্তুত করেন (সেটি ঐ বই বোমা)** (পৃঃ ১৩০)।......**কিংসফোর্ড মক্কের গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকতেন। কিন্তু বইখানা যেদিন প্রথম দিতে গেল, শুনল, তার আগের দিন টালীগঞ্জের বাড়ীতে উঠেছেন। পরদিন বইটি তাঁর হাতে দেওয়া হল।** খুললেন না (পৃঃ ১৩১)। আলিপুর বোমাব মামলা চলার সময় একজন বিশিষ্ট আসামীর স্বীকারোক্তিতে বোমাটির অস্তিত্ব পুলিশ জানতে পারে (পৃঃ ১৩১)।

"It should be mentioned here that there was a prior attempt on Kingsford's life. A book parcel was *sent to him by post*, a bomb was put in the hole cut out in the book, with a spring which would make the bomb explode if the book was opened. But Kingsford did not open the packet and left it in a corner and thus escaped. It should be mentioned here that *these bombs were wade by Ullaskar Dutt*. (First Spark of Rovolution by Arun Chandra Guha, p. 132)

বিনয়বাবু বললেন, হেমচন্দ্রের; অরুণবাবু বললেন, উল্লাসকরের; একজন বললেন, হাতে দেওয়া হল, আর একজন বললেন, ডাকে পাঠানো হল। খোদ হেমচন্দ্র কি বলেছেন?

"মিঃ কিংসফোর্ডের জন্য প্রথমে যে বোমাটা তয়ের হয়েছিল, সেটা হচ্ছে একখানা বড় বইয়ের মাঝখানে যায়গা করে বোমাটা এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, বইখানা খুললেই বোমা ফেটে যেত। বইখানা একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল। একখানা লম্বা খামের খানিকটা বইয়ের ভেতর থেকে এক দিকে এমনভাবে বেরিয়েছিল যে, ফিতে না খুলে টানলে বেরিয়ে আসত না। জানা গেছল, মিঃ কিংসফোর্ড **মিসেস মক্কের গ্র্যাণ্ড হোটেলে** থাকতেন এবং সাডে নটার পর নিজের অফিস-যানে কোর্ট যেতেন। বাড়ীতে ওঠবার সময় ঐ বইখানা এক-

দিন তার হাতে দিতে গিয়ে জেনেছিল তিনি তার ঠিক আগের দিন **টালীগঞ্জে একটা বাড়িতে** উঠে গেছেন। তারপর টালীগঞ্জের বাড়ি খোঁজ করে—আর একদিন সন্ধ্যেবেলা **সেটা তাঁর হাতে দিয়ে** এল। কিন্তু তাঁর এমনই জোর বরাত, বইখানা না খুলেই **আলমারীতে** রেখে দিয়েছিলেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত লেফাফাখানাতে কি চিঠি ছিল তা পড়বাব প্রবৃত্তিও তাঁর হয়নি। পরে আমরা যখন আলিপুর জেলে বিচারাধীন, তখন নরেন গোঁসাই হত্যার পরে আমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন পুলিশকে ঐ সংবাদ দিলে, মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের বইয়ের আলমারি হতে বোমা সমেত এই বইখানি উদ্ধার করা হয়েছিল।" (বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা, হেমচন্দ্র দাস, পৃঃ ২৬২-৬৩)।

হেমচন্দ্র অবশ্য নিজের কথা বললেন না। হতে পারে আত্মনাম জাহির করার মতো অবিনয়ী তিনি হতে চান নি, কিন্তু গ্রন্থের লেখার মধ্যে তিনি সর্বত্র খুব বিনয়ী থাকেন নি। বিনয়বাবু ও বিনয়বাবুর "অস্ত্রগুরু" দুজনই **টালীগঞ্জের বাড়ির কথা** বলেছেন, আবাব অনেকে **খিদিরপুরের** বাড়িব কথা বলেছেন।

আর, ভূপেন্দ্রকিশোব রক্ষিত রায় তাঁর "ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবে" লিখেছেন "আপিসের" কথা: বোমাসন্নিবেশিত পুস্তক (Bomb Book) পাঠিয়ে কিংস-ফোর্ডকে ঘায়েল কবাব চেষ্টা ব্যর্থ হল। ও-বইটি খুলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে তাঁকে যমালয়ে পাঠাবার অবকাশ দিল না। কারণ নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় কিছুদিন **আপিসে** আসেন নি এবং বইখানাও অলক্ষ্যে অন্যান্য বইয়ের স্তূপে পড়ে থাকে।" লিখে, সিডিসান কমিটি থেকে এর আবিষ্কার সংক্রান্ত ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সম্ভবত শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তর "স্মৃতিব পাতা" থেকে পরেশ মৌলিকের কথাটা তুলেছেন কিন্তু উদ্ধৃতিব স্বীকৃতি না দিয়ে লিখেছেন: "জানা গেছে যে, পরেশ মৌলিক নামক এক তরুণকে **নাকি** কিংসফোর্ড হত্যাকল্পে বোমা-সন্নিবিষ্ট ঐতিহাসিক বিরাটদেহী ঐ পুস্তকখানা তাঁব গৃহে রেখে আসার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।"

"ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ"-এর দম্পতি লেখক শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় / শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য ইতিপূর্বে (জানুয়ারী ১৯০৮) একটি পুস্তক বোমা **পার্সেল করে** তাঁর ঠিকানায় বারীন ঘোষের দল প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু কিংসফোর্ড তখন কলিকাতার বাইরে থাকায় **পার্সেলটি** খোলা হয়নি এবং পরে ভুলক্রমে ঐ বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। আলিপুর বোমার

মামলা চলাকালীন অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তির মধ্যে ঐ পুস্তক-বোমার হদিশ্ পাওয়া যায়। তৎপর অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে পুস্তক বোমাটি তখন পর্যন্ত **কিংসফোর্ডের বাড়ীতে** সে অবস্থাতেই পার্সেলের আকারে পড়ে রয়েছে। বরাতের জোরে কিংসফোর্ড সে যাত্রাও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেন। ভারত সরকারের বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রধান কর্মকর্তা মুসপ্র্যাট উইলিয়ামস ঐ উল্লিখিত বোমা পরীক্ষা করে 'a most destructive bomb had it exploded' (পৃঃ ৩৩) বলেছেন।

স্বভাবতই ঠিক এই কথাগুলো ইংরেজী বয়ানে আছে শ্রীমতী উমা মুখার্জি প্রণীত "Two Great Indian Revolutionaries, p. 22-23)"-তে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত "জাগরণ ও বিস্ফোরণ", দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায় আছেঃ "কলিকাতায় কাজীকে [কিংসফোর্ডকে] হত্যার চেষ্টা হয়েছে। মোটা বইয়েব পাতার মাঝখান কেটে গর্ত করে (book bomb) তার মধ্যে বিস্ফোরক ভর্ত্তি করবার পর তাঁর **বাসভবনে** পাঠানো হয়েছিল। বইখানার দড়িব বাঁধন খুললেই, স্প্রিং ঠিকরে উঠলে বোমা ফাটবে এবং তাতেই কাজীর জীবনান্ত ঘটবে। (বইখানি দিয়ে আসেন পবেশ মৌলিক)। [শ্রীঘোষ নিঃসন্দেহে পবেশ মৌলিকেব নামটি শ্রীগুপ্তের বইয়ে পেয়েছেন।] কপালে কাজীর মরণ নেই, তাই সে-বই আব খোলা হয়নি। সুস্থ শরীবে বহাল তবিয়তে কাজী মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান। **রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তিতে খবর পেয়ে,** পরে পুলিশ সেখানে বইখানি খুঁজে পেয়ে তাব মধ্যে বোমা আবিষ্কার করে।

এযাবৎ "বিশিষ্ট বিপ্লবী", "বিশিষ্ট আসামী"র স্বীকাবোক্তি ছিল, শ্রীঘোষ তা সুস্পষ্ট নাম করে বললেন রাজসাক্ষী [অর্থাৎ নরেন গোঁসাই]।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাঁর "অবিস্মবণীয়", প্রথম খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ তাঁকে [কিংসফোর্ডকে] মারবার জন্যে কলকাতায় **তাঁর গার্ডেনরীচের বাড়ীতে** ১২০০ পৃষ্ঠার এক বইয়ের ভেতর একটি বোমা রেখে তাঁব **চাপরাশির হাতে** দিয়ে আসা হল যাতে বইটা খোলামাত্র বোমাটা ফেটে যায়। চাপরাশি বইটা **টেবিলে** রাখল বটে কিন্তু কিংসফোর্ড তাঁর কোন বন্ধু পুরানো বই ফেরৎ দিয়েছেন মনে করে বইটা **আলমারীতে** ফেলে রাখলেন।"

কিংসফোর্ড বইটা আলমারীতে রাখতে গিয়ে লেফাফাটাও খেয়াল করলেন না?

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত "Freedom Struggle and Anushilan Samiti"তে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখিত এক নিবন্ধের (পৃঃ ১-৩২), ৩১ পৃষ্ঠায় আছে : "However, between 1906 and 1909, a series of political robberies, murders and murder attempts, a few abortive but a few successful too, took place, both in West and East Bengal, in which it was not only members of Barindra Kumar's group but of the Anushilan proper too, and of its affiliates were involved. Since all these have been fully documented and are fairly well known, I need not recount them. *It was during this time too that Barindrakumar, at the instance of Ullaskar Dutta, started a centre for manufacturing bombs at their family garden-house at Muraripukur in Calcutta. The bomb that was placed in a book addressed to Kingsford and the one that was thrown by Khudiram an the carriage that was supposed to carry Kingsford to Muzaffarpur, were manufactured at the factory at the Muraripukur garden-house.* (ইটালিক্‌স আমার)

পাছে এই অভিযোগ ওঠে যে, উদ্ধৃতিটি প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্নাবস্থায় দেওয়া হয়েছে এজন্য প্রথম তিন চারটি অনাবশ্যক বাক্যও তুলে দিয়েছি। কিন্তু যেটুকু প্রাসঙ্গিক হত সেটুকুর কি অর্থ তা আমার বোধগম্য হয়নি একথা আমি অকপটে স্বীকার করছি। এমন হতে পারে আমার সীমাবদ্ধ ইংরেজী জ্ঞানই তার অন্তরায়। প্রথমত, উক্তিগুলো তথ্যসম্মত নয়। উল্লাসের বোমায় হাতে-খড়ি তাঁর বাবার ল্যাবরেটরিতে, মুরারীপুকুর বাগান অবশ্যই বিস্ফোরক দ্রব্যের অন্যতম ভাঁড়ার ছিল, দেওঘরেও কিছু প্রস্তুতির ব্যবস্থা ছিল, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত যেখানে বলেছেন, "বোমা তৈরি হল পুরোপুরি একটা", সেটা ঠিক কোথায় সম্পূর্ণ হয়েছিল, উল্লেখ নেই, পরীক্ষাটা হয়েছিল দিঘিরিয়া পাহাড়ে এবং ওঁদের আস্তানা ছিল দেওঘরে। দ্বিতীয়ত, এই সময় বলতে কি ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ ? তৃতীয়ত, বলা হয়েছে, উল্লাসকরের ইচ্ছাক্রমে বা উদ্যোগে বারীন্দ্রকুমার তাঁদের পারিবারিক বাগান-বাড়িতে বোমা তৈরি শুরু করলেন। কি তথ্যের বলে লেখক একথা এতটা জোর দিয়ে বললেন ? উল্লাসকরের বোমা-ক্রিয়াকাণ্ডের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া

যায় তিন জায়গায় (১) শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (২) দেওঘর-দিঘিরিয়া (৩) হেমদাসের ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর দক্ষিণ কলকাতার কোন এক আড্ডায় (৪) গোপীমোহন দত্ত লেনে (৫) হ্যারিসন রোডে। বাগানবাড়িতে কিছু বোমার খোল অবশ্যই ছিল। অথচ লেখক কোন সন্ধানে এই বলে কর্তব্য সেরেছেন যে, এগুলো "fully documented and I need not recount them." ভাল কথা, পরবর্তী স্থূলাক্ষরের কথাগুলোর অর্থ কি? **কিংসফোর্ডের ঠিকানার উদ্দেশে বই-বোমা** [প্রেরণ?] এবং [পরমাশ্চর্য!] **যে গাড়ি কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুর বয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা** তা লক্ষ্য করে যে বোমা ক্ষুদিরাম ছুঁড়েছিলেন—সে দুটি মুরারীপুকুর বাগান-বাড়িতেই প্রস্তুত হয়েছিল। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, প্রখ্যাত গবেষক ডঃ নীহাররঞ্জন কি "well documented" তথ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে এলেন? এই দুই বোমাই হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ফ্রান্স থেকে ফেরার পর এবং নিঃসন্দেহে যুগ্মপ্রচেষ্টায়—যদিও হেমচন্দ্র দাস উল্লাসকরকে হেয় করবার চেষ্টা করেছেন। আর ডঃ রায়! *"the carriage that was supposed to carry Kingsford to Muzaffarpur"* এই অনবদ্য গবেষণা-লব্ধ ফল যে রীতিমত ঐতিহাসিক বিপ্লব! কোন্ গাড়ির কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুর নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং সে কোন্ গাড়ি যা লক্ষ্য করে ক্ষুদিরাম বাগানবাড়িতে প্রস্তুত বোমা ছুঁড়েছিলেন? ক্ষুদিরামই যে বোমা ছুঁড়েছিলেন একথা দায়রা-জজ, হাইকোর্ট-বিচারপতিও নিঃসংশয়ে বলতে পারেন নি। যে-ই ছুঁড়ুক ক্ষুদিরাম সঙ্গী ছিলেন এই তো উপসংহার—সেই অপরাধেই মৃত্যুদণ্ড। বই-বোমার ব্যাপারেও কিংসফোর্ডকে হত্যা-প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে এই বইখানির পাঠক হকচকিয়ে যাবেন যদি রায় মশাইর ইংরেজী বয়ান-পাঠ আমার ঠিক হয়ে থাকে। অবশ্য বইখানির সম্পাদনায়ও কিছু ত্রুটি আছে এবং এই ত্রুটির ফলে মারাত্মক একটি ভুলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সূত্র—মতিলাল রায়ের 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী'। আলোচ্য গ্রন্থের লেখাটা অবশ্য সরলকুমার চ্যাটার্জির। তাঁর পরিচয়ে আছে ডঃ এবং কোন এক কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান। ১৯৩৫-এ জন্ম। তিনি লিখেছেন:

Kshudiram was arrested, tried and hanged. *Unable to withstand the brutal torture Kshudiram was com pelled to give clue to the police acting on which the latter rounded up almost*

all persons connected with Aurobindo and Barin on 2 May 1908. (p. 40)। এ ভুল আমি দেখিয়েছি।

সমুদ্রগুপ্ত তাঁর "বঙ্গভঙ্গ" বইখানির ২৮৭ পৃঃ লিখেছেন : কিংসফোর্ড থাকেন তখন তাঁর **টালীগঞ্জের বাড়িতে**। একদিন পড়ার টেবিলে আবিষ্কার করলেন একটা বিরাট বই। কিংসফোর্ড ভাবলেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে পড়তে নিয়ে যাওয়া বইই পাঠিয়েছেন ফেরত। স্নতরাং তিনি খুললেন না। খুললে ? খুললে সেইদিনই সেইখানেই স্বর্গলাভ ঘটতো তাঁর নিমেষে।

"সেটা ছিল কিংসফোর্ড হত্যার প্রথম উদ্যোগ। ভার পড়েছিল পরেশ মৌলিকের ওপর। 'যুগান্তর কাগজের অন্যতম স্তম্ভ, আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের 'শহীদ যুগল' বইয়ের ভূমিকায় ব্যক্ত করেছেন সেই গোপন কাহিনী। 'কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রথম চেষ্টা এই পরেশের দ্বারাই করানো হয়। সে আরদালীর বেশে একটা খুব **মোটা আইন বইয়ের মধ্যে** একটি বোমা নিয়ে কিংসফোর্ডের চাপরাসীর কাছে **খুব চতুরতার সঙ্গে** দিয়ে আসে। চাপরাসীর সঙ্গে ভাবটাব **করে নানা গল্পগুজব ও পান বিড়ি খাইয়ে তার হাতে বইটা দিয়ে কিংসফোর্ডের পড়ার টেবিলের ওপর রাখবার ব্যবস্থা করে।** বইটার প্যাকিংএর ওপর যথারীতি কিংসফোর্ডের নাম লেখা ছিল। বইটার কভার না কেটে ভেতরটা কেটে তার মধ্যে বোমা স্থাপন করে ভালভাবে প্যাক করা হয। বোমার সঙ্গে একটি স্প্রীং দিয়ে কভারের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। কভারের বাঁধন খোলামাত্র স্প্রীং-এর জোরে কতকটা ত্রিং করে লাফিয়ে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বোমাটার বিস্ফোরণ ঘটবে।

"বইটা নিয়ে যাওয়ার কালে চাপরাসী বলে—বহুত ভারী হ্যায়। পরেশ হাসতে হাসতে বলে—এসব বাবা বড়লোকের বই, আমরা ও সবের কি বুঝি। বইটা বহুদিন যাবৎ অ-খোলা অবস্থায়ই পড়ে থাকে। যখন খোলা হয় তখন উহার মধ্যে বোমা পাওয়া যায়, কিন্তু স্প্রীংটা জং ধরে ও বাঁধনের চাপে কার্যকরী হয় না।"

আরদালী বনাম চাপরাসীর সংলাপ কাহিনীকে বৈশিষ্ট্যময় করে তোলার কৃতিত্ব সমুদ্রগুপ্তের, তাঁর আরও বহু বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে বলা যাবে।

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র "Boy Revolutionary of India"-য় ঐ কাহিনী বর্ণনায় প্রধানতঃ রাউলট কমিটি রিপোর্ট ও হেমচন্দ্র কানুনগোর বইয়ের ওপর

নির্ভর করে মুখপাতে বলেছেন, "The first attempt to kill Mr. Kingsford was made when he was in Calcutta and was residing in a house at *Garden Reach.*

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত তাঁর "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি"-তে লিখেছেন, "অরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক এবং চারু দত্ত জজের গোপন বিচারে কিংসফোর্ড প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করার জন্য একখানি বড় পুস্তকেব মধ্যে সুকৌশলে বোমা স্থাপন করে তা প্যাক করে দলের পরেশ মৌলিক গিয়ে সাহেবের আরদালির হাতে দিয়ে এলেন তাঁর ভবনে। ব্যবস্থা এরূপ ছিল যে প্যাক খুলবার সময়ে যেটুকু চাপ পড়বে তাতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু আরদালী বইখানা সাহেবের হাতে না দিয়ে **আলমারিতে** রেখে দেয়। ফলে, সে-যাত্রা কিংসফোর্ড রক্ষা পেলেন। বোমার মামলার স্বীকারোক্তিতে বিষয়টি জানা যায় (পৃঃ ৩৪)।

"ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস"-লেখক সুপ্রকাশ রায় একেবারে চরম কাণ্ড করেছেন। তিনি লিখেছেন, (পৃঃ ১৬৯), সে বই বোমাবই। "সেই পার্শেলটি কিংসফোর্ড নিজে না খুলিয়া অন্য একজনকে খুলিবার জন্য দেন। যে চাপরাসীটি ইহা খুলিয়াছিল সে বোমা-বিস্ফোরণে নিহত হয় (পৃঃ ১৬৯)।

বৈপ্লবিক ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার। ঐ বোমাসহ কলকাতায় দুইবার দুটি প্রদর্শনী হয়েছে, ছয়শতাধিক পৃষ্ঠার গ্রন্থকার একটি প্রদর্শনীও দেখেন নি? কিন্তু চাপরাসীটিকে যে মেরে ফেললেন তার পরিণতি কিভাবে কোথায় গড়ালো তা তো পাঠককে উপহার দিলেন না!

বহু জীবনী-লেখক শ্রীমণি বাগচী তাঁর "বিপ্লবী রাসবিহারী বসু" বইখানির ১৭ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তাও কল্পনাবশে কম চাঞ্চল্যকর নয়। "সুশীলকে বেত মারার খবর গিয়ে পৌঁছল বিপ্লবী নেতাদের কাছে। তাঁরা কিংসফোর্ড নিধনের ব্যবস্থা করেন। এক নূতন ব্যবস্থা। বই-এর ভেতরে বোমা। **উল্লাসকর দত্ত তৈরী করেছিলেন এই বিচিত্র বোমা।** একটা মোটা বইয়ের পাতা কেটে একটা গোল করে তার ভেতরে **বোমাটি নিজের হাতে বসাল ক্ষুদিরাম। ডাকযোগে সেই বই-বোমা গেল কিংসফোর্ডের কুঠিতে।**

(১১)

দুর্ভাগ্যবশত এইভাবেই আমাদের বিপ্লবী সাহিত্যের রচনা হয়েছে। কালীপদ বাগচীর বইখানিও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে, অন্য অনেক বইয়ের মতো কোন কোন ক্ষেত্রে এই বইটিও নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠেনি। বারীন্দ্রকুমারের বিবরণে দেখা যায়, মুরারীপুর বাগানে কিংসফোর্ড-নিধন প্রফুল্ল-প্রস্তাবিত এবং বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-সমর্থিত ("ত্রয়ীর" বাযের সঙ্গে এর কোন অসামঞ্জস্য নেই)। কিন্তু, কালীপদবাবু বলেছেন, "কর্মী নির্বাচনের ভার পড়িল উপেন্দ্রনাথের উপরে। তিনি প্রফুল্লকে নির্বাচিত করিলেন। আর অন্য সাথী নির্বাচন করিলেন **সত্যেন্দ্রনাথ বসু।**" (পৃঃ ৪৯-৫০) পক্ষান্তরে, হেমচন্দ্র দাস তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "অবশেষে **মেদিনীপুর সমিতির কাউকে কিছু না জানিয়ে** ক্ষুদিরামকে আনানো হয়েছিল।" বারীন্দ্রকুমার বলেছেন, হেমচন্দ্রের সুপারিশে ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লর সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে? নিঃসন্দেহে বারীন্দ্র-হেমচন্দ্রের। তাঁদের বিশদ বিবৃতিগুলো এই: বারীন্দ্রকুমার—"প্রফুল্ল জেদ ধরল, সে বোমা ফেলে কিংসফোর্ডকে মারবে। হেমচন্দ্র ও উল্লাস ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে একটা হাতলওলা বোমা তৈরি করলেন। আমি ও উপেন্দ্রনাথ সায় দিলাম। হেমচন্দ্র ক্ষুদিরাম বসু বলে মেদিনীপুরের একটি ছেলের নাম সুপারিশ করলেন। তাকে যেতে দেওয়া হল। আমরা তাদের বিভলভারও দিলাম। বিভলভার দিলাম এজন্য যে, ধরা পড়ার উপক্রম হলে আত্মহনন করবে তারা এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। আমি প্রফুল্লকে ৩২ নং মুরারীপুকুর রোড থেকে ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে এনেছিলাম।"

হেমচন্দ্র দাস বলেছেন, "মেদিনীপুর সমিতির কাউকে কিছু না জানিয়ে ক্ষুদিরামকে আনান হয়েছিল। সপ্তাহখানেক তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে পূর্বোক্ত প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে মজঃফরপুর পাঠান হল। তারা সন্ধ্যেবেলা যাত্রা করেছিল বলে পুলিশ খোঁজ পায়নি। তাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ছিল, কাজ হাসিল করার পূর্বে সাঙ্কেতিক প্রথায় আমাদের খবর দেবে। তখন আমরা গা ঢাকা দেব।" (বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃঃ ২৬৭)

কিন্তু কালীপদবাবু তাঁর কল্পনার রথ অব্যাহত ছুটিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন: "সুস্থির হইল উভয়ে গিয়া **মজঃফরপুরে মিলিত হইবেন।** কে কোথায় যাইতেছেন জানিবেন না, কেউ কারও নাম জানিবেন না। প্রফুল্ল উপেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, সাথীর প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁর সে অনুরোধ

বঞ্চিত হয় নাই। তাহার উপরে আদেশ ছিল যদি কোন কারণে ধৃত হও রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করিবে (পৃঃ ৫০)।

"রেলে দুইজন যাত্রা করিল কিন্তু কে কোথা হইতে রওনা হইল উভয়ে তা জানিল না। প্রথম সাক্ষাৎ ও মিলন হইল মজঃফরপুরে। ক্ষুদিরাম জানিল প্রফুল্লর নাম দীনেশ। কলিকাতা হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, গোয়েন্দা পুলিশ অনুসরণ করিয়াছে কি না নিশ্চিত হইয়া তাঁহারা যেন স্থায়ী বাসা করেন। স্টেশন হইতে পৃথকভাবে রওনা হন। দীনেশ কোথায় আহার করিয়াছিলেন ক্ষুদিরাম জানিতেন না, ক্ষুদিরাম নবাগত ছাত্র হিসাবে রায় উপাধিধারী এক বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন। পরে পৃথক পৃথক ভাবে ধর্মশালায় যান। সেদিন ছিল ২৮ এপ্রিল সোমবার (পৃঃ ৫১)।

বিশ্বাস হতে পারে, যে-লেখক দিন-তারিখ এমন নির্দিষ্ট করে বলেন, তাঁর ভুল হতে পারে না। কিন্তু তাঁর ভুল না হলে ভুল নিশ্চয়ই বারীন্দ্রকুমার ও হেমচন্দ্র দাসের—যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আবার ঐ দুই সংশ্লিষ্ট নেতার কথা যথার্থ হলে কালীপদবাবুর মতে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের মজঃফরপুরে মিলিত হবার "সুস্থিরতা" বেঠিক প্রতিপন্ন হয়। এবং কালীপদবাবুর তারিখ সমেত এই সব কথাই যে বেঠিক তা যথাস্থানে দেখানো যাবে। আপাতত শুধু মজঃফরপুর যাত্রা প্রসঙ্গ। বারীন্দ্রকুমার ও হেমচন্দ্রের কথাগুলো যদি ঠিক হয় তবে এইটিই সুস্থির যে, বারীন্দ্রকুমার প্রফুল্লকে গোপীমোহন দত্ত লেনে নিয়ে আসেন, হেমচন্দ্র ক্ষুদিরামকে আনিয়ে বুঝিয়ে পড়িয়ে প্রফুল্লর সঙ্গী করে দেন। দুজনের জন্য দুটি রিভলভার দেওয়া হয়, ধরা পড়ার মুহূর্তে যেন আত্মহননে প্রয়োগ করতে পারেন। হেমদাসের মতে একটাই নির্দেশ ছিল—ঘটনা হাসিলের আগে সাংকেতিক প্রথায় খবর দেওয়া—যেন সবাই গা-ঢাকা দিতে পারেন। প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম গোপীমোহন দত্ত লেনে মিলেছিলেন এবং হেমদাসের মতে তাঁরা সেখান থেকে একসঙ্গে সন্ধ্যেবেলা যাত্রা করেছিলেন।

"শহীদ ক্ষুদিরাম" লেখক ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র লিখেছেন: বিপ্লবীদলের গুপ্তচক্রের সিদ্ধান্তের ফলে প্রফুল্লচন্দ্র চাকী ও ক্ষুদিরামের উপর মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার ভার অর্পিত হইল) **প্রফুল্লচন্দ্র তখন মুরারী-পুকুর বাগানের বিশিষ্ট কর্মী।** হেমচন্দ্র কানুনগোর প্রস্তাবে ও **সত্যেন্দ্র নাথের সমর্থনে** ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লচন্দ্রের সহকর্মীরূপে মনোনীত করা হয়" (পৃঃ ১০২)।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "বিপ্লবীযুগের কথা"য় বলেছেন : **"মেদিনীপুরের জ্ঞান বসুর সুপারিশে** ক্ষুদিরাম বসুকে বারীন্দ্রের অনুচর প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে দেওয়া হয়—নাম দীনেশচন্দ্র রায় ও দুর্গাদাস সেন (পৃঃ ৩৫)।

তাহ'লে আপাতত ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—বারীন্দ্রকুমার বলছেন, হেমদাসের সুপারিশে, হেমদাস বলছেন, মেদিনীপুরের কাউকে কিছু না জানিয়ে ক্ষুদিরামকে আনানো হল, বুঝিয়ে পড়িয়ে প্রফুল্লর সঙ্গী করা হল, ঈশানচন্দ্র বলছেন, হেমচন্দ্র কানুনগোর প্রস্তাবে ও সত্যেন্দ্রনাথের সমর্থনে, প্রভাতচন্দ্র বলছেন, জ্ঞান বসুর সুপারিশে ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লর সঙ্গে দেওয়া হয়। কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? মেদিনীপুরের কাউকে কিছু না জানিয়ে ক্ষুদিরামকে আনানো মিথ্যে হয়ে পড়ে, মেদিনীপুরের জ্ঞান বসু ও সত্যেন বসু যেখানে হাজির। এঁদের নিয়েই মেদিনীপুর সমিতি। শুধু তাই নয়, ঈশানবাবু এর পরে যা বলেছেন, তাতে কেবল হেমচন্দ্র, জ্ঞান, সত্যেনই নয়, অনেকে ক্ষুদিরামের যাত্রার খবর জানত বা জানতেন।

ঈশানবাবু জানিয়েছেন, ক্ষুদিরাম জুতো কিনলেন, বন্ধু পূর্ণ রাউতের সঙ্গে এ নিয়ে রঙ্গ রসিকতা হল। ইত্যাদি। এর চেয়ে বরং ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র মশাইর "Boy Revolutionary of India", ৪১-৪৩ পৃষ্ঠায় যা আছে তা তুলে দি :

"With that object [to kill Mr. Kingsford] in view Khudiram and Prafulla Chaki of Bogra *started for Muzaffarpore with bombs and revolvers.* We are told by *Sm. Sarla Bala Basu, sister of Satyendra Nath Basu* that Khudiram left for Calcutta on his way to Muzaffarpore from the house of Satyendra with his blessings. Khudiram appeared very cheerful when he left Midnapore.

"We have got from *Babu Purna Chandra Rout of Nandigram,* District Midnapore, who was a classmate of Khudiram in the Collegiate School, Midnapore, and very intimate with him that about *a week before* Muzaffarpore outrage Khudiram was seen by Purna Babu purchasing a pair of shoes in a shop at Burra Bazar, Midnapore Town. Purna Babu knew that

Khudiram had practically given up the habit of wearing shoes and therefore he asked Khudiram as to what he would do with a new pair. Khudiram said with a smile that the new pair would be used on the occasion of *his marriage* which was going to be performed very soon. Purna Babu also knew that Khudiram on several occasions told him that he would never marry. *This change of mentality of Khudiram surprised* Purna who immediately *enquired* as to where was his marriage going to be performed, Khudiram answered, "Towards North." On being *further asked* about the date of his return with his newly married wife and whether he would give his friends a feast on the 'Boubhat Day', Khudiram promptly said that there was every chance of his being taken as a domesticated son-in-law there and in that case he might not come back to Midnapore to entertain his friends on the ceremony. His tone was so very natural that Purna Babu had no occasion to suspect the veracity of his statement. *Within a week* from this talk Khudiram was reported to have thrown bomb at Muzaffarpore. It can safely be presumed that Purna Babu's talk with Khudiram regarding his marriage had a distinct bearing on his visit to Muzaffarpur.'

পক্ষান্তরে, এটি এমন একটি সময় যখন মেদিনীপুরে নারায়ণগড় ট্রেন দুর্ঘটনার ছায়াপাত হয়েছে বলে পুলিস দাবি করেছে, মেদিনীপুরের আখড়ায় আখড়ায় পুলিসের নজর নিবদ্ধ রয়েছে, ক্ষুদিরাম রাজদ্রোহী পুস্তিকা বিতরণের দায় থেকে দায়রা-অভিযোগমুক্ত ও সম্বর্ধিত, সুতরাং পুলিসের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন, জ্ঞান বসু, সত্যেন বসুও তদ্রূপ, সত্যেন বসু চাকরি থেকে বরখাস্ত। এমন সময়ে বাজার মাতিয়ে এত লোকের জানাজানির মধ্যে ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ড হত্যার মতো একটি অতি গোপন কাজে যাচ্ছেন, গুপ্ত সমিতির রীতিনীতির সঙ্গে এটি একান্তই বেমানান এবং গ্রহণযোগ্য নয়'।

হেমচন্দ্র (দাস) কানুনগোকে সাক্ষ্য মেনে ঈশানবাবু "বাংলায় বিপ্লব

প্রচেষ্টা" (পৃঃ ২৭১-৭২) থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটিও ভুল। কার ভুল সেটি অবশ্যই বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। উদ্ধৃতিটি এই: "When they left Calcutta they were instructed to dress themselves as men of different provinces and as soon as the bomb would be thrown they ould have to change dress again and pass as ordinary Bengalee. It was reported that they did not follow the insructions to the letter. They were further instructed to throw away the revolvers immediately after the bomb-throwing which they did not do. Khudiram had a great fascination for revolver which probably prevented him from parting with them after the occurrence. Each of them was given one rovolver but Khudiram took additional one without informing any body," (Boy Revolutionary p. 44)

ভিন্‌দেশী পোষাক তাঁরা পরেন নি, ঘটনার পর বাঙালি পোষাক নেন নি। বিপ্লবী দলের আদেশ মাত্রই দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে পালিত হয়নি। সন্দেহ জাগে, আদৌ এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কি না, অন্তত প্রফুল্ল চাকী শেষ মুহূর্ত পযন্ত যেভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন তাতেই এ সন্দেহ জাগে। যেটা দরকার ছিল তা হচ্ছে 'দেহাতি' ভাষায়, অর্থাৎ মজঃফরপুর অঞ্চলে বিহারী ভাষার প্রশিক্ষণ এবং আক্রমণ-ব্যবস্থার সঙ্গে পলায়নের আশ্রয় ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, হাতের বিভলভার ফেলে দেওয়া। যেখানে মুরারীপুকুর বাগান-কর্তারা দশ বারোটার বেশি রিভলভার জোগাড় করতে পারেন নি সেখানে বিভলভার ফেলে দেবার পরামর্শ যেমন সহসা সহজগ্রাহ্য নয় তেমনি ধরা পড়ার উপক্রমে আত্ম-হননের প্রতিশ্রুতি বা ইচ্ছার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তৃতীয়ত, বারীন্দ্রকুমার দুটি বিভলভারের কথা বলেছেন, দুটিই ক্ষুদিরামের কাছে পাওয়া গেছে। কি করে? মামলার বিবরণ দেবার সময় এর কারণ উদ্ঘাটিত হবে। চতুর্থত, প্রফুল্ল যা দিয়ে আত্মহনন করেছিলেন তা এ দুটির একটিও নয়, তাঁর কাছে ছিল ব্রাউনিং পিস্তল, সেটিই তিনি প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁর নিষ্প্রাণ দেহের সঙ্গে সেটি পাওয়া যায়। পঞ্চমত, ক্ষুদিরাম—বারীন্দ্রকুমারের বিবৃতি মতো—বাগানেরও কেউ নন, গোপীমোহন দত্ত লেনেরও কেউ নন—কোথায় বন্দুক-বোমা, তাঁর জানবার কথা নয়, কি ক'রে তিনি সবার অজ্ঞাতে অতিরিক্ত একটি রিভলভার

হাতালেন? বিপ্লবীদলের নিয়ম বা আইনমতে এ অপবাধ। হেমচন্দ্র বাংলা বইয়ে বলেছেন, ক্ষুদিবামের ঐ জিনিসটার ওপর অত্যধিক অনুরাগ ছিল।·· মজঃফরপুরে যাবাব সময়ে দুজনে দুটি নিয়েছিল। অধিকন্তু না বলে সে [ক্ষুদিবাম] আবও একটা নিয়েছিল। যেখানে বিভলভার থাকত তা সে জানত" (পৃঃ ২৭১)।

মুবাবীপুকুব বাগান অস্ত্রেব ভাণ্ডাব। নবকৃষ্ণ স্ট্রীট হেমচন্দ্রেব বাসস্থান। গোপীমোহন দত্ত লেন বোমা তৈবিব আস্তানা, এখানে বিভলভাবের ভাঁড়াব ছিল না। কোথায় রিভলভার থাকত ক্ষুদিবাম কি ক'বে জানবেন বা জানলেন বোধগম্য নয়। বাবীন্দ্রেব কথাব সঙ্গে, প্রফুল্লব ব্রাউনিং পিস্তলেব সঙ্গে হেম দাসেব কথাব এতই অসঙ্গতি যে, তা গ্রাহ্য করলে একটি ব্রাউনিং পিস্তল+দুটি বিভলভাবেব বাস্তব অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যায়। মামলাব বিবরণে (ক্ষুদিরামেব বিবৃতিতে) হেমদাসেব কথাটি যে ভিত্তিহীন তা প্রতিপন্ন হবে। আপাতত মজঃফবপুব যাত্রা প্রসঙ্গ।

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র ক্ষুদিবামের মজঃফবপুব যাত্রাব উদ্যোগে নতুন জুতো কেনা, বিয়ে, বৌভাত ইত্যাদি নিয়ে রহস্যালাপেও ক্ষান্ত হন নি, তিনি আরও খবব দিয়েছেন, "**ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর যাত্রার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকক্ষণ পরামর্শ করেন,** খাওয়া-দাওয়া কবেন, যাত্রাকালে পদ-ধূলি নেন। সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুব স্টেশনে তাকে তুলে দিয়ে আসেন। ক্ষুদিবাম কলকাতা পৌছে হেমচন্দ্রের কাছে যান। দু' একদিন পব তিনি ও প্রফুল্ল চাকী বাবীন্দ্রকুমাব ও হেমচন্দ্রের আশীর্বাদ নিয়ে মজঃফবপুর রওনা হন" (পৃঃ ১০৪)।

অর্থাৎ, ঈশানচন্দ্রেব কাহিনী গ্রহণ করলে আশীর্বাদক বাবীন্দ্রকুমাব ও হেম চন্দ্রেব বিবৃতি অগ্রাহ্য করতে হয়। এবং একইভাবে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়েব জ্ঞান বসুব কথাও। কিন্তু যেহেতু ঈশানবাবু বা প্রভাতবাবু ঘটনা-পবম্পবাব কুশীলবদেব কেউ নন, বাবীন্দ্র-হেমচন্দ্রেব বিবরণ গ্রহণ কবাই নিরাপদ। সামঞ্জস্যপূর্ণও। সত্যেন্দ্রনাথ বসুব সঙ্গে "অনেকক্ষণ পবামর্শ" ও স্টেশনে তুলে দেওয়াব পবও কলকাতায় হেমচন্দ্রেব আবাব বোঝানো পড়ানো কেমন অবান্তর হয়ে পড়ে। তবে ঈশানবাবু পাঠককুলের এইটুকু মহদুপকার কবেছেন যে, তিনি প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে এদিক-ওদিক না ক'রে সোজা মজঃফরপুরের ধর্মশালায় নিয়ে তুলেছেন।

শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ তাঁর "অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র" বইখানিতে লিখেছেন, "যে-বোমায় মজঃফরপুরে হত্যা সাধিত হয় তা এইখানে [গোপীমোহন দত্ত লেনে] হেমচন্দ্র প্রস্তুত করেন (পৃঃ ১৩৫)। মজঃফরপুরে দু'জনকে পাঠান স্থির হয়। একজন বাগানের, একজন হেমচন্দ্রের। বাগানের প্রফুল্ল চাকী। কিন্তু এই নির্বাচনেও হেমচন্দ্রের হাত। [পূর্ববঙ্গ ও আসামের] লাট [স্যার ব্যামফিল্ড] ফুলারের বধ চেষ্টায় প্রফুল্ল চাকীই হেমবাবুর সহযোগী ছিলেন (পৃঃ ১৩৫)। ক্ষুদিরাম কলিকাতায় পৌছে হেমবাবুর ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের বাসায় যান, সপ্তাহকাল ধরে হেমচন্দ্র তাঁকে ও প্রফুল্লকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেন। তারপর **একদিন** সন্ধ্যাবেলা পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে দু'জনে মজঃফরপুর রওনা হয়ে যান। ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লর আসল নাম জানতে দেওয়া হয়নি। যাওয়ার সময় ক্ষুদিরাম দুটি রিভলভার, প্রফুল্ল একটি রিভলভার সঙ্গে নেন। হেমবাবুর বোমা তো ছিলই" (পৃঃ ১৩৬)।

বলা বাহুল্য, বিনয়বাবু হেমবাবুর বইয়ের তথ্যগুলো ব্যবহার করেছেন নিজস্ব ভঙ্গীতে। ফলে, একটু গোলমাল হয়ে গেছে। প্রথমত, প্রফুল্ল চাকীর নির্বাচনে হেমচন্দ্রের হাত কি করে কোথায় দেখলেন ? হেমচন্দ্রও একথা বলেন নি, বারীন্দ্রকুমারও নয়। বিনয়বাবু হেমদাসের সপক্ষে একটা কারণও দিতে চেষ্টা করেছেন : স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের বধ-চেষ্টায় প্রফুল্ল চাকীই হেমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। পক্ষান্তরে, বারীন্দ্রকুমার বলেছেন, "আমি ও উপেন্দ্র স্থির করি যে, এই কাজের ভার দেওয়া হইবে প্রফুল্ল চাকীকে। ·আমি প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া মুরারীপুকুর হইতে গোপীমোহন দত্ত লেনে যাই" (প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী যুগের কথা'য় উদ্ধৃতি, পৃঃ ৯৬)। দ্বিতীয়ত, বারীন্দ্রকুমার বলেছেন, "হেমচন্দ্রের সুপারিশে মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুকে সঙ্গী হইতে দেওয়া হয়। আমি দুইজনকে দুইটি রিভলভার দিয়াছিলাম। কারণ ধরা পড়িবার উপক্রম হইলে, তাহারা ধরা না দিয়া আত্মহত্যা করিবার মনস্থ করিয়াছিল" (ঐ, ঐ)। বিনয়বাবু যে দুটি রিভলভারের কথা বলেছেন, এ সেই দুটি রিভলভার, ক্ষুদিরাম ঐ দুটি সুদ্ধ ধরা পড়েন। কেন কিভাবে দুটি রিভলভারই ক্ষুদিরামের হেফাজতে গেল মামলার বিবরণে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর, প্রফুল্ল চাকী যে আগ্নেয়াস্ত্রে আত্মহনন করেন সেটি ব্রাউনিং পিস্তল, বিনয়বাবু-কথিত রিভলভার নয়। বারীন্দ্রকুমার আরও বলেছেন, "ক্ষুদিরাম আমাদের দলের লোক ছিল না এবং সে মানিকতলা বাগান কিংবা গোপীমোহন দত্ত

লেনের ব্যাপার জানিত না" (ঐ ঐ)। আসলে, এসব কথা বারীন্দ্রের প্রাথমিক স্বীকারোক্তির অন্তর্গত। তারই উদ্ধৃতি।

মতিলাল রায় তাঁর "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী"তে লিখেছেন: "শ্রীশচন্দ্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুইজন তরুণ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য মোজাফরপুরে গিয়াছে। প্রস্তুতির অভাব হয় নাই। হেমদাসের বোমা এবং দুইজনের হাতে দুই রিভলভার দেওয়া হইয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, এই দুইটি তরুণ প্রস্থানকালে অরবিন্দের চরণে প্রণত হইলে তিনি তাহাদের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ জানাইয়াছেন। কানাইলালের সহিত তাহারা সাক্ষাৎ করিয়াছে। কানাইলাল দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিয়াছে—প্রাণের ভয় না রাখিতে। অব্যর্থ কার্যসিদ্ধির পর যদি ধরাই পড়িতে হয়, আত্মনাশ সেই অবস্থায় অবশ্যই করণীয়" (পৃঃ ২১)। ঠিক ওর অব্যবহিত আগে ১৯ পৃষ্ঠায় মতিলাল রায় আরও বলেছেন, "কানাই বলিল, সম্ভবত আমি মোজাফরপুর যাইব। কিংসফোর্ডকে চিরবিদায় দিতে হইবে। সে কোথাও নিষ্কৃতি পাইবে না—বৃটিশ কর্তৃপক্ষদের একথা বুঝাইতে হইবে।"

সমগ্র ব্যাপারটাই কেমন জট পাকিয়ে গেল। অরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক, চারু দত্তের ট্রাইবুনাল বা ত্রয়ী কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের বিধান করেছেন। বারীন্দ্র-উপেন প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে এলেন গোপীমোহন দত্ত লেনে, হেমদাস ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লর সঙ্গী করে দিলেন। স্কট লেনে না গ্রে স্ট্রীটে মতিলাল বলেন নি, কিন্তু প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম এ দুটির একটি ঠিকানায় এলেন, অরবিন্দ আশীর্বাদ করলেন। কানাইলাল অবশ্যই গোপীমোহন দত্ত লেনে থাকতেন। ওদিকে ঈশান মহাপাত্রের মতে ব্যাপারটি সত্যেন বসুর এবং প্রভাতচন্দ্রের মতে জ্ঞান বসুর গোচরে ছিল। নিতান্তই বারীন্দ্র-উপেন্দ্র, প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম নয়, আরও অনেকে,—যেমন, শ্রীশ এবং আভাসে-ইঙ্গিতে পূর্ণ বাউত মশাইও। অবশ্য এমন কাণ্ড বিরল নয়, ঘটনার পরে অনেকেই ঐ ব্যাপারে সক্রিয় অংশীদার হবার দাবি করে থাকে কিন্তু বলবার সময় কিছু উল্টোপাল্টা বলে ফেলে।

"বাঙ্গলার বিপ্লবী সংস্থা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ১৯০৮ মার্চ ২৮এ কিংসফোর্ড কলিকাতা থেকে বদলি হয়ে যান। স্থান পরিদর্শনের জন্য **প্রথমে যান প্রফুল্ল চাকী ও সুশীল সেন।** পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদে সুশীল কলিকাতায় ফিরে আসেন। পরে হেমচন্দ্র দাস ক্ষুদিরামকে

মনোনীত করলে **তিনি ২৯-এ এপ্রিল মজঃফরপুর যান এবং ষ্টেশনে প্রফুল্লর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ;** তৎপূর্বে পরস্পরের পরিচয় ছিল না।"

এ গল্পটি আছে শ্রীকালীচরণ ঘোষের "জাগরণ ও বিস্ফোরণ", দ্বিতীয় খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠায়। এ গল্পটি যদি সত্য হয় তবে পরে সাক্ষী কিশোরীমোহন ব্যানার্জি সমেত সকলের বিবৃতি, জবানবন্দী ও সাক্ষ্যে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের মজঃফরপুর আগমন ও অবস্থিতির যে তারিখ-বৈষম্য নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটেছে তার একটা সুরাহা হয়। কিশোরীমোহনের সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুই কিস্তিতে প্রফুল্লর আগমন-নির্গমনের তারিখ স্থির করা যায়। গল্পের এদিকটা যদিও আকর্ষণীয় ২৯ এপ্রিল ক্ষুদিরামের মজঃফরপুর যাওয়ার তারিখটি ঐ গল্পকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তোলে। ৩০ এপ্রিল ঘটনা, ২৯ এপ্রিল গেলেন ? কালীচরণবাবু নিজেই অব্যবহিত পরের অনুচ্ছেদে তা অসম্ভব করে তুলেছেন। পরের অনুচ্ছেদে আছে: "কলিকাতা থেকে পাঠানো হল মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু আর রংপুরের দীনেশচন্দ্র রায়কে (ওরফে প্রফুল্ল চাকী)। **তাঁরা** ১৯০৮ এপ্রিলের **১৭-১৮ তারিখ** মজঃফরপুর পৌছান এবং এক ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন" (পৃঃ ২২৫)। ২৯ এপ্রিল অসম্ভব, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা ১৭-১৮ কি করে রূপান্তরিত হল ? একশ বই নয়, এই একখানা বইয়ের গা ঘেঁষাঘেঁষি তারিখ-ভেদ পাঠকের পক্ষে ও ইতিহাসের পক্ষে কি দুর্গতি !

সব চাইতে হাস্যকর গল্প ফেঁদেছেন আমাদের সেই সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বলে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি এইচ কিংসফোর্ডকে করেছেন "আলিপুরের দায়রা জজ"। তিনি লিখেছেন (প্রতিটি বাক্য এক একটি অনুচ্ছেদে সাজানো): "দলপতিগণ তাই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন, এই অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে খতম করতে হবে। কিন্তু খতম করবে কে ? **সবাই এগিয়ে এলেন।** সবাই বললেন, আমি করব। দল সমস্যায় পড়ে গেল। খাঁটি কর্মী বেছে নেবার জন্য জানাল, কিন্তু বড় বিপজ্জনক কাজ, যে বা যারা একাজে নামবে, তাদেরও প্রাণদানের জন্য সব সময়ে তৈরী থাকতে হবে। **তবু সবাই বললেন, আমি করব।** যেন—হাসিমুখে প্রাণ / কে করিবে দান / তারি লাগি কাড়াকাড়ি। **এই কাড়াকাড়ি বন্ধ করবার জন্যে দল এবার কর্মী নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন।** বিশেষ বিবেচনার পর তরুণ যুবক প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরাম বসুর উপর এই কাজের ভার দেওয়া হল। **যাঁরা চাকীকে সমর্থন করেছিলেন,** তাঁরা চাকীর

বুদ্ধি মেশান বীর্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। **যাঁরা বসুকে সমর্থন করে-ছিলেন,** তাঁবা বসুর নির্ভীকতার কথা বর্ণনা কবেছিলেন। প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম এই দায়িত্ব লাভ করে তৃপ্তিব হাসি হাসলেন। **বারীন ঘোষ এসে তাঁদের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, কিন্তু যদি ধরা পড় ?** তাঁরা বারীন ঘোষের মুখেব দিকে জিজ্ঞাসুব দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। **বারীন ঘোষ শক্তস্বরে বললেন, নিজেদের জীবন দেবে তবু জীবন্ত ধরা দেবে না। তাঁরা মাথা দুলিয়ে বারীন ঘোষের কথায় সম্মতি জানালেন।** দল প্রফুল্লব আব ক্ষুদিবামের যাবাব সমস্ত বন্দোবস্ত কবে দিলেন। কাজ সাববার মালমশলা নিয়ে তাঁবা যাবাব জন্য তৈরী হলেন" (পৃঃ ১৪৪-৪৫)।

নগেন্দ্রকুমাব গুহরাযেব "শহীদ যুগল"-এব ক্ষুদিবাম জীবন চবিতাংশে আছে, "কিংসফোর্ড নিধনেব জন্য নির্বাচিত হইলেন বগুড়াব প্রফুল্ল চাকী ও মেদিনী-পুবেব ক্ষুদিবাম বসু। মানিকতলা বাগানেব গুপ্ত অস্ত্রাগাব হ'তে তাঁহাদিগকে বোমা, রিভলভাব ও পিস্তল দেওয়া হইল। মাবণাস্ত্রে সজ্জিত হইযা অধিনায়কেব নিকট হইতে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ লইয়া প্রফুল্ল ক্ষুদিরাম যাত্রা কবিলেন শত্রু নিপাতের মারাত্মক অভিযানে (পৃঃ ১০২-৩)। **১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে** তাঁহাবা মজঃফবপুব পৌঁছিয়া সহরেব মতিঝিল অঞ্চলে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় লইলেন। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কযেকদিন ধর্ম-শালায় থাকিয়া সহবের পথ-ঘাট চিনিয়া লইলেন" (পৃঃ ১০৩)।

নাবায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁব "বিপ্লবেব সন্ধানে" বইখানিতে লিখেছেন: "বিপ্লবীবা কিংসফোর্ডকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। হত্যা করাব জন্য **বোমা ও পিস্তলসহ** মেদিনীপুবেব ক্ষুদিবাম ও উত্তরবঙ্গেব প্রফুল্ল চাকীকে পাঠানো হল" (পৃঃ ২৮)।

শ্রীমণি বাগচী তাঁব "বিপ্লবী বাসবিহারী বসু"তে লিখেছেন: "১৯০৮ সনেব ৩০শে এপ্রিল। বাত্রিকাল। বাস্তাব ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বইল দু'জন। দূবে একটা ফিটনেব শব্দ শোনা গেল। **ঐ কিংসফোর্ডের ফিটন আসছে, বলে প্রফুল্ল।** অমনি দু'জনে পকেট থেকে হাত-বোমা বেব করে নেয়। ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ফিটন তাদের সামনে এসে পড়ে। দু'দিক থেকে অন্ধকারে তারা বোমা নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আওয়াজ। দু'জনে দু'দিকে ছুটে পালায়। গাড়িতে আগুন ধরে গেল। কিংসফোর্ড মরলেন না—মবলেন মিসেস কেনেডী আর তাঁর মেয়ে।" শুধু ফিটনেব ঘণ্টির শব্দ নয়, প্রফুল্ল

কি বলেছিলেন তাও বাগচী মশাই শুনতে পেয়েছেন। আশ্চর্য শ্রুতিশক্তি! বইখানির প্রকাশ-সাল আগষ্ট ১৯৬৬।

(১২)

এবার প্রফুল্ল চাকীর ও ক্ষুদিরাম বসুর মজঃফরপুর গমন ও স্থিতিকালের মীমাংসা করে নেওয়া যাক।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর "আত্মকাহিনী"তে লিখেছেন: "প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুর পাঠাইয়া আমি দিন গণিতেছিলাম। প্রতিদিন 'এম্পায়ার' কাগজ কিনিয়া দেখিতাম কাযোদ্ধার হইল কিনা। প্রতিদিন বাগান হইতে কেহ যাইয়া বেলা তিনটার সময় এই কাগজ কিনিয়া আনিত, ধরা পড়িবার পূর্বদিন অনিবার্য ভবিতব্যের বশে এ ভার পড়ে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের উপর, যাহার হাতে নবশক্তির হাজার কাজের ভিড়। সে বাগানের ছেলে নয়, বাগানের ব্যাপার বড় একটা জানিত না, সবে মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার নবশক্তির ভার আমাদের হইয়া লইতেছিল। কাজকর্ম সারিয়া সে যখন সেদিনকার 'এম্পায়ার' লইয়া বাগানে আসিল তখন রাত আটটা। খুলিয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, কাগজ বলিতেছে, 'পুলিশ জানে কোথা হইতে কাহাদের দ্বারা এসব কাণ্ড ঘটে। শীঘ্রই ইহার একটা কূলকিনারা হইবে।' (পৃঃ ৪৩)"

বঙ্গাব্দ ১৩২৯ অথবা খ্রীষ্টাব্দ ১৯২২ সালে (তখনও পুরাদস্তুর ইংরেজ আমল) বারীন্দ্রকুমারের বিবৃতি এ সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত এবং অন্যত্র প্রকাশিত বহু সংবাদের সমর্থনাভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম কোথায় উঠেছিলেন, পত্রালাপ করেছিলেন, টাকা পাঠাতে হয়েছিল কিনা ইত্যাদি। কেননা এই সমস্ত সংবাদ অন্যত্র প্রকাশ পেয়েছে এবং টাকা পাঠানো প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরকেও সাক্ষ্য দিতে হয়েছে। বারীন্দ্রের আত্মকাহিনীর পুনর্মুদ্রণ হয়েছে অর্ধশতাব্দী পরে, কিন্তু কোন সংযোজনা নেই। ফলে, নানা গল্পেরও অবকাশ ঘটেছে।

গল্পকার সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "অগ্নিযুগের অগ্নিকথা"য় লিখেছেন: উনিশ শ আট সালের এপ্রিল মাস। মাসের গোড়ার দিকে দু'জন যুবক মজঃফরপুর শহরের একটি ধর্মশালায় এসে ঘর ভাড়া নিলেন। ধর্মশালাটি ছিল কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে। যুবক

দু'জন জানালেন, তাঁরা ধর্মশালায় কিছুদিন থাকবেন, কারণ পথে তাদের টাকা-কড়ি সব চুরি গেছে। তাঁরা কলকাতায় খবর পাঠিয়েছেন। কলকাতা থেকে টাকা এলে তাঁরা চলে যাবেন। কিশোরীমোহন তাই বিশ্বাস করলেন। কিশোরীমোহনের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁরা দু'জন শহরময় ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলেন। এই দু'জনের একজন প্রফুল্ল চাকী আর একজন ক্ষুদিরাম বসু। প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম ঘোরাফেরা করে মজঃফরপুর আদালত দেখে এলেন, বিচারক কিংসফোর্ডের কোয়ার্টার দেখে এলেন, ইউরোপীয়ানদের ক্লাব-বাড়ী দেখে এলেন, কিংসফোর্ডের গতিবিধিও দেখে এলেন। সব দেখলেন, তবু উপযুক্ত সুযোগের অভাবে কাজের পথ দেখতে পেলেন না। যাই হোক, শেষ কাজ করতে না পারলেও **প্রাথমিক কাজগুলো সেরে সেবারের মত আবার কলকাতায় ফিরে গেলেন। কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষ তারিখে শেষ কাজটা শেষ করবার জন্য আবার মজঃফরপুরে হাজির হলেন** (পৃঃ ১৪৬-৪৭)।

মাসের গোড়ার দিকে অর্থ ৭ এপ্রিলের মধ্যে। শেষ তারিখ অর্থ ৩০ এপ্রিল। ঘটনার কথা পরে। আগে উপস্থিতিকাল।

"ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব"-এর লেখক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় বলেছেন, ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্লকুমার চাকি নামক দুটি তরুণ কিশোরের উপর আদেশ হল মজঃফরপুর গিয়ে কিংসফোর্ডকে নিধন করার। বোমা ও রিভলভারসহ তাঁরা রওনা হলেন। সেটা ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস। তরুণদ্বয় মজঃফরপুর শহরে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। সপ্তাহখানেক কেটে গেল। কিন্তু সাহেবকে বাগে পাওয়া যাচ্ছে না। নিজের কোয়ার্টার থেকে ভয়ে বড় একটা তিনি নড়েন না।) ইত্যাদি" (পৃঃ ৪৯)। ক্ষুদিরামের নামটি আগে।

এপ্রিল মাসের কোন্ তারিখে আগমন তা নেই। ৩০ এপ্রিল ঘটনার তারিখ হলে ২৩ এপ্রিল মতো হবে। এ থেকে আর তথ্যোদ্ধার সম্ভব নয়, ওদের পরিচিতিও নয়।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের "First Spark of Revolution"-এ আছে: "Two youngmen were selected for this overt action · Khudiram Basu of Midnapur and Prafulla Chaki of Rangpur, both teen-agers. Two years earlier (Feb 1906) Khudiram had been arrested for distributing a secret pamphlet called Sonar

Bangla but was later acquitted of sedition charge. Prafulla and Khudiram were of an exceptionally enthusiastic and determined nature. Khudiram had earlier been sent to Assam to shoot Sir Bamfylde Fuller, but he was unable to track the Governor. Prafulla had been deputed to Darjeeling to take the life of Sir Andrew Fraser, Lt. Governor of Bengal. The Government was careful about Kingsford and transferred him from Calcutta to Muzaffarpur in Bihar. The Government later claimed that they had previous information of the attempt to be made by Khudiram and Prafulla. The two found at Muzaffarpur that Kingsford usually visted the Planter's club in the evening. He was so careful about his life that he would not go out anywhere else. (p. 130)

অরুণবাবু নতুন খবর দিয়েছেন ক্ষুদিরাম সম্পর্কে। তাঁকে আসামে পাঠানো হয়েছিল স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে গুলি করার জন্য। এই খবরটি আর কোথাও নেই, অন্তত হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর বইয়ে থাকা উচিত ছিল। একথা ঠিক যে, ক্ষুদিরাম "সোনার বাংলা" নামে একটি পুস্তিকা বিতরণ করেছিলেন, গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে রাজদ্রোহের অভিযোগ লিপিবদ্ধ হবার পর দায়রা সোপর্দও হয়েছিলেন, কিন্তু সরকারপক্ষই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। তাতেই ঐ অঞ্চলে ক্ষুদিরামের খ্যাতি হয়েছিল। অতএব এহেন ক্ষুদিরামকে কবে আসাম পাঠানো হয়েছিল বললে খবরটা সম্পূর্ণ হত। বারীন্দ্রকুমারও কোথাও একথা বলেন নি। হেমচন্দ্র ও বারীন্দ্রকুমারের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুল্লেখ সংবাদটিকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলেছে।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ তাঁর দ্বিতীয় তারিখ ১৭-১৮ এপ্রিল দিয়ে বলেছেন, "দিন যায়, কিংসফোর্ড-এর গতিবিধি লক্ষ্য করতে সপ্তাহ গড়িয়ে এল, ঠিক সুযোগ হচ্ছে না। [অর্থাৎ, ২৫ এপ্রিল গড়িয়ে গেল, সুযোগ হল না।] অথচ কার্যোদ্ধার না করে তাঁরা ফিরে যেতে পারেন না, 'মন্ত্রের সাধন' হল প্রতিজ্ঞা। অচেনা জায়গায় সব খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করা সহজ নয়। এটা বোঝা গেল, **কাছারি যাওয়া-আসা ছাড়া কাজী তাঁর বাসা থেকে প্রায়ই বার হন না।** কাছারিতে (এজলাসে) হত্যা করা যেত, কিন্তু অনেক নিরীহ প্রাণী হতাহত

হবে বলে কিছু করা হয়নি" (পৃঃ ২৯৫ , তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন আমার)। এ পর্যন্ত পড়বার পর মনে হবে মিঃ কিংসফোর্ডের গতিবিধি এই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পরেই একই পৃষ্ঠায় আছে : "শিকারের খোঁজে দুই বন্ধু সতর্ক রয়েছেন। কিংস-ফোর্ডের গমনাগমন লক্ষ্য করা একটা বড় কাজ। **কোয়ার্টারের কাছেই ইউরোপীয় ক্লাবে কিংসফোর্ড তাস খেলতে যান**" (পৃঃ ২৯৫)। তাহলে "কাজীর" গতিবিধি, গৃহ, কাছারি, ক্লাব এবং ক্লাব সন্ধ্যার পর। ঘটনার তারিখ ধরলে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে ছিলেন, ১৭-১৮ তারিখ থেকে বারো তেরো দিন। দেখা যাবে, এই স্থিতিকাল ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি, কিশোরী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী ও সাক্ষ্য এবং জজের হিসেবের সঙ্গে মেলেনা।

ক্ষুদিরামের মামলায় সহ বা দ্বিতীয় বিচারাধীন বন্দী কিশোরীমোহন ব্যানার্জির এবং মেহতা এষ্টেটের ধর্মশালার চৌকিদারের বিবৃতি থেকে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়ে আসবে, তারিখগুলোও যথাযথ ফুটে উঠবে। কিশোরী-মোহন ব্যানার্জি ছিলেন ঐ ধর্মশালায় হেড ক্লার্ক। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ক্ষুদিরামের সঙ্গে দায়রা সোপর্দ হলেও বেকসুর মুক্তিলাভ করেন। সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তিনি যে জবানবন্দী দেন তাতে আছে : "আমি ক্ষুদিরাম নামে কাউকে চিনি নে। আমি দীনেশচন্দ্র রায় নামে একজনকে জানতাম। কেননা, **তিনি মার্চের শেষাশেষি ধর্মশালায় আসেন।** দীনেশচন্দ্র এক সপ্তাহকাল ধর্মশালায় ছিলেন। **তিনি ১০ এপ্রিল ধর্মশালা ছেড়ে চলে যান।** এর পর আর তাঁকে দেখিনি। দীনেশের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। ম্যানেজারের পিয়ন রামধারী সিং একদিন এসে বলে, দুটি বাঙালীবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। ধর্মশালার ভেতরে আমার অফিসে আমি যাই এবং দীনেশ ও তাঁর সঙ্গে একটি ছেলেকে দেখি। আমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, দীনেশের সঙ্গে আমি যাঁকে দেখি তিনি ইনি [ক্ষুদিরাম] নন। ম্যাজিস্ট্রেটের সোপর্দ-কালীন প্রতিবেদনে দেখা যায়, দীনেশের সঙ্গীটির নাম নাকি দুর্গাদাস সেন, ক্ষুদিরাম নয়।" [মামলার বিবরণী সবই প্রধানত সমকালীন "অমৃতবাজার পত্রিকা" থেকে নেওয়া]

মানিকতলা বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় ফরিয়াদী সাক্ষী হিসাবে কিশোরী-মোহন তাঁর জবানবন্দীতে বলেন : "আমি ধর্মশালায় থাকি, এটি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। দীনেশচন্দ্র রায় ধর্মশালায় আসেন। তাঁর সঙ্গে আরও একটি তরুণ ছিল, তাঁর নামটি ঠিক মনে নেই। তারা বললে, 'আমরা কলকাতা থেকে

এসেছি। ট্রেনে আমাদের টাকাকড়ি হারিয়ে গেছে। এখানে আমরা অপরিচিত। কোথায় থাকব ? কলকাতা থেকে টাকা আসবে। আমি তাদের ধর্মশালায় থাকার কথায় সম্মতি দি ও বন্দোবস্ত করে দি। আমি আমার পিয়ন রামধারীকে বলি সে যেন ধর্মশালার পিয়নকে বলে দেয় ব্যবস্থা করতে। আমার ঠিকানায় দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে টাকা আনাতেও আমি রাজি হই। ২০ টাকার মনিঅর্ডার আসে। আমি দীনেশকে খবর দিতে লোক পাঠাই, ডাক পিয়নের খুব তাড়া ছিল। আমিই টাকা সই করে নি। **তারিখটা ছিল ৬ এপ্রিল।** সেদিনই টাকাটা দীনেশকে দি এবং তার কাছ থেকে একটা রসিদ নি। এই আমার স্বাক্ষর, এই দীনেশের স্বাক্ষর। আমি তাদের পরিচয় জানতে চাই, দ্বিতীয় ছেলেটি সঙ্গে ছিল না, তাই তার পিতৃ-পরিচয় পাইনি। ছেলে দুটি ধর্মশালায় **এক সপ্তাহকালের বেশি ছিল।** তারা **১০ এপ্রিল ধর্মশালা** ছেড়ে যাবার আগে বলেছিল তারা কলকাতা ফিরে যাচ্ছে। **মনিঅর্ডার পাবার পরই তারা চলে যায়,** আর ফেরে নি। **তারা একসঙ্গে চলে যায় নি। দীনেশের সঙ্গীটি মনিঅর্ডার আসবার আগেই চলে গেছল।** [অর্থাৎ ৬ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে]। দীনেশের সঙ্গী বলেছিল, সে কলকাতা ফিরে যাচ্ছে। আমি দুর্গাদাসকে দেখলে চিনতে পারব।' কিশোরীমোহন সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে বন্দীদের কাঠগড়া প্রদক্ষিণ করলেন কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেখলেন না। তাকে মৃতের [দীনেশের] ফটো দেখানো হলেও তিনি চিনতে পারলেন না, বললেন, দীনেশ বলে যে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি বেশ বলিষ্ঠ, মুখমণ্ডলে কোন কেশচিহ্ন ছিল না। [তৃতীয় বন্ধনীগুলো আমার—লেখক]

দেখা যাচ্ছে, কিশোরীমোহনের তারিখের হিসাব ধর্মশালায় মার্চের শেষাশেষি (৩০-৩১ ?) আগত দুই ব্যক্তিই ১০ এপ্রিলের মধ্যে প্রস্থান করেছেন, অর্থাৎ স্থিতিকাল ১০।১২ দিন। অথচ কিংসফোর্ডের লক্ষ্যে বোমা বিস্ফোরণ হল ৩০ এপ্রিল। তবে দিন কুড়ির এই ব্যবধান কি তথ্য দিয়ে ভরাট করা যাবে ? শ্রীকালীচরণ ঘোষের দুই কিস্তিতে দুই যুগলের আগমন-নির্গমন দিয়ে—যার মধ্যে সুশীল সেনও কুশীলবের একজন ? অথবা সুশীলবাবুর গল্প দিয়ে—একই সঙ্গে যুগলের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ দিয়ে ?

যাঁদের এই ধর্মশালা সেই মহতাব এস্টেটের অন্যতম খেমান কাহার এই ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলে, গত চৈত্র মাসে আমি দুটি লোককে

একসঙ্গে ধর্মশালায় দেখি, **ওঁরা ছয় সাত দিন ধর্মশালায় ছিলেন।** আমার মনিব আমাকে হুকুম দেন ওঁদের ধর্মশালা ছেড়ে যেতে বলবার জন্য। **কিন্তু দশ বারো দিন পর আবার তাঁরা ফিরে আসেন। আবার পাঁচ ছয় দিন থাকেন।** একবার তাঁদের দেখেছি বাইরে বান্না কবতে। বাইরে মানে বাবান্দায়। আর পাচ ছয় দিন ভেতরে। আমি তাঁদের বা কাউকে নাম ধবে ডাকাডাকি করতে শুনিনি। আমি দীনেশচন্দ্র রায় বা দুর্গাদাস সেনের নাম শুনিনি। খেমান অবশ্য প্রথমে বলেছে, সে ক্ষুদিরামের মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছে। লোকে বলত 'ক্ষুদিরাম', তাই সে নামটা জেনেছে। চৈত্র মাসের ছয় সাত দিনের মধ্যে ক্ষুদিরামকে প্রথম দেখি, ক্ষুদিবাম ও আর দুই তরুণ। এব পরই তাঁদের ধর্মশালা ছেড়ে যাবাব জন্য আমার মনিব আমাকে হুকুম দেন। [চৈত্র মানে এপ্রিল]

গোলমেলে কথা গোলমেলে হিসেব। খেমানেব সাক্ষ্যের পব তাই ফের কিশোরীমোহনকে সাক্ষীর কাঠগডায় তলব করা হল।

প্রশ্ন: মার্চ ও এপ্রিল মাসে ক্ষুদিবাম বলে কেউ ধর্মশালায় ছিল বলে আপনি জানেন ?

উত্তব: না।

প্রশ্ন: দীনেশচন্দ্র রায়ই কি প্রফুল্ল চাকী ?

উত্তর: আমি জানিনে।

প্রশ্ন: দুর্গাদাস কি সেই একই লোক নন ?

উত্তব: না।

প্রশ্ন: আপনি ধর্মশালায় থাকেন ?

উত্তব: না। আমি সকাল ১১টা থেকে বিকেল পাচটা অবধি ধর্মশালায় হাজিব থাকি।

প্রশ্ন: এমন তো হতে পাবে যে, আপনাব অজ্ঞাতে দীনেশ ও ক্ষুদিরাম ফিরে এসেছিল এবং আপনাব অজ্ঞাতেই চলে গেছল ?

উত্তব: আমি কখনও খেমানের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ কবিনি।

ক্ষুদিবাম তাঁর প্রাথমিক দুটি স্বীকারোক্তিতে (একটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যানের কাছে, আর একটি দায়বা-সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট বার্থুডের কাছে) বলেছেন, ঘটনার দিন সহ **পাঁচ ছয় দিন** ধর্মশালায় ছিলেন। [অর্থাৎ, ঘটনার দিন, ৩০ এপ্রিল থেকে পাঁচ বা ছয় দিন পিছিয়ে গেলে তারিখটা দাঁড়ায়

২৪ বা ২৫ এপ্রিল] খেমান কাহার বলেছে, ছয় সাত দিন, অর্থাৎ ২৩ কি ২৪ এপ্রিল। কিশোরী ব্যানার্জির হিসাবে প্রস্থানের দিন ১০ এপ্রিল ধরলে ব্যবধান দাঁড়ায় ১৩।১৪ দিনের। ক্ষুদিরামের মামলায় কে এল চ্যাটার্জি নামে এক সাক্ষী বলেছেন, তিনি ১০ এপ্রিল ক্ষুদিরামকে ময়দানে দেখেছেন। ক্ষুদিরামকে জেরা করতে বলা হলে তিনি বলেছিলেন, কি বলব, আমি তো তখন মেদিনীপুরে। খেমান কাহারের দাবি, সে দুটি তরুণকে দু' দফায় দু' বার দেখেছে। কিশোরী-বাবু ক্ষুদিরামকে মোটে দেখেনই নি ঘটনার আগে। যারা এসেছিল তারা তো ১০ এপ্রিল চলেই গেছে। তারপর যদি কেউ এসে থাকেন অন্তত কিশোরীবাবুর তা গোচরীভূত হয়নি।

ঘটনার পর, ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন, এবং কিশোরীবাবুকে সহায়ক আসামী-রূপে দাঁড় করালে তিনি পরিষ্কার বলেন, ক্ষুদিরামকে তিনি ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নি। বাগানবাড়ি বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় (যার অদ্ভুত নাম হয়েছে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা) কাঠগড়ায় হাজতী বন্দীদের মধ্যে দুর্গাদাস সেনকেও সনাক্ত করতে পারেন নি। অথচ কিশোরীবাবুরই মতে দীনেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গীটির নাম দুর্গাদাস সেন। কিশোরীবাবু সম্ভবত তাঁকে একদিনই দেখে-ছিলেন। সেই কারণে দীর্ঘকাল পর কলকাতার আলিপুরের আদালতে বাগান-বাড়ি মামলায় সাক্ষ্য দিতে এসে দুর্গাদাসের দেখা পান নি, মানে, দুর্গাদাসের মতো কাউকে চিনতে পারেন নি।

তবে কি দুর্গাদাস সেন কিংসফোর্ডের বেত-মারা সুশীল সেন ? হেমচন্দ্র দাস তাঁর "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা"য় এরকম একটি সম্ভাবনার কথা তুলে নিজেই তা খারিজ করে দিয়েছেন। শ্রীকালীচরণ ঘোষ এটি সম্ভাব্য বলে গ্রহণ করেছেন। হেমচন্দ্র দাস কিন্তু ঐ সম্ভাবনা খারিজ করলেও একটি কথার সূত্র রেখে গেছেন। সেটি এই: "এই খুনোখুনির মতলবটা কিন্তু সুশীলকে জানতে দেওয়া হয়নি। নচেৎ তাকে এড়ান মুস্কিল হত" (পৃঃ ২৪২)। হেমচন্দ্র বাগানে থাকতেন না, প্রফুল্লকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার আগে কি প্রফুল্ল-সুশীল মজঃফরপুর সমীক্ষায় গিয়েছিলেন ? শ্রীকালীচরণ ঘোষের কথায় সেই সায় আছে। সুশীলকে এড়ানো যদি সম্ভব না হয়ে থাকে তবেই তা সম্ভব। কিন্তু তা কি বারীন্দ্র-উপেন্দ্রের অসম্মতি বা অজ্ঞাতে হতে পারে ? সন্দেহস্থল। তবে বাগান বাড়িতে তল্লাসীর সময় মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের বাংলোর অবস্থিতির নক্সাটি কি করে পাওয়া গেল—কেউ যদি না এনে থাকেন অথবা ডাকে পাঠিয়ে না থাকেন ? প্রফুল্ল-

ক্ষুদিরাম যখন কেউই আর ফেরেন নি, ১০ এপ্রিলের আগে পরে যে বা যাঁরাই আসুন (এবং যে বা যাঁরাই ফিরে যান) তাঁদেরই কেউ নক্সাটি এনে ও ফেলে গিয়ে থাকবেন। নক্সাই একমাত্র সূত্র যা থেকে অনুমান করা সম্ভব দু' দফায় দুটি যাত্রা হযেছে—তাঁরা যে-ই হোন।

অবশ্য কেবল সুশীলেব কথাই ওঠেনি, নরেন গোঁসাইর কথাও উঠেছিল। কিন্তু গোঁসাইর যে যাওয়া হয়নি একথাও একাধিক লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সুশীলেব কথা কেবল হেমদাস নন, শ্রীক্ষীবোদকুমাব দত্তও বলেছেন। তবে ক্ষীরোদবাবুব লেখায় হেমদাসেব প্রতিফলন পাওয়া যায়, তিনি ঐ ব্যাপাবে সংশ্লিষ্টও ছিলেন না, পরবর্তীকালেব বিপ্লবী এবং লেখক। এ ব্যাপারে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই।

কয়েকটি বইয়ে মজঃফরপুব থেকে প্রফুল্ল বাবীন্দ্রকুমাবকে সুকুদাদা বলে সম্বোধন কবে চিঠি দেবাব কথা আছে, চিঠির উদ্ধৃতিও আছে। টাকার কথা আছে, সম্ভবত, অতি-গোপন বলে, পত্রেব সঙ্গে নক্সাব উল্লেখ নেই—যদি নক্সা ডাকে পাঠানো হয়ে থাকে। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়েব "বিপ্লবী যুগের কথা"য় চিঠিটি এই মর্মে ছিল: 'আমবা নিবাপদে এখানে পৌঁছিয়াছি কিন্তু দুর্গাদাসের পকেটে যে টাকা ছিল তাহা খোয়া গিয়াছে। কিছু টাকা পাঠাবেন। আমরা ববকে এখনও দেখি নাই কিন্তু তাহাব বাড়ী ভালো কবিযাই দেখিয়া লইয়াছি। ববেব বাড়ী মন্দ নহে। আমি পরে আপনাকে সবিশেষ জানাইব। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। আমাদের ওখানকাব ঠিকানা দিবেন না, ভুল ঠিকানা দিবেন।' ১৯ এপ্রিল ২০ টাকা প্রেবিত হয় (পৃঃ ৩৫) এখানে সম্ভবত দুর্গাদাস হলেন ক্ষুদিবাম [অথবা সুশীল?]। কিশোবাবাবু কিন্তু ক্ষুদিবামেব মামলায় সহ-আসামী হয়েও ও একই কাঠগড়ায় থেকেও বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দেবাব সময় কাউকেই দুর্গাদাস বলে সনাক্ত কবতে পারেন নি।

শ্রীক্ষীরোদকুমাব দত্ত তাঁব "বিপ্লবী বাবীন্দ্রকুমার"-এ ঐ চিঠির বয়ান দিয়েছেন: "সুকুদা, বব দেখিনি কিন্তু ববের বাড়ি দেখেছি। বাড়িখানি দেখতে বেশ। **এখানে ভাল রসগোল্লা পাওয়া যায় না, ভালো রসগোল্লা পাঠাবেন**" (পৃঃ ১১২)। ক্ষীবোদবাবুব শেষাংশে প্রভাতবাবুর উদ্ধৃত কথা নেই। ঠিকানা সম্পর্কে আছে। অর্থাৎ দুটি চিঠি পৃথক—প্রথমাংশ ছাড়া।

হেমন্ত চাকীর "অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী"—বইয়ে দু'খানি চিঠির উল্লেখ আছে: (১) প্রিয় সুকুদা, আমবা নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছেছি।

পথে **দুর্গাদাসের** পকেট থেকে সমস্ত টাকা হারিয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা মহাবিপদে পড়ে গিয়েছি। দয়া করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ২০৲ টাকা পাঠাবেন। পরে আপনাকে সমস্ত জানাবো। (২) সুকুদা, বব দেখিনি কিন্তু বরের বাড়ী দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে রসগোল্লা পাওয়া যায় না—কিছু ভাল বসগোল্লা পাঠাতে ভুলিবেন না—দীনেশ।'

ঈশান মহাপাত্র মশাই ক্ষুদিবামকে প্রফুল্লর সঙ্গে সোজা মজঃফরপুরেব ধর্মশালায় হাজিব কবেছেন। সেখানে তাঁদের উপস্থিতি সম্পর্কে যে সাক্ষ্য তিনি উল্লেখ কবেছেন তা এই: (১) কলকাতাব হ্যাবিসন রোড পোস্টাফিসের পোস্টমাস্টার ম্যাথুলবেক্স ব্যানার্জি বলেছেন, ৮।৪।০৮ তাবিখে **(অর্থাৎ ৮ এপ্রিল ১৯০৮)** কলকাতা থেকে মজঃফবপুরে দীনেশচন্দ্র বায়ের নামে ২০ টাকা মনি অর্ডাবযোগে পাঠানো হয়েছিল, (২) কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, **মার্চ মাসের শেষে** দীনেশচন্দ্র বায় নামে একটি লোক একটি বালক নিয়ে আসে, (৩) ক্ষুদিরাম-মামলাব কাগজ-পত্র থেকে জানা যায়, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ধর্মশালায় **২০ দিন ছিলেন**, [আবাব তিনিই লিখেছেন] (৪) কিশোরীবাবুর সহিত সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপিত হয়েছিল। তাঁরা ধর্মশালায় ৫।৬ দিন ছিলেন। (পৃঃ ১০৬)

প্রশ্ন ওঠে, হ্যাবিসন বোড পোস্টাফিসেব পোস্টমাস্টার যেখানে বলেছেন, টাকাটা কলকাতা থেকে ৮ এপ্রিল **পাঠানো** হয়েছিল, সেটি কিশোরীমোহন মজঃফরপুরে ৬ তাবিখে পান কি কবে? অথচ দু'জনই মনিঅর্ডার ফরম ও মনিঅর্ডার কুপন দেখে সাক্ষ্য বা জবানবন্দী দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, একই লেখক একই বইয়ে একই প্রসঙ্গে একবার ২০ দিন, আব একবাব ৫।৬ দিন বললে হিসেব মেলে কি ক'বে ?

হেমন্ত চাকী মশাই তাঁব 'অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী' গ্রন্থে যা বলেছেন তাতে অবস্থা কিন্তু আবও ঘোবালো হয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন, (১) "**শুনা যায়,** মজঃফবপুব গিয়া কিংসফোর্ডকে নিধন করিবার জন্য শ্রীরামপুরেব নরেন গোঁসাই নির্বাচিত হইয়াছে। গৃহিণীব মনোকষ্টের দোহাই দিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেন। (২) ক্ষুদিবামকে **হরেন সরকার** বলিয়া প্রফুল্লকে জানাইয়া দেওয়া হয় (পৃঃ ১২২)। (৩) **অপরাহ্নে** বিদায় লইয়া প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজঃফবপুব রওনা হইলেন। তাঁহাবা **সন্ধ্যার পর** মজঃফরপুর পৌছিলেন। (৪) শহর ও কিংসফোর্ডের বাংলো দেখিয়া আসিয়া নক্সা করিলেন।

মুরারীপুকুর বাগান তল্লাসীর সময় পুলিশ এই নক্সাটি পায়। (৭) ঐ তল্লাসীর সময় পুলিশ এই দু'খানি চিঠিও পায় (পৃঃ ১২৫)। [চিঠি দু'খানি ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।]

প্রথমত, যা "শুনা যায়" তা ইতিহাস নয়, তবে, নরেন গোঁসাইব প্রসঙ্গটি একাধিক বইয়ে উল্লেখ আছে, কে কাবটা "শুনে" লিখেছেন স্থিব করে বলা মুস্কিল। দ্বিতীয়ত, দীনেশের চিঠিতে যদি থেকে থাকে সঙ্গীব নাম দুর্গাদাস (পৃঃ ১২৫), তা কি করে পবিচয়কালে (পৃঃ ১২২-২৩) হয় হবেন সরকাব? ইতিহাস লেখাব প্রযাসে যে সতর্কতা অবলম্বন কবতে হয় এখানে তাব অভাব ঘটেছে। দুটি নাম তো হতে পাবে না। অন্যত্র দুর্গাদাস সেন পাওযা গেছে, হবেন সবকাব নয়। তৃতীয়ত, অপরাহ্নে কলকাতা থেকে বওনা হয়ে সন্ধ্যাব পর কিভাবে মজঃফবপুব যাওয়া যায়? তাবিখ বা বাবও নেই যে, বুঝব, সেদিন নয় পব দিন [ক্ষুদিবামেব কাছে৹ টাইম টেবল পাওযা যায়]। কলকাতা থেকে মজঃফবপুবেব দুরত্ব ৩৭৫ মাইল। চতুর্থত, নক্সাটি কি ক'বে বাগানে এল? যদি ডাকে পাঠানো হয়ে থাকে তবে চিঠিব সংখ্যা হয় তিন, নতুবা কোন চিঠিব সঙ্গে পাঠানো হয়ে থাকতে পাবে, কিন্তু কোন চিঠিতেই তার উল্লেখ নেই। প্রফুল্ল বা ক্ষুদিরাম বাগানে এসে ফিরে গেছেন এমন খবরও নেই—যদিও, কিশোবীমোহন-কথিত ১০ এপ্রিল দীনেশেব প্রস্থান মেনে নিলে ৩০ এপ্রিলেব মধ্যবর্তীকালে একটা যোগাযোগের শূন্যতা বিরাজ করে। খেমান কাহাবের কথা সত্যি হলে দুই যাত্রায় দুটি করে লোক এসেছে। সুশীল, নয়, নবেন গোঁসাই, কিশোরীমোহন একদফায় দুটি তরুণকে আসতে ও থাকতে দেখেছেন, তাঁদেব কেউ ক্ষুদিবাম নন এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত, প্রফুল্লও গিযে ফিবে আসেন নি। কি করে বাগানে চিঠি নক্সা এল, কোন বইয়ে তাব সন্ধান আমি পাইনি।

হেমন্ত চাকী মশাই এই ক্ষেত্রে এক অভিনব সংবাদ দিয়েছেন (পৃঃ ১২৬-১২৮):

"১০ এপ্রিল প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ধর্মশালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (১২৬)। **এবার তাহারা দুইজনে পৃথক পৃথক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।** ক্ষুদিরাম পরমেশ্বব মাহাতোর ধর্মশালায় আর প্রফুল্ল সুরাইগঞ্জে বাঙালীদের একটি মেসে।" ২০ এপ্রিল কিংসফোর্ডকে চরমপত্র দেওয়া হল এবং কিংসফোর্ডের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল (পৃঃ ১২৭)। "করিম নামে এক ছাত্র ও অন্য খেলোয়াড়দের অনুরোধে প্রফুল্ল ফুটবল খেলেন ও অপূর্ব ক্রীড়া-

নৈপুণ্য দেখান। তিন গোলে জয়ী।" পরদিন খেলার জন্য আমন্ত্রিত (১২৮)।

প্রথম কথাটি কিশোরীমোহন ব্যানার্জির বিবৃতিতে সমর্থিত। দুইজনের পৃথক পৃথক আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিচারকালেও কারও জেরায় বা সাক্ষ্যে একথা প্রকাশ পায় নি। প্রফুল্ল কোন বাঙালি মেসে ৯।১০ দিন ধরে থাকলে এবং প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের (বোমার টিন হাতে) কোথাও না কোথাও দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকলে তা অনেকের নজরে পড়ার কথা। ফুটবল খেলে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে থাকলে তা নিশ্চয়ই বহু লোকের নজর কেড়েছে এবং তাকে সনাক্ত করার অনেক লোক পাওয়া যেত। বাঙালিদের মধ্যে নন্দলাল তো একটিমাত্র নয় আরও নন্দলাল পাওয়া যেত—এটি অনায়াসে অনুমান করা যায়। খেমান কাহার একই ধর্মশালায় দ্বিতীয়বার দুজনকে দেখেছে। ৩০ এপ্রিল ঘটনার পর প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম একই ধর্মশালার দিকে ছুটেছেন, পরে দু'জন দু'দিক যান। ধরা পড়ার পর ক্ষুদিরাম পুলিসের সঙ্গে এই ধর্মশালায়ই আসেন ও যে-ঘরটির তালা কিশোরীমোহনের অজ্ঞাতে ভাঙা হয়, সেইটিই তাঁদের আস্তানা বলে এবং কয়েকটি জিনিস সনাক্ত করেন। ধর্মশালা ছাড়া অন্যত্র পৃথক পৃথক থাকলে 'চরমপত্র' দেবার পর তাঁরা সন্দেহভাজন হতেন। কলকাতার পুলিস কিংসফোর্ড আক্রান্ত হতে পারেন এ সংবাদ পেয়েছিল, মজঃফরপুর শহরে গোয়েন্দা বিচরণ শুরু হয়েছিল, কিংসফোর্ডের নিরাপত্তার জন্য ২৩ এপ্রিল থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, পর্যায়ক্রমে দু'জন করে কনস্টেবল কিংসফোর্ডের বাংলো ও ক্লাবঘর মহল্লায় কিংসফোর্ড বাংলোয় না ফেরা পর্যন্ত টহল দিত। ওঁরা যে টহলদারি পুলিসের চোখে পড়েন নি তাও নয়, তবে পুলিসের সন্দেহ উদ্রেক করার মতো নিশ্চয়ই কিছু হয় নি। ক্ষুদিরামের মামলায় এটি প্রকাশ পেয়েছে।

স্বয়ং কিংসফোর্ড তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, "আমি ২৬ মার্চ মজঃফরপুরে আসি। ঘটনার পর জানতে পারলাম আমাকে রক্ষার জন্য পুলিস ব্যবস্থা নিয়েছিল। তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি ২০ তারিখে লেখা কলকাতার পুলিশ কমিশনার হ্যালিডের চিঠি দেখেছেন।" মজঃফরপুরের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর্মষ্ট্রং তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, "কলকাতা থেকে পাওয়া এক সংবাদ অনুসারে মিঃ কিংসফোর্ডের গেটের কাছে দু'জন কনস্টেবল মোতায়েন রেখে তাদের ছ'টায় ক্লাব থেকে জজ না ফেরা পর্যন্ত টহল দিতে বলি।"

কিংসফোর্ডকে চরমপত্র কে কোথা থেকে দিল ? ক্ষুদিরামের মামলা, কা

বাগানবাড়ি মামলায় কেউ এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেন না, চবমপত্রটিও পেশ করা হয়নি; অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রফুল্লও গুপ্ত দলেব হয়ে মারাত্মক কাজেব দায়িত্বে এসে দিবালোকে বহু লোকের দৃষ্টিগোচরে লক্ষণীয় হবার ঝুঁকি নেবেন গুপ্তদলের রীতিব সঙ্গে এ সামঞ্জস্যহীন, অতএব গ্রহণযোগ্য নয়। খেলার মাঠ সম্পর্কে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে মামলাব আলোচনাকালে তা উল্লেখ করা যাবে।

(১৩)

কিন্তু যে উদ্দামগতিতে কালীপদ বাগচী মশাই তাঁর 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী'-তে তাঁর কল্পনাব বথ চালিয়েছেন (পৃঃ ৫১) তাতে সবই সম্ভব। তিনি লিখেছেন :

"ধর্মশালায় উভয়ে উভয়ের অপবিচিতেব মতই ছিল, বাইবে যাইতেও পৃথক-ভাবে যাইত। প্রত্যেকেব নিকট **একটি করিয়া রিভলবার** ও কার্য্যের জন্য **দুইটি বোমা**। এই বোমা নিজের কাছে না বাখিয়া **ধর্মশালায় একটি গোপন স্থানে** বাখিয়াছিল। প্রভাতে একজন বাহিব হইত কিংসফোর্ডেব গতিবিধি লক্ষ্য কবিতে, দ্বিপ্রহবেব পর অপব জন। সন্ধ্যাবেলা উভয়ে পৃথক ভাবে কিংসফোর্ডেব গাড়ি এবং ক্লাবে গতিবিধিব সন্ধান লইত। ক্লাবেব নিকট **দরজির দোকান**। ঐ দোকানেব **বহু কর্মীর আনা-গোনার পথে** তাহাবা **সহজেই আত্মগোপন** কবিয়া অপেক্ষা কবিতে পারিত। **২৮ তারিখের** পযবেক্ষণেব পব তাহাবা ঠিক বুঝিল যে, কিংসফোর্ড প্রতিদিন ফিটনে চড়িয়া ক্লাবে যান। রাত্রি আটটায় ফেবেন।

"২৯ এপ্রিল। ক্ষুদিবাম পাহাবা দিতে থাকে। সিদ্ধান্ত হয় প্রফুল্ল কিংসফোর্ডেব গাড়ি বওনা হইলেই অনুসবণ কবিয়া ক্ষুদিবামকে সংবাদ দিবে এবং প্রত্যাবর্তনেব পথে সন্ধ্যাব অন্ধকাবে গাড়িব উপবে বোমা ফেলিবে।

"যে কারণেই হউক কিংসফোর্ড সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হন না। প্রফুল্ল নিয়মিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিযা বাণ্ডায় বাহির হয় (পৃঃ ৫০-৫১)।

"**দুইটি দিন** বৃথা চলিয়া যাওয়ায় ব্যস্ত। ধর্মশালায় তিনদিন সহজ উপায়ে থাকা যায়। দ্বিতীয় কারণ **দুইটি তরুণ ঐ ভাবে বাস করায় লোকের নজরে পড়িতেছিল"** (পৃঃ ৫২)।

বাগচী মশাই এর পর ৩১ এপ্রিলের খবর দিচ্ছেন—যদিও ফেব্রুয়ারির মতো এপ্রিলে লিপ ইয়ার নেই, এপ্রিল ৩০ দিনেই শেষ :

"৩১ এপ্রিল ১৯০৮। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ক্লাবের নিকট অনেকগুলি বড গাছ ছিল। তাহার ছায়ায় **প্রায়ান্ধকারে** দাঁড়াইয়া দুজন অপেক্ষা করিতেছেন। সময়মতই কিংসফোর্ডের ফিটন আসিয়াছে। উভয়েই প্রস্তুত। **সৌভাগ্যক্রমে সেদিন কিংসফোর্ডের গাড়ি একটু আগেই বাহির হইল**। অন্ধকারে আরোহী দেখা যায় না। উপর্যুপরি তিনদিন গাড়ি দেখিয়া তাহাদের গাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতাই হইয়াছিল। ক্লাবের বাহিরে রাস্তায় আসিতেই বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। **নিক্ষেপকারী কে—তাহা কোনদিনই জানা যায় নাই**। গাড়ি বোমা আঘাত করিয়া বিচূর্ণ করিয়াছে **দেখিয়াই উভয়েই বিভিন্ন পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন**—বিভিন্ন দিকে। **সেই শব্দে চমকিত হইয়া ক্লাবের ইংরাজ সভ্যেরা বাহিরে আসিয়া দেখিল** ফিটনের ছিন্ন অংশ, তৎসহ মিস ও মিসেস কেনেডির **ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে**। পুলিশে খবর দেওয়া হইলে চারিদিকে পুলিশ ছড়াইয়া পড়িল (পৃঃ ৫২-৫৩)।

"সেদিন মিস কেনেডি অসুস্থ বোধ করায় কিংসফোর্ডের ফিটনে বাড়ি ফিরিতেছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল বাড়ি পৌঁছিয়া ফেরৎ পাঠাইলে কিংসফোর্ড গৃহে যাইবেন" (৫২-৫৩)।

বাগচী মশাই নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ নন। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী বা এইসব ঘটনাক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের কথার সঙ্গে বাগচী মশাইর কথামালার মিল নেই। ঘটনার নায়ক দুজনের একজন, প্রফুল্ল, কাউকে কিছু বলার আগেই আত্মবিলোপ করেছেন; দ্বিতীয় জন—ক্ষুদিরাম—কিছু কথা বলেছেন। তার মধ্যে এসব কথা নেই। বিস্ফোরণের পর সেই দৃশ্যাবলীর দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ডি এইচ কিংসফোর্ড স্বয়ং, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এইচ উডম্যান, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জে ই আর্মস্ট্রং, সিভিল সার্জেন টি গ্রেনজার, আর, মিসেস ও মিস কেনেডির সমাধিস্থানে স্থানীয় কিছু ইউরোপীয়ান ও ভারতীয়। চিকিৎসার জন্য মিস ও মিসেস কেনেডিকে আহতাবস্থায় কিংসফোর্ডের বাড়িতেই প্রথম আনা হয়েছিল। মিস কেনেডি কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যান, মিসেস কেনেডি অবশ্য আহতাবস্থায় কিছুকাল বেঁচেছিলেন, কিন্তু কিছু বলে যাবার মতো চেতনা ছিল না, সুতরাং কিছু বলে যেতে পারেন নি।

তবে কালীপদবাবুকে এত প্রত্যক্ষ খবর জোগালো কে ?

প্রত্যেকের নিকট একটি করিয়া রিভলভার কথাটি মেনে নিলেও নেওয়া যায়—যদিও ১+১=২ রিভলভার+একটি পিস্তল=তিনটির অস্তিত্ব ঘটনাক্রমে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দুটি বোমা ? বারীন্দ্রকুমার বা অন্যান্যের বিবৃতি দ্রষ্টব্য—যদিও মামলায় কোন কোন সাক্ষী দুটি বিস্ফোরণ শব্দ শুনতে পাওয়া গেছে বলেছেন। সরকারপক্ষে অবশ্য একটি বোমার কথা বলা আছে, জজও তাই গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, ধর্মশালায় ওদের আশ্রয়কক্ষ ছাড়া আর কোন গোপন স্থান থাকা সম্ভব—যেখানে **একটি নয়, দুটি বোমা** রাখা যায় ? তৃতীয়ত, তিনি লিখেছেন, "দুইটি তরুণ ঐভাবে থাকায় লোকের নজরে পড়িতেছিল" (পৃঃ ৫২), কিন্তু "বহু কর্মীর আনাগোনার পথে" দরজির দোকানে "সহজেই আত্মগোপন" লোকের নজরে পড়ে নি এটা আশ্চর্য নয় ? চতুর্থত, দুটি দিন কি হিসেবে ? ২৮।২৯, না ২৯।৩০ ? পঞ্চমত, অমাবস্যায় রাত্রি আটটা কি প্রায়ান্ধকার ? ষষ্ঠত, তিনি বলেছেন, দুটি বোমা, লিখেছেন, "বোমা নিক্ষিপ্ত হইল", কিন্তু "নিক্ষেপকারী কে তাহা কোনদিনই জানা যায় নাই।" যদি একটি হয় তবে "নিক্ষেপকারী", নয়, নিক্ষেপকারীরা, যদি দুটি হয় তবে নিশ্চয়ই একজন নিক্ষেপ করেন নি, দুজনই করেছেন। এ এমন কিছু রহস্য নয়। সপ্তমত, "উভয়েই বিভিন্ন পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন", ধর্মশালা পর্যন্ত না গিয়েই ? দুজনে একসঙ্গে ছুটছেন দেখে এক প্রহরী কিন্তু হাঁক দিয়ে বলেছিল, ছুটছ কেন ? অষ্টমত, পরবর্তী বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই ইংরেজ সভ্যরা ক্লাব থেকে আসেন নি, ক্ষুদিরাম-মামলার বিবরণী দ্রষ্টব্য। নবমত, মিস ও মিসেস কেনেডির দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়নি, ইতস্তত বিক্ষিপ্তও হয়নি। সর্বশেষত, "মিস ও মিসেস কেনেডি কিংসফোর্ডের ফিটনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন" না (এবং এখানেই বাগচী মশাইর সমূহ ভুল), গাড়িটি ওঁদেরই, অর্থাৎ মিঃ কেনেডিরই, কিংসফোর্ডের গাড়িতে বাড়ি ফেরবার কোন কথাই ওঠে না। বাগচী মশাই কি জানতেন না, ঐ মামলায় কিংসফোর্ডও সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং মামলার বিবরণে কি প্রকাশ পেয়েছে ?

আর এক মূক সাক্ষ্য বিধ্বস্ত গাড়িটা। জজ সাহেবের প্রাঙ্গণে ওটা ছিল ভয়াবহ ঘটনার নীরব সাক্ষী। গদী-আঁটা আসন দুটি ছিন্ন, দগ্ধ, কিন্তু আহতদের রক্তে ভেজা। জজের বাড়ির সামনে গাড়ির টুকরো ছড়ানো, মেয়েদের টুপির খড় (অমৃতবাজার পত্রিকা, ৪ মে, ১৯০৮)।

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র মশাই লিখেছেন (শহীদ ক্ষুদিরাম, পৃঃ ১০৮): ৩০ এপ্রিল, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। তাঁদের দেখে পাহারাদার কনস্টেবলরা জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তফাৎ যেতে বলে। "ক্ষুদিরাম টিনের বাক্সটি ফেলিয়া দিয়া বোমাটি হাতে করিয়া রহিলেন। মজঃফরপুরের অনেক লোক তাঁহাদিগকে প্রতিদিন এই চলাফেরা করিতে দেখিতেছে, খেলোয়াড়দের সঙ্গেও পরিচিত হইয়াছেন।" ঘটনার দিন ও সময়ে তাঁরা "পথের ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়াইলেন (পৃঃ ১০৯)।" মিসেস ও মিস কেনেডি "এক ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া নিজেদের বাসায় ফিরিতেছিলেন। **গাড়িখানি ঠিক কিংসফোর্ডের গাড়ির মত ছিল** (পৃঃ ১১০)। বোমা বিস্ফোরণের অল্পক্ষণ পরে কিশোরী-বাবু ও শহরের **বহু গৃহে** ও ধর্মশালায় খানাতল্লাসী হইল। **ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল একত্রে ধর্মশালায় যান,** সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। রেললাইন ধরে ক্ষুদিরাম **সমস্তিপুরের** পথ, প্রফুল্ল **বরাবর সোজা।** তাঁরা যখন ধর্মশালার কাছে যান তখন একদল কনস্টেবল তাঁদের উদ্দেশে হাঁক দেন।" কিন্তু তাঁরা কর্ণপাত না করে দৌড়োতে থাকেন (পৃঃ ১১১)।

ঈশানবাবু তাঁর ইংরেজী বই "Boy Revolutionary of India"-তে লিখেছেন :

"Khudiram and Prafulla Chaki *stayed in Dharamsala* at Muzaffarpore *for about a week* and watched the movements of Mr Kingsford. And on the evening of the 30th April 1908 a bomb was thrown on a carriage by Khudiram and the explosion killed Mrs. and Miss Kennedy who were coming out of the European Club in *Mr. Kingsford's carriage.* Khudiram by mistake thought that the carriage was occupied by Mr. Kingsford. The Syce of the carriage was also injured in the explosion...... *Both the youngmen hurried to Mokama Station separately.*

বলা বাহুল্য, একই লেখক বাংলা ও ইংরেজী বইয়ে দু'রকম লিখেছেন। বাংলায় আছে, ক্ষুদিরাম সমস্তিপুরের পথে, প্রফুল্ল বরাবর সোজা [কোন্ দিকে তার নির্দেশ নেই]। ইংরেজীতে আছে : Both the youngmen hurried to Mokama Station. বাংলায় আছে, গাড়িখানি ঠিক কিংসফোর্ডের গাড়ীর

মতো, ইংরেজীতে পরিষ্কার আছে: in Mr. Kingsford's carriage.— যা একেবারেই ভুল।

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিপ্লবের সন্ধানে"-তে আছে (পৃঃ ২৮): **"কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা পড়েছিল ঠিকই কিন্তু তাতে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি"** (পৃঃ ২৮)। বর্তমান প্রজন্মের অজ্ঞাত এই স্বল্লেখক সেকালে একজন বিচক্ষণ বিপ্লবী বলে বিদিত ছিলেন। তাঁরও এই মারাত্মক ভুল। আরও ভুল, "ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থলের **কিছু দূরে** ধরা পড়লেন রিভলভার সমেত"—অনেকটা শোনা গল্পের পুনরুক্তির মতো, কতদূরে, কোথায়, কটা রিভলভারসহ—কোন বৃত্তান্ত নেই।

ঘটনাক্রমের যে বিবরণ হেমন্ত চাকী দিয়েছেন তা অতি সংক্ষেপে এই: "একটি গাছের আড়াল হইতে **ক্ষুদিরাম** কিংসফোর্ডের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিল। এ গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। **তিনি ক্লাবেই ছিলেন।** (পৃঃ ১২৯)। ঘটনার রাত্রিতেই প্রবাসীদের বাড়ীতে খানাতল্লাসী শুরু হইয়া গেল (পৃঃ ১৩১)। পরদিবসও কয়েকটি বাড়ীতে তল্লাসী হইল। জুলুম হইল। বিভীষিকার সৃষ্টি হইল (পৃঃ ১৩২)।

১৯৭০ এ প্রকাশিত "অগ্নিযুগের নায়ক" অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন: "বিপ্লবীরা ঠিক করলেন কিংসফোর্ডকে হত্যা করবেন। **প্রথমে নাম ঠিক করা হল** নরেন গোঁসাইর। ভীতু, ধনী সন্তান, সাহস পেলেন না। তখন **উপেন্দ্র-বারীন্দ্র-উল্লাসকর গোষ্ঠী** ঠিক করলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে। **ক্ষুদিরামের বয়স মাত্র ১৮; প্রফুল্ল চাকীরও কম বয়স।** ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় **কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন।** বোমা আসল মানুষের গাড়ীতে না লেগে লাগলো দু'জন ইংরাজ মহিলার গাড়ীতে। **তারা সামান্য আহত হলেন"** (পৃঃ ১২০)।

কি রকম অবহেলে ইতিহাস লেখা যায় এটি তার এক দৃষ্টান্ত। নরেন গোঁসাইর নাম কারা ঠিক করলেন? এ অনেকটা হেমন্ত চাকীর "শুনা যায়" ইতিহাসের মতো। তারপর এলেন উপেন্দ্র-বারীন্দ্র-উল্লাসকর গোষ্ঠী। ক্ষুদিরামের বয়স ১৮, প্রফুল্ল চাকীরও কম। কত? অমরেন্দ্র ঘোষের ইতিহাসে তার প্রয়োজন নেই। কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা, লাগল দুই ইংরাজ মহিলার গাড়ীতে। এ যেন সেই 'এখান থেকে মারলাম তীর লাগল কলা গাছে …চোখ গেলরে বাবা'র মতো। লাগল তো লাগল, "তাঁরা সামান্য আহত

হলেন।" যেখানে সবাই বলেছেন 'মৃত্যু' সেখানে সত্তরের ইতিহাসকার বললেন "সামান্য আহত" হলেন। তা, অমরেন্দ্রনাথ যেখানে বারীন্দ্রকুমারকে "বারীন্দ্র নাথ" করতে পারেন (যেহেতু তিনি নিজে নাথ, ঘোষও বটেন,) সেখানে এমনটি হতেই পারে। অমরেন্দ্রনাথ স্থানান্তরে আরও যেসব চমকপ্রদ ঘটনা লিখেছেন, তা যথাস্থানে দেব।

একদা অনুশীলন সমিতির, মধ্যবর্তীকালে মেছুয়াবাজার বোমা মামলার, সর্বশেষে কম্যুনিষ্ট, সতীশ পাকড়াশী মশাই লিখেছেন : মজঃফরপুর জেলা জজ **কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষিপ্ত হলে জজ সাহেবের পরিবর্তে দু'জন মেমসাহেব নিহত হন"** (পৃঃ ১৫)।

এ ত্রুটি মার্জনীয়, কেননা, লেখক তখন সন্ত্রাসবাদের সঙ্কীর্ণ স্তর "পার হয়ে" দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন আন্দামান দ্বীপের অন্ধকার কারাকক্ষে বিপ্লবের নতুন আলো দেখেছেন। তখন "পেটিবুর্জোয়া ভাবালুতায় আচ্ছন্ন মধ্যবিত্তের বিপ্লবচিন্তা থেকে দুর্গত শোষিত সর্বহারাগণ-সমষ্টির বিপ্লব চেতনা অন্তরকে সমুজ্জ্বল" করেছে। সুতরাং সন্ত্রাসবাদের সঙ্কীর্ণ স্তরের ইতিহাসের ভুলচুক নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য নয়। ড্যালি কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ স্তরের সন্ত্রাসবাদীদের বিপ্লবী (revolutionaries) বলেছেন।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় তাঁর "শহীদ যুগল"-এ লিখেছেন : "১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস। সেদিন রাত্রি ছিল অমাবস্যা। প্রায় ৮ ঘটিকার সময় **ইউরোপীয়ান ক্লাবের প্রাঙ্গণে** প্রবেশ দ্বারের সমীপস্থ একটি **বটবৃক্ষের** অন্তরালে দাঁড়াইয়া একখানি চলন্ত ফিটন গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী যুবক বোমা নিক্ষেপ করিলেন। প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরিত হইল। গাড়ীর কতকাংশ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, সহিস আঘাত পাইল এবং গাড়ীর মধ্যস্থিত আরোহী দুইজন মারাত্মকভাবে আহত হইলেন" (পৃঃ ১৮২-৮৩))

Sedition Committee (1918) Report-এ আছে (p. 32) :

"On the 30th April at Muzaffarpur in the north of Bengal (now in Bihar and Orissa) a bomb was thrown into *a carriage* in which two ladies, Mrs and Miss Kennedy, were driving. They both were killed. The outrage occurred outside the house of Mr. Kingsford, the Judge of Muzaffarpur, for whom it was

not doubt intended. Mr Kingsford had formally been Chief Presidency Magistrate and had resided at Garden Reach, Calcutta and the assassins had been sent to Muzaffarpur, far away in Bihar to commit the crime. The police had received information 10 days before that the murder of Mr Kingsford was intended...".

ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর "ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা"য় (২৪ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, "সহসা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সমগ্র সভ্যজগতের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিহারের মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বোমা বর্ষণ করিয়া বৈপ্লবিক দলের চরম পন্থা বিজ্ঞাপিত করিলেন।"

"অবিস্মরণীয়"-তে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র লিখেছেন, বোমা-বইয়ে "মিঃ কিংসফোর্ড মরল না দেখে তাঁকে মারবার জন্য শেষ পর্যন্ত মজঃফরপুরে পাঠান হ'ল দুটি তরুণকে—সর্বশ্রী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। তাঁরা বোমা ছুঁড়লেন কিংসফোর্ডভ্রমে কেনেডীর গাড়ীতে। মারা গেলেন কেনেডী পত্নী ও দুহিতা। ১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তাঁরা ফিরছিলেন স্টেশন ক্লাব থেকে। গাড়ীটা দেখতে কিংসফোর্ডের গাড়ীর মত। বোমা যখন পড়ল তখন রাত সাড়ে আটটা। ধরে দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এঁরা তখন রেল লাইন ধরে হেঁটে চলেছেন সমস্তিপুরের দিকে" (পৃঃ ৪০-৪১)।

শ্রীক্ষীরোদ কুমার দত্ত তাঁর "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি"তে লিখেছেন: "বিপ্লবী দলে স্থির হল মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু এবং বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করবেন। **১৯০৮ সালের মার্চ মাসের শেষে** দুই বিপ্লবী মজঃফরপুরে পৌঁছলেন। মজঃফরপুরে দুজনে গিয়ে উঠলেন মাহাতো এস্টেটের ধর্মশালায়। দুজনেই দুজনের অপরিচিত। প্রফুল্ল চাকীর নাম দীনেশচন্দ্র রায় এবং ক্ষুদিরামের নাম দুর্গাদাস সেন [যে দুর্গাদাস সেনকে বাগানবাড়ি বোমাষড়যন্ত্র মামলায় ক্ষুদিরামের বিচারাধীন সঙ্গী ফরিয়াদী সাক্ষীরূপে আসামীর কাঠগড়ায় খুঁজে পাননি বা সনাক্ত করতে পারেন নি, ক্ষুদিরামের মামলায় একই কাঠগড়ায় একই সঙ্গে বেশ কিছুকাল থাকা সত্ত্বেও কাউকে দুর্গাদাস সেন বলে সনাক্ত করতে পারেন নি, ক্ষুদিরামের মামলায় ক্ষুদিরামের alias=ওরফে বলেও কিছু ছিল না]। **মাসাধিককাল ধরে** পর্যবেক্ষণের পর বোমা নিক্ষিপ্ত হল ৩০শে এপ্রিল রাত্রিতে। কিন্তু

বিপ্লবীরা গাড়ী ভুল করে ফেললেন। ফলে এই ঘটনায় মিসেস কেনেডী এবং মিস কেনেডী নিহত হলেন। ১লা মে ওয়াইনী স্টেশনে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন এবং মোকামো স্টেশনে প্রফুল্ল গ্রেপ্তার হবার পূর্বে আত্মাহুতি দেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। নির্ভীকভাবে নির্বিকারচিত্তে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। **বিংশশতকে বাংলাদেশে ক্ষুদিরামই প্রথমে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে জাতিকে মৃত্যুভয়াতীত হতে শিখিয়ে গেছেন**" (পৃঃ ৩৫)।

আশ্চর্য যে, একই লেখক প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও প্রফুল্ল চাকীর কথা অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, হঠাৎ তাঁদের ডিঙিয়ে "মৃত্যুভয়াতীত" হবার শিক্ষাগুরু ক্ষুদিরামকে করলেন কেন? মনে কি সন্দেহ ছিল যে, চক্রবর্তী ও চাকী "মৃত্যুভয়াতীত" না হয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন?

কৌতুক-লেখক সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "অগ্নিযুগের অগ্নিকথা"য় লিখেছেন: "মজঃফরপুর শহরের ইউরোপীয়ানদের ক্লাবে বিচারক কিংসফোর্ড আমোদ-আহ্লাদ করতে গিছিলেন। এ খবর প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম আগে জানতেন। তাঁরা তাই কিংসফোর্ডের ক্লাব থেকে গাড়ী ফেরার পথের এক সুবিধামত আর জনবিরল স্থানে হাত বোমা আর রিভলভর নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"এক এক করে সাহেব প্রভুদের গাড়ী চলে যেতে লাগল। রাত যখন আটটা, তখন **মিষ্টার কিংসফোর্ডের ফিটন গাড়ী সেই পথে এল**। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল এর আগে কিংসফোর্ডের ফিটন গাড়ী ভাল করে দেখে গিছিলেন। তাঁরা ভাবলেন, ঐ তো কিংসফোর্ডের ফিটন চলেছে।

"গাড়ী নাগালের মধ্যে এল। রাতের অন্ধকারের মধ্যেও গাড়ীর ভেতর মানুষের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখা গেল।

"**ক্ষুদিরাম** তার হাতের তাজা বোমা ফিটন গাড়ীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বোমা গাড়ীর মধ্যে ছুটে গেল। বোমার আগুন ছোট খোল থেকে সহস্র ধারায় বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়ীটাকে জ্বালিয়ে গাড়ীর আরোহীদের পুড়িয়ে ছারখার করে দিল।

"গাড়ীর ভেতর থেকে আর্তনাদ ভেসে এল। কিন্তু ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল এবার চমকে উঠলেন, তাইতো, এ কার আর্তনাদ? এ যে মেয়েদের চীৎকার, এ তো কিংসফোর্ডের গলার স্বর নয়! **দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।**

বুঝতে পারলেন, কিংসফোর্ডের গাড়ীর মত দেখতে হলেও এ কিংসফোর্ডের গাড়ী নয়। তাঁরা রাতের অন্ধকারে অন্য সাহেবের গাড়ীকে কিংসফোর্ডের গাড়ী বলে ভুল করেছেন।

"বুঝতে পেরে তারা অনুতপ্ত হলেন, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সেই মুহূর্তে সে স্থান থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁরা সাব্যস্ত করলেন, এই ঘটনা নিয়ে পুলিশমহলে একটা বিরাট হৈ চৈ আর তৎপরতা জাগবে, অতএব তাঁরা দু'জনে এক সঙ্গে আব এক পথে কলকাতায় ফিরে যাবেন না, আলাদা হয়ে আলাদা পথে ফিবে যাবেন। দু'জনে ছাডাছাডি হ'য়ে দু'পথ ধরলেন। কেউই সোজাসুজি মজঃফবপুব বেলষ্টেশনের দিকে গেলেন না, যদি পুলিশ ষ্টেশন ঘেরাও করবার ব্যবস্থা করে থাকে? দু'জনেই হাঁটাপথে ছুটতে লাগলেন। ক্ষুদিবাম গেলেন মজঃফবপুব থেকে তিনটা ষ্টেশন পবে ওয়ানী ষ্টেশনের দিকে। প্রফুল্ল গেলেন মজঃফরপুবেব পবেব ষ্টেশন সমস্তিপুরের দিকে।

"তাদেব অনুমান সত্য হয়েছিল। ফিটন গাড়ীটা কিংসফোর্ডের ছিল না, ছিল মিঃ কেনেডি বলে মজঃফবপুরের আর একজন ইংরেজেব। আর ঐ সময় কেনেডির স্ত্রী আব কন্যা তাঁদেব গাড়ীতে চডে ক্লাব থেকে ফিরে আসছিলেন। ক্ষুদিরামেব বোমার আঘাতে **কেনেডীর স্ত্রী গাড়ীর মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন,** কিন্তু তাঁর কন্যাব চাৎকারে আব গাডাব কোচম্যানেব আর্তনাদে **লোকজন জড় হয়ে গেল।** তাবা তাডাতাডি **কেনেডীর আহত কন্যাকে গাড়ী** থেকে নামাল। পুলিশ সংবাদ পেয়ে হাজির হল। **কেনেডীর কন্যাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান হল।** কিন্তু সে বেচারীও হাসপাতালে যাবাব একটু পরেই মারা গেল" (পৃঃ ১৪৭-৪৮)।

ব্যাপারটা একেবাবেই উল্টো। প্রথমত, অন্ধকাবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে তাঁরা কেউ জানতে পারেন নি বোমাটা ভুল গাড়িতে পডেছে। প্রফুল্ল জেনেছেন নন্দলালের কথায়, ক্ষুদিরাম জানতে পাবেন ধরা পড়ার পর। দ্বিতীয়ত, মিস কেনেডি মারা গেছেন আগে, মিসেস কেনেডি পরে। কাউকেও হাসপাতালে পাঠানো হয়নি; কিংসফোর্ডেব বাংলোতেই তাঁদেব শেষ নিঃশ্বাস পডে।

"বঙ্গভঙ্গ"-লেখক সমুদ্রগুপ্ত কিছু কম কৌতুককর সংবাদ দেন নি। তিনি লিখেছেন: "সেদিন ছিল ঘোর অমাবস্যার বাত। পৃথিবী যেন অনাগত এক মহাদুর্দৈবের আশঙ্কায় মুখ ঢেকেছে অন্ধকারে। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে দুটি কিশোর-প্রাণ অতি সন্তর্পণ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সামনের একটা ইউরোপীয়ান

ক্লাবের দিকে। তাদের হাতে রিভলভার, বন্দুক, বোমা। তাদের বুকে নির্ভয় যৌবন। মনে আত্মোৎসর্গের মৃত্যুহীন মন্ত্র।

"ঘড়িতে বাজল আটটা। ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। এই তো সুযোগ। শত্রু সন্নিকট ? আর কি ভয়। মহোল্লাসে গর্জন করে উঠল তাদের বোমা। তার সঙ্গে বুঝি দুটি সকরুণ আর্তনাদ। কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি, মাটির উপরের অন্ধকার, অন্ধকারের ভিতরের স্তব্ধতা! গাড়ির ভিতরে লুটিয়ে পড়ল রক্তাপ্লুত দুটি নিরপরাধ নারীর মৃতদেহ।

"আততায়ী দুটি কিশোর তখন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে আত্ম-রক্ষার তাগিদে। তাদের বোমার আঘাতে কে মরেছে তাকিয়ে দেখারও বুঝি তাদের অবকাশ নেই। রাত পোহাবার আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল পুলিসের সতর্ক সন্ধানী অভিযান" (পৃঃ ২৮০)।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ তাঁর "জাগরণ ও বিস্ফোরণ," দ্বিতীয় খণ্ডের, ২৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "কোয়ার্টারের কাছেই ইউরোপীয় ক্লাবে কিংসফোর্ড তাস খেলতে যান। **১৯০৮ এপ্রিল ৩০-এ খেলার সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় বড় উকিল কেনেডির পত্নী ও কন্যা।** রাত্রি সাড়ে আটটার সময় খেলা শেষ হলে এঁরা কিংসফোর্ডের ঘোড়া টানা গাড়ীর মত অবিকল দেখতে একটা **'ভিক্টোরিয়া'** চড়ে তাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। অল্প দূরত্বের ব্যবধানে কিংসফোর্ডের গাড়ী পিছনে আসছিল। কেনেডির গাড়ী কিংসফোর্ডের ফটকের সামনে আসতেই **ক্ষুদিরাম** বোমা নিক্ষেপ করেন। প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত শহর কাঁপিয়ে বোমা ফাটে আর **সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা চুরমার হয়ে যায়।** শ্রীমতী ও কুমারী কেনেডি মারা যান অল্প সময়ের মধ্যে।

"আততায়ীরা জুতা ফেলে খালি পায়ে ছুটতে আরম্ভ করেন। তাঁরা কিছু পথ একসঙ্গে চলার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যান, দীনেশ সমস্তিপুর ও ক্ষুদিরাম ওয়াইনীর দিকে" (পৃঃ ২৯৬)।

(১৪)

মজঃফরপুর শহরে বোমা নিক্ষেপ, হত্যাকাণ্ড ও আততায়ীদের পলায়নে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি ? অমৃতবাজার পত্রিকায় তার বিশদ বিবরণ বেরোয় ;- অন্যান্য তথ্য মামলার বিবরণে প্রকাশ পাবে।

ঘটনাব পর মিঃ কিংসফোর্ড বাঙালি উকিলদের বলেন, আততায়ীদের সন্ধানে সকলকে সাহায্য করতে হবে। কেননা, তাঁব স্থির বিশ্বাস, তারা (মানে আততায়ীরা) এখানেই কোথাও আশ্রয় পেয়েছিল। তিনি বলেন, কলকাতা থেকে তাঁকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে, **দুজন এনার্কিষ্ট ১৭ তারিখ মজঃফরপুর রওনা হয়ে গেছে।** [তাহলে আততায়ীদের স্থিতিকাল হয় অন্ততঃ ১৩ দিন] এক বাঙালি ভদ্রলোককে কিংসফোর্ড বলেছিলেন, কলকাতায় তাঁব জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, ছেলেরা তাঁকে দেখিয়ে 'বন্দেমাতরম্' বলে চেঁচিয়ে উঠত। পুলিস তাকে সর্বদাই পাহারা দিত। ভেবেছিলাম, মজঃফরপুর এসে তা থেকে রেহাই পাব। কিন্তু এখানেও ওরা পিছু লেগেছে।

বিপ্লবীবা যেখানে অশনি-নিক্ষেপে অপেক্ষমান ছিলেন সেখানে দু'জোড়া জুতা, পাগডীব টুকবো, ময়দানে ফুটবল পোস্টের কাছে একটি টিনের পাত্র আবিষ্কৃত হয়। মজা এই, **পক্ষকাল** ধরে যে গোয়েন্দারা খবর পেয়ে নজর রাখছিল তাবা একদিন আগে চলে গেছে, বৃহস্পতিবারই ঘটনা।

কিংসফোড তাঁব সমগ্র পরিবাবকে মুসৌরি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান বাঙালিদেব বলেছেন, পুলিসকে সাহায্য করে তাঁদেব নিজেদেব নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে হবে। প্রথম দফা মিস কেনেডিব সমাধিস্থানে, দ্বিতীয় দফা আদালতে এই রক্তচক্ষু সম্ভাষণ। বাঙালিদেব সভা করে ঘোষণা কবতে হবে যে, এ ব্যাপাবে তাঁদের কোন সায়-সমর্থন নেই এবং 'অগ্নিগর্ভ' বক্তৃতাদিব সঙ্গে তাঁদের কোন সংস্রব নেই। (ইতিমধ্যে) ধৃত ক্ষুদিরামেব বিচাবের সময় উপস্থিত থাকবাব জন্য তিনি বাঙালি উকিলদের নির্দেশ দেন। তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র বাঙালি সমাজই সন্দেহভাজন। তল্লাসীর ব্যাপারে ছোট বড কাউকেই রেহাই দেওয়া হয় না।

মজঃফবপুব শহবে গবর্মেণ্টের উদ্যোগে পাঁচ পাচটি জনসভা হল সমগ্র ব্যাপাবটা নিন্দা করতে। ডাক-কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টেলিগ্রাম নেওয়া বন্ধ কবেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপে তার সুবাহা হয় এবং সব চাইতে উল্লেখযোগ্য, যারা ক্ষুদিরামকে ধরেছে ও প্রফুল্ল চাকীকে বন্দী করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাদের পুরস্কার দেওয়া হল। এই অনুষ্ঠান একটি জনসভার ঠিক আগে। যে-হলে শহরবাসীরা সমবেত হয়েছেন তার সামনে ইউনিয়ান জ্যাক তোলা হল; ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় পুলিস সারিবদ্ধ হয়ে

দাঁড়াল, ম্যাজিস্ট্রেট ঘোড়ার পিঠে চড়ে পুরস্কার বিতরণ করলেন এবং পুরস্কার প্রাপকদের উদ্দেশে তিনিই প্রথম (হিপ হিপ) হর্ষধ্বনি তুললেন ও সভারম্ভের আগেই চলে গেলেন। পুরস্কাব প্রাপকদেব নাম: সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি—১০০০ টাকা; সাব-ইন্সপেক্টব চতুর্বেদী শর্মা—৫০০ টাকা, হেড কনস্টেবল শিবশঙ্কর সিং—৫০০ টাকা, কনস্টেবল জমির আহ্‌মেদ খাঁ—৫০০ টাকা। এই কনস্টেবল দু'জন প্রফুল্ল চাকীকে ধবে বেখেছিল। নন্দলাল সমস্তি-পুর থেকে মোকামে পর্যন্ত অনুসরণ কবে প্রায় বন্দী কবেছিল কিন্তু প্রফুল্ল জীবন্ত ধরা দেন নি। নন্দলাল মজঃফবপুবেব প্রধান সবকাবি উকিল শিবচন্দ্র চ্যাটার্জির দৌহিত্র। (অঃ বাঃ পঃ, মে ১৩, ১৯০৮)

ওয়েইনি স্টেশনে ক্ষুদিবামকে ধববাব জন্য কনস্টেবল শিবপ্রসাদ মিশির ও কনস্টেবল ফতে সিং পুবস্কাব পেয়েছে ৫০০ টাকা কবে। কিন্তু এরা কেউ বিস্ফোবণেব দিন, ৩০ এপ্রিলেব, ঘটনাক্রমেব সাক্ষী নয়।

আর তিবস্কার লাভ কবেছেন মজঃফবপুবেব বাঙালিরা, ম্যাজিস্ট্রেট ধমকাচ্ছেন, পুলিস শাসাচ্ছে, নীল-কব চা-কবদেব ব্যঙ্গোক্তি চলছে, মুসলীম লীগেব বাজানুগত্য ও ধিক্কার সববে উচ্চাবিত হচ্ছে, ইত্যাদি। সে-রাতটা কি ভয়াবহ! পুলিস চৌকিদাবেরা যত উচ্চগ্রামে সম্ভব ততটা গলা ছেড়ে লোকেব ঘুম ভাঙিয়ে ঘটনার বিববণ দিচ্ছে, আততায়ীদেব বর্ণনা দিচ্ছে, লোভ জাগিয়ে ৫০০০ টাকার পুরস্কাব ঘোষণা কবছে। ডিভিসানাল কমিশনার আসছেন, সরকারি-বেসরকারি ইংলিসম্যানরা আসছে, ছোট্ট শহব তোলপাড! সন্দেহ-ভাজন বঙ্গীয় ভদ্রসন্তানদের গৃহগুলো যতটা সম্ভব তল্লাসী হল এবং এই মর্মে গুজব জেগে রইল, সকালে সব বাঙালি বাড়িতে ওবা এক হাত দেখে নেবে। বাঙালিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হল এবং সামান্য নৈতিক বলও হাবিয়ে ফেলল।

অবশ্য ইউরোপীয়ানদের মনেও ঐ মৃত্যুর ত্রাস সঞ্চারিত হল। তা এমনই যে, একটি যক্ষাক্রান্ত বাঙালি তরুণ বায়ু পবিবর্তনেব জন্য আসছিল, আর যারা তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে আসছিল, সবাইকে আটক করা হল। এক-জনও বাঙালি উকিলেব এমন সাহস হল না যে তাদেব জামিনে ছাড়িয়ে নেবে। তরুণটি খুবই অসুস্থ। অবশেষে এক ডাক্তাব সাহস করে একজন উকিল সঙ্গে করে সংশ্লিষ্ট ইউবোপীয় বাজপুরুষের বাংলোয় উপস্থিত হলেন একখানি দরখাস্ত নিয়ে। উকিল থাকলেন গাড়িতে। সাহেব এক ব্যক্তির আগমনের পদধ্বনি শুনে যেই না পর্দা সরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন অমনি ভূত দেখলে নাকি

মানুষ যেমন অজানা আশঙ্কায় অভিভূত হয় তেমনি 'কে?' 'কে?' বলে একেবারে ঘুরে পর্দা ঠেলে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার মিনতি করে বার বাব বোঝাতে লাগলেন, তিনি একখানি দরখাস্ত এনেছেন মাত্র এবং ব্যাপারটা এই। তখন আশ্বস্ত রাজপুরুষ রোগী ও তার সঙ্গী দুটিকে জামিনে ছাড়বার ছাডপত্রে সই্ কবেন। (অঃ বাঃ পঃ, মে ১২, ১৯০৮)

মজঃফরপুর থেকে বেশি দূবে নয়, ইউবোপীয়ান ক্লাবে একটা সোডাব বোতল প্রচণ্ড আওয়াজ কবে ফেটে যাওয়ায় হলে যাঁরা ছিলেন তাদের এমন হৃদ্‌কম্প হয় এবং ছোটাছুটি চলে যে, পরদিন তা বাজাবের এক চাঞ্চল্যকর গল্প হয়ে পড়ে।

খুবই নামজাদা উর্ধতন এক ইউরোপীয়ান আমলাব এক বাঙালি কর্মচারী দেখা কবতে গিয়েছিলেন। প্রথমে ইউবোপীয়ানটি দেখাই করতে চান নি। কিন্তু কি ভেবে যখন দেখা কবলেন তখন সৌজন্যের কিছু আতিশয্যই ঘটল। ইঞ্জিনিয়াবিং বিভাগেব আব এক ইউরোপীয়ান ভদ্রলোকেব এমনই এক ভাবনা তাঁর মস্তিস্ক আচ্ছন্ন করল যে, তিনি সুনিশ্চিত যে, তিনিই বোমার পরবর্তী শিকাব। তিনি তাঁব অতি বৃদ্ধ হেড ক্লার্ককে বোমা দিয়ে মানুষকে উডিয়ে দেবাব পাপ ও ব্যর্থতা সম্পর্কে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে চললেন।

এই সেদিন এক স্থানীয় বাঙালি আর এক স্টেশনে তার কিছু বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গীত শোনাবার জন্য গিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল, রাত্রিব ট্রেনে ফিরবেন। ট্রেন আসবার কিছু আগেই স্টেশনে পৌছে যান। বোমা দুর্ঘটনার পর ঐ স্টেশনে যে প্রহরী মোতায়েন কবা হয়েছিল তার কেমন সন্দেহ হল। হাতে একটা বেহালার বাক্স দেখে সন্দেহ আবও ঘনীভূত হল : নিশ্চয়ই ওটা মারাত্মক বোমাব পাত্র। ভদ্রলোকেব নাম বরদাকান্ত রায়। প্রহরীরা তাকে গ্রেপ্তার করল এবং জানালো, তাদের ওপব এই আদেশ আছে যে, তারা যেন কোন বাঙালিকে রাত্রে মজঃফরপুব আসতে না দেয়। সুতবাং, ঐ ভদ্রলোক ঐ স্টেশনেই আটক রইলেন সারা রাত্রি। পবদিন আদালতে। তাবপর অতি সাবধানে বাক্সটি পরীক্ষার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। আটক থাকার সময়ও কিন্তু বাক্সটি আট ন'বার পরীক্ষা করা হয়েছিল। ব্যাপাবটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন সব বাঙালিই নজরবন্দী। বাঙালিমাত্রেরই নামের তালিকা করা হয়ে গেছে, সবাব ওপরই কডা নজর। এ যেন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—গোছের ঘটনা। (অমৃতবাজাব পত্রিকা, মে ১১, ১৯০৮)

কল্পনা করা যেতে পারে, সন্ত্রস্ত ও অতি-তৎপর সরকারি বেসরকারি উচ্চ-নীচ সর্ববিধ লোকের মধ্যে কি রকম পল্লবিত সত্যমিথ্যা-মেশানো গুজব, গল্প সমগ্র আবহাওয়াকে গ্রাস করেছে এবং মিথ্যার পঙ্কিল জল থেকে সত্য আহরণের জন্যে কি অসাধারণ এক পরমহংসের দরকার। খুবই স্বাভাবিক যে, এই পঙ্ক-স্রোতের তোড়ে কোন কোন কাহিনীকার ভেসে গেছেন এবং কোন ফাঁক-পূরণে স্বকপোলকল্পনা সংযোজন করেছেন। গুজবের একটি নমুনা—প্রফুল্ল চাকীকে জীবন্ত ধরার চেষ্টার নায়ক নন্দলালের দাদামশাই শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি এই মর্মে উড়ো চিঠি পেয়েছেন যে, বোমায় তাঁর প্রাণান্ত স্থির হয়ে গেছে। দীনেশ চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর বদলা নেওয়া হবে এই হারে: প্রতি বাঙালি প্রাণহননে ৩০০ ইউরোপীয়ান—"এম্পায়ার"

কিংসফোর্ড মোতিহারিতে ছুটি ভোগ করছেন। এক বাঙালি জমিদারকে বলেছেন, 'কলকাতার নানা উত্তেজনার পর বেশ শান্তিতে আছি।' উকিলসভায় তিনি প্রিয়জনও হয়ে উঠেছেন। ১৭ মে মজঃফরপুরে ফিরে আসবেন। (অঃ বাঃ পঃ, মে ১৫)

সরকারি উকিল হুমকির চিঠি পেয়ে কিছু সন্ত্রস্ত হয়েছেন, তিনি পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টকে এই মর্মে অনুরোধ করেছেন যে, তিনি যেন নন্দলালকে কিছুদিনের জন্য মজঃফরপুর রাখেন।

বিহারে বাঙালিদের অবস্থা খুবই কাহিল। ইউরোপীয়ান আমলারা বাঙালিদের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন। বেসরকারি ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় ও বণিকেরাও বাঙালিদের সংশয় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছেন। বিহারী-হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শিক্ষিতেরাও বাঙালিদের এই সঙ্কটে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। বাঙালিদের সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করে হাজতে আটকানো চলল।

(১৫)

উপরের খবরগুলো ক্ষুদিরামের ধরা পড়ার সমসাময়িক ও কিছু পরের। ক্ষুদিরাম ঘটনার পরদিনই ধরা পড়েন। ৩০ এপ্রিল রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনা, ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন ১ মে।

এই ধরা পড়ার বিবরণ, ক্ষুদিরামের মামলার শুনানি বাদ দিলে, নগেন্দ্র গুহরায়ের 'শহীদ-যুগল' বইয়ে যত বিশদ আছে অন্য কোন বইয়ে তেমন নেই।

কিন্তু নির্ভুল বা সংশয়াতীত নয়। তবু সেখান থেকে আরম্ভ করে আমরা ধীরে ধীরে যে ক'টা বইয়ে সামান্যমাত্রও আছে তা লক্ষ্য করে মামলায় পৌঁছোব।

"প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপের অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থল হইতে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা রেলের রাস্তা ধরিয়া পায়ে হাঁটিয়া রওনা হইলেন সমস্তিপুরের দিকে। মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াইনী ষ্টেশনের (বর্তমানে পুশা রোড ষ্টেশন) নিকটে পৌঁছিলে রাত্রি প্রভাত হইল। পয়লা মে শুক্রবার এইস্থানে ক্ষুদিরাম দুইজন কনষ্টবল কর্তৃক ধৃত হইলেন।"

ক্ষুদিরাম কিভাবে ধরা পড়লেন তার যে বিবরণ স্বয়ং ক্ষুদিরাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দিয়েছিলেন "সঞ্জীবনী" সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে নগেন্দ্রকুমার গুহরায় তা উদ্ধৃত করেছেন। তারিখ—১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৪ বৈশাখ, খ্রীস্টাব্দ ১৯০৮, ৭ মে। উদ্ধৃতির আপাতত প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এই:

'শুক্রবার বেলা ১ টার সময় ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াইনী ষ্টেশন হইতে খবর আসিল ক্ষুদিরাম ধরা পড়িয়াছে। পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তৎক্ষণাৎ ওয়াইনী গমন করিলেন। সন্ধ্যার সময় ক্ষুদিরামকে লইয়া তিনি মজঃফরপুর ফিরিয়া আসিলেন। তাহাদের জন্য ষ্টেশনের বাহিরে একখানা ফিটন গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। ক্ষুদিরাম দৃঢ়পদে সহাস্যবদনে গাড়ীতে আরোহণ করিল। তাহার একদিকে পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অপর দিকে আর একজন পুলিস কর্মচারী উপবেশন করিলেন। ক্ষুদিরাম উচ্চৈস্বরে বন্দেমাতরম্ বলিতে লাগিল—গাড়ী তাড়াতাড়ি ষ্টেশন হইতে চলিয়া গেল।' [আমি এসব বিবরণ 'অমৃতবাজার পত্রিকার উপর নির্ভর করেছি, যথাস্থানে বলব।]

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষুদিরামের বিবৃতির একাংশে আছে: 'বোমা নিক্ষেপের পর **দীনেশ বাঁকীপুরের দিকে** পলাইল, আর **আমি সমস্তি-পুরের দিকে দৌড়িয়া গেলাম**। ওয়াইনি ষ্টেশনে এক মুদির দোকানে যখন আমি জল খাইতেছিলাম, তখন দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে।'

দেখা যাচ্ছে, নগেন্দ্রকুমার গুহরায় যে বলেছেন, "প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম দ্রুত গতিতে পায়ে হাঁটিয়া সমস্তিপুরের দিকে রওনা হইলেন" কথাগুলো ক্ষুদিরামের বিবৃতি থেকে পৃথক। অর্থাৎ দু'জন দুদিকে দৌড়ে গেছেন। হেঁটে দৌড়ে, যেভাবেই হোক ২৪ মাইল যেতে কম্‌সেকম আট-ন ঘণ্টা লেগেছে—যদি নগেন্দ্রকুমারের স্টেশনের নিকট প্রভাত হইল কথাটা ঠিক হয়। মে মাসে সাড়ে চারটায়ই বেশ প্রভাত, মুদির দোকান সচরাচর ছ'টার আগে খোলে না।

নগেন্দ্রকুমার যদি দুজনকেই সমস্তিপুরের দিকে হাঁটিয়ে থাকেন, প্রফুল্ল কিভাবে গ্রেপ্তার এড়ালেন এবং ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন ? আগাগোড়াই দুজনে পৃথক হয়ে পৃথক পথে হেঁটেছেন বা দৌড়েছেন তাই তো মনে হয়।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় তাঁর একই বইয়ে প্রফুল্ল চাকী প্রসঙ্গে একথার খানিকটা জবাব দিয়েছেন। তিনি ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "...সারা রাত্রি হাঁটিয়া মজঃফরপুর হইতে **২৪ মাইল দূরে একটি আমবাগানে** আশ্রয় লইলেন।...মজঃফরপুরের উকিল শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সকালবেলা ক্ষুধায় কাতর হইয়া **প্রফুল্ল** ক্ষুদিরামকে পাঠাইয়াছিলেন ষ্টেশনের সংলগ্ন মুদির দোকান হইতে মুড়ি কিনিবার জন্য। ক্ষুদিরাম হিন্দি জানিতেন না। দোকানদারকে 'মুড়ি দে' বলিতেই পার্শ্বে দাঁড়ান সাদা পোষাকের কনষ্টেবল তাঁহাকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল।...**ক্ষুদিরাম ধৃত হইবার পর প্রফুল্ল সেই আমবাগানের আশ্রয় হইতে সমস্তিপুরের দিকে রওনা হইলেন।**"

"অবিস্মরণীয়" লেখক শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র লিখেছেন (পৃঃ ৪১): "এঁরা রেললাইন ধরে **হেঁটে** চলেছেন সমস্তিপুরের দিকে। এক রাতে তাঁরা হাঁটলেন **২৩ মাইল**। নীরস বৈশাখের রিক্ততায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বর্তমান **লাখা** ষ্টেশনের কাছে ক্ষুদিরাম গেলেন একটা মুড়ির দোকানে মুড়ি কিনতে। সেখানে ছিল কনেষ্টবল ফতে সিং আর শিওপ্রসাদ সিং প্রহরারত। সন্দেহে তিনি ধরা পড়লেন। **তিনি গুলি চালাবার জন্যে রিভলভার তুলেছিলেন** কিন্তু দুর্ভাগ্য—চালাবার আগেই ধরা পড়ে গেলেন। তাঁর দেহ তল্লাসী করে পুলিশের কর্তারা পেয়ে গেলেন দুটি রিভলভার ও ৩০টি কার্তুজ। তাঁকে আনা হল মজঃফরপুরে। ক্ষুদিরাম বসু **সহকর্মীকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সঙ্গীর নাম বললেন দীনেশচন্দ্র রায়।**" যেন ক্ষুদিরাম তাঁর সঙ্গীর প্রকৃত নাম জানতেন!

এবার 'অগ্নিযুগের অগ্নিকথা'র গল্প, একেবারে অভিনব। "ক্ষুদিরাম ধরাও দিলেন, প্রাণও দিলেন। ধরা অবশ্য ইচ্ছে করে দিলেন না। ক্ষুদিরাম ওয়ানী ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। দিনটা ছিল পয়লা মের সকাল। সারা রাত হেঁটে এসেছে খালি পায়ে। পথের শ্রমে শরীর ক্লান্ত, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। ঘুমতে সময় বা জায়গা পাননি, চেহারা কেমন রুক্ষ। তার উপর মনে একটা উদ্বেগ।

"ক্ষুদিরাম ষ্টেশনের একটা গাছতলায় শুয়ে পডলেন। ক্ষুদিরাম ভুল করলেন কিংবা তাঁর ভাগ্য তাঁকে ভুল করাল। ষ্টেশনের প্লাটফর্মে পুলিশ প্রহরীরা পাহাবা দিচ্ছিল। নগ্নচরণ, রুক্ষ চুল আর শুকনো দেহ দেখে তাদের কেমন সন্দেহ হল—লোকটা অনেক দূর থেকে যেন হেঁটে আসছে মনে হচ্ছে না?

"তাবা কেউ কেউ ক্ষুদিবামেব কাছে গিয়ে তাঁকে ডাকল। ক্ষুদিরাম চোখ খুলে দেখলেন। সামনে পুলিশ দেখেই টপ কবে উঠে দাঁডালেন। পুলিশ তাঁকে ঘিবে দাঁড়াল। ক্ষুদিরাম শেষ ভুল করলেন। ভাবলেন, পুলিশ তাঁকে চিনতে পেবে ধববার জন্যে ঘেবাও করেছে। ক্ষুদিবাম কোন কথা না বলে তাঁব কোমব থেকে বিভলভব বেব কবলেন। **ক্ষুদিরাম আত্মহত্যা করতে চাইলেন।** কিন্তু প্রহরীর দল রিভলভব দেখাব সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পডল, সকলে ধ্বস্তাধ্বস্তি কবে তাঁব হাতের রিভলভব কেডে নিজেদেব হস্তগত করল।

"পুলিশের সন্দেহ ক্ষুদিবাম নিজেই সত্য বলে প্রমাণ করে দিলেন। পুলিশ ক্ষুদিবামকে গ্রেপ্তার কবল। প্রহরীদের মধ্যে শিউপ্রসাদ সিং আব ফতে সিং এবা দু'জনেই ক্ষুদিরামেব উস্কোখুস্কো মূর্তি আর ক্লান্ত চেহারা দেখে সকলেব আগে তাঁকে সন্দেহ করেছিল, এবা দু'জনই উদ্যোগী হয়ে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করেছিল। এদের দু'জনের তখন গর্বে বুক ফুলে উঠল। তারা কেঁচো খুঁডতে এসে হঠাৎ সাপ বের করে ফেলেছে। তারা ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের কর্তাদের কাছে তার পাঠাল। কর্তারা হাজিব হলে, ক্ষুদিরামকে পাকাপাকি ভাবে দোষী বলে সনাক্ত করার জন্য মজঃফরপুরে পাঠিয়ে দিলেন। ক্ষুদিরাম মজঃফরপুবের জেল হাজতে বন্দী হলেন" (পৃঃ ১৫২-৫৩)।

এ গল্পেব কপিরাইট এইখানে যে, জিতুরামের দোকান বা মুড়িটুডি নয়, স্রেফ ঘুম হল কাল এবং আত্মহত্যাও করতে চাইলেন—যা আর কোন বইয়ে বা মামলার সময় ফরিয়াদীপক্ষেব কোন সাক্ষীই এরকম সুন্দর সাজিয়ে বলতে পারেন নি। শুধু তাই নয়। তিনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা উপেক্ষা করে বলেছেন :

"**প্রফুল্ল চাকী তখন দেহত্যাগ করেছেন।** (কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বলেছেন, ক্ষুদিরামের ধরা পডবার পর প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন, আগে নয়। আমরা উত্তর দেব, আমরা আগেই বলে গিয়েছি, অত চুলচেরা

প্রামাণ্য বিচারে আমাদের দরকার নেই। আমরা গল্পকে গল্পের মত করে সাজিয়ে যাব। যাঁর ইচ্ছে হবে তিনি খুঁৎ না ধরে পড়বেন।)"

ভাল কথা। কিন্তু ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসুরা যাতে বিভ্রান্ত না হন তাও তো না দেখলে নয়। এসব কথা তো 'এক যে ছিল রাজার' গল্প নয়, বা প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও নয়। সুতরাং, তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসে ঘটনার ক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, "খুঁৎ" না ধরা কর্তব্যের হানি। গল্পকে প্রতি পদে বিশ্লিষ্ট করেই এগোতে হবে। কেননা, ছাপা অক্ষরের বই উৎসুক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পড়বেই।

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে বলেছেন: "পুলিশ প্রফুল্লের দেহ মজঃফর-পুরে এনেছিল। ক্ষুদিরাম হঠাৎ ধরা পড়াতে [১ মে] পুলিশের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। তারা অপরাধ আর অপরাধীকে সনাক্ত করবার জন্যে ক্ষুদিরামকে প্রফুল্লের দেহের সামনে নিয়ে গেল" (পৃঃ ১৫৩)। [সে কবে? কোন্ তারিখে? ১লা মেতেই কি? প্রফুল্লকে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল বলেই চিনতেন কি? প্রফুল্ল কবে প্রাণ বিসর্জন দেন দু'জন পুলিস জাপটে ধরা সত্ত্বেও? সুশীলবাবু এসব "চুলচেরা" বিচার করতে নারাজ, কেননা, তিনি লিখেছেন গল্প। এবং নাটকীয়তাই গল্পের প্রাণ।]

"ক্ষুদিরাম চমকে উঠলেন। প্রফুল্লর দিকে চেয়ে রইলেন। তার চোখের কোণে বোধ হয় জীবনে এই প্রথম আর এই শেষ জলের ফোঁটা দেখা গেল।

"ক্ষুদিরাম বুঝলেন প্রফুল্ল নিজের প্রাণ দিয়ে নিজের ভুলের দেনা শোধ করে গেছেন। ক্ষুদিরামও তাঁর হিসেব মিটিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, হাঁ, প্রফুল্লও আমার সঙ্গে কলিকাতা থেকে একই উদ্দেশ্যে এসেছিল। কিন্তু গাড়ীর দিকে আমিই বোমা ছুঁড়েছিলাম, প্রফুল্ল নয়।"

প্রফুল্লকে ক্ষুদিরাম দীনেশচন্দ্র রায় বলে জানতেন, কি ক'রে প্রফুল্ল বলে সনাক্ত করলেন? কিন্তু সুশীলবাবু এসব প্রশ্নের বাইরে। তিনি বলে চলেছেন: "বন্ধুর মরা দেহ দেখে বীর ক্ষুদিরাম মুহূর্তের আবেগে নিজের দোষ নিজেই স্বীকার করলেন। পুলিশের সনাক্তকরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিজের জীবন বিসর্জনের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করলেন। সন্তুষ্ট পুলিশ বিভাগ ক্ষুদিরামকে নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের (ব্যাবউড) সামনে হাজির হল। ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষুদিরামের বিবৃতি সরকারী কাগজে পাকা করে লিখে নিল" (পৃঃ ১৫৪)।

কিন্তু ইতিহাস-বিকৃতি এখানেই শেষ নয়। আরও গল্প আছে:

"পুলিশ বিভাগ···**কেনেডী পরিবারের হত্যাকারীদের খোঁজ**

করতে গিয়ে একটা ষড়যন্ত্রকারী রাজদ্রোহী দলের খোঁজ পেয়ে গেল। যুগান্তর দল আর মুরারীপুকুরের কাণ্ড তারা জানতে পারল। ক্ষুদিরাম তো জানতেই পেরেছিলেন, সি আই ডি বিভাগ প্রফুল্ল আর নন্দলালের বাক্যালাপের চোখ দিয়ে দলের গোপন কাণ্ডকারখানা সব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। পুলিশের মুখ থেকে দলের গতিবিধির বিষয় সব শুনে ক্ষুদিরাম বুঝলেন, আর ভীরুর মত আত্মগোপন করে লাভ নেই। পুলিশ যখন খানিকটা জানতে পেরেছে, তখন আমি বাকীটুকু ওদের জানিয়ে দেব" (পৃঃ ১৫৫)।

কি জানাবেন? কি জানতেন তিনি মুরারীপুকুরের কাণ্ড? কি সে প্রফুল্ল-নন্দলাল বাক্যালাপ যাতে গোপন কাণ্ড-কারখানা সব স্পষ্ট দেখা গেছে? গ্রেপ্তার বা আদালতে চালান ক্ষুদিরামের এই প্রথম নয়। 'সোনার বাংলা' ইস্তাহার বিলির জন্য দায়রা সোপর্দও হয়েছিলেন। তবু পুলিশের মুখে দলের গতিবিধি শুনেই বুঝলেন যে "আর ভীরুর মত আত্মগোপন করে লাভ নেই"? পুলিশ যখন খানিকটা জানতে পেরেছে তখন বাকীটুকু জানিয়ে দেব—এমন কথা বিপ্লবীরা বলেন না। সুশীলবাবুর কল্পিত নায়কের মুখে প্রথমে শোনা গেল, পরে শোনা গেছে বারীন্দ্রের মুখে এবং রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইর মুখে। ক্ষুদিরাম কি এবং কতটুকু জানতেন, বা জানা সম্ভব ছিল তা ক্ষুদিরামের দুটি স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশ। মানিকতলা বা অন্যান্য ঘাঁটির খবর ক্ষুদিরামের অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং, এই যে ঘোষণা, ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তিতেই মানিকতলা বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছে, তা সর্বৈব ভিত্তিহীন। প্রফুল্লকে যে হেয় করার চেষ্টা হয়েছে তাও আপত্তিকর। প্রফুল্লর মত বিরল বিপ্লবী নন্দলালের চোখ খুলে সব দেখিয়ে দিলেন? এসব কথার সপক্ষে লেখক যেসব 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন তা অবান্তর ও গ্রহণের অযোগ্য।

'বঙ্গভঙ্গ'-লেখক সমুদ্রগুপ্ত লিখেছেন: "পরের দিন শুক্রবার বেলা ১টার সময় মজঃফরপুরের ২৪ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনি ষ্টেশন থেকে খবর এল ধরা পড়েছে একজন আততায়ী, নাম ক্ষুদিরাম। শিবপ্রসাদ মিশ্র আর ফতে সিং এই দুই কনেস্টবল পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের নির্দেশে রাত্রির ট্রেনে ছুটে যায় ওয়াইনি ষ্টেশনে। রাত পোহাল। সকাল ৮টা কি ৯টা। একটা মুদির দোকানে তারা দেখতে পেল একটি বালককে জল খেতে। সন্দেহ হল।

আততায়ীর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলে মনে হল তাদের।- কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাবে ?

"ক্ষুদিরামের তেজোদৃপ্ত উত্তর,—তেজপুর। কনেস্টবল এই সময় তাকে ধরতে গেল। পালাবার চেষ্টা করলে ক্ষুদিরাম। কিন্তু পারলে না। ধরা পড়ল বামাল সমেত। তাঁর বাঁ বগলে জামার মধ্যে জড়ানো একটা পিস্তল। পকেটে ছিল ৩২টা টোটা। ৩টে দশ টাকার নোট। কিছু খুচরো টাকা। রেলওয়ে টাইম টেবলের কিছু ছেঁড়া পাতা।

"আততায়ী ধৃত এই সংবাদ পেয়েই পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছুটলেন ওয়াইনি স্টেশনে। স্টেশনের বাইরে ফিটন গাড়ি প্রস্তুত ছিল। সেই গাড়িতে ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে। তখন সন্ধ্যে। গাড়িতে ওঠার আগে ক্ষুদিরাম একবার শুধু প্রাণভরে উচ্চারণ করলে—বন্দেমাতরম্। ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে এসে থামল গাড়ি। তারপর শুরু হল প্রশ্নোত্তর (পৃঃ ২৮৮-২৮৯)।

এ বইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য প্রফুল্লর আর এক নাম দীনেশ **রঞ্জন** রায়, দীনেশ চন্দ্র নয়। একবার নয়, একাধিকবার। দোষটা চেপেছে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের উপর। তাঁরই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ২৯০)। এখানে সেই গল্পটি আছে : "হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল মজঃফরপুর থেকে ২৪ মাইল দূরের এক আমবাগানে। দেহ অবসন্ন। পাকস্থলী শূন্য। সকাল হতেই প্রফুল্ল তাই ক্ষুদিরামকে পাঠিয়েছিল খাবারের যোগাড় করতে। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল। (পৃঃ ২৯১)

"জাগরণ ও বিস্ফোরণ"-এ শ্রীকালীচরণ ঘোষ লিখেছেন : "ক্ষুদিরাম (দুর্গাদাস) ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে রেল-লাইন ধরে চলতে থাকেন এবং চব্বিশ মাইল অতিক্রম করে বেঙ্গল ও নর্থওয়েষ্টান রেলের ওয়াইনী (বর্তমান ওয়েন) ষ্টেশনে গিয়ে পৌছান পরদিন সকাল আটটায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে কাতর হয়ে তিনি নিকটস্থ এক দোকানে গিয়ে মুড়ি কিনে খাচ্ছিলেন, সন্দেহক্রমে পুলিশ তাকে সেখানে গ্রেপ্তার করে।··· গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পকেট থেকে রিভলভার বার করবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের লোক হাত চেপে ধরায় সক্ষম হন নি। তাঁর নিকট দুটো রিভলভার, খুচরো **সব মিলিয়ে নগদ প্রায় ত্রিশ টাকা** এবং **সাঁইত্রিশটি টোটা** ছিল। আর ছিল—ভারতীয় রেলপথের একখানা মানচিত্র এবং টাইমটেবলের একখানি বিচ্ছিন্ন পাতা।

"বিকালের ট্রেনে তাঁকে মজঃফরপুর নিয়ে যাওয়া হয়।···ট্রেন থেকে **থানায়**

নিয়ে যাবার জন্য **পুলিশের গাড়ীতে** তোলবার সময় তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়েছিলেন মাত্র" (পৃঃ ২৯৭-৯৮)। (তথ্য বৈষম্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য স্থূলাক্ষরগুলো আমার।)

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র তাঁর ইংরেজী বই "Boy Revolutionary of India"-তে লিখেছেন : "Khudiram was taking *sweets* at Waini Station with two revolvers *hanging in his pockets* where he was seized with his revolvers and several cartridges by *a* constable of Mazaffarpore named Fateh Sing and brought to Mozaffarpore. Prafulla Chaki committed suicide at Mokameh Station *that day* wtih his own revolver when he was attempted to be arrested by Sub-Inspector Nanda Lal Benerjee." (p. 44) **একজন** কনষ্টেবল এবং **ঐদিনই**। দুটিই ভুল।

ঈশানবাবু তাঁর বাংলা বই "শহীদ ক্ষুদিরাম"-এ যা লিখেছেন তার মর্মার্থ এই : (ক্ষুদিরাম) "জলপান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় **দুই** কনস্টেবল" এসে প্রশ্ন করে, কোথা থেকে আসছেন ইত্যাদি। সন্দেহে **একজন** হাত ধরে ফেলে, ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়, পকেট থেকে রিভলভার পড়ে যায়। আর একটি বের করে গুলি ছুঁড়তে চেষ্টা করার আগেই কনস্টেবল জড়িয়ে ধরে। **১লা মে প্রাতে**" (পৃঃ ১১২)।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধায়ের "বিপ্লবের সন্ধানে" ২৮ পৃষ্ঠায় আছে : ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থলের **কিছু দূরে ধরা পড়লেন রিভলভার সমেত**"। সংক্ষিপ্ত সংবাদ।

হেমন্ত চাকী তাঁর "অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী"-তে খবর দিয়েছেন : একটি ফিটন গাড়ী রেল ষ্টেশনের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকে। ৫ ঘটিকার সময় একটি স্পেশ্যাল ট্রেন মজঃফরপুর আসে। প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে ক্ষুদিরাম ও পুলিশ সুপার বাহির হইয়া আসেন। তারপর একটি ফিটনে উঠেন। ক্ষুদিরাম উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দে মাতরম্' বলিতে লাগিলেন। (পৃঃ ১৩৩)

এই বইয়ে 'Statesman' থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি আছে : The railway station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old, who looked quite determined. He came out of a First Class compartment and walked all tbe way to phaeton,

kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety……On taking his seat the boy lustily cried Bande Mataram……"

"ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব"-এর লেখক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় লিখেছেন : "প্রফুল্ল চাকিকে ছেড়ে ক্ষুদিরাম ছুটলেন রেল লাইন ধরে কোন স্টেশন ধারে কাছে পাবার প্রত্যাশায়। যে কোন স্টেশনে পৌছলেই গাড়ি চেপে কলকাতা রওনা হবেন। তিনি পৌছলেন এসে 'উইনি' স্টেশনে। মজঃফরপুর থেকে ছোট্ট এই স্টেশনটি **বিশ** মাইল দূরে। কিশোর বিপ্লবীর পায়ে জুতা নেই, পরনে জামা-কাপড় মলিন, রুক্ষ চুল, ক্লান্ত দুটি নয়ন। এত দূর পথ ছুটে এসে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অবসন্ন তাঁর দেহ। বুভুক্ষু কিশোর স্টেশনের অনতিদূরে **বাজারে** ঢুকলেন। তখন **ভোর** ৮ টা। তারিখ ১৯০৮ সালের ১ লা মে। এক দোকানীর কাছ থেকে **চিঁড়ে কিনে খেলেন**। তারপর জল খাবার জন্য এগুতেই পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ তাঁকে নানা প্রশ্ন করার কালে এক সময় দুঃসাহসী কিশোর পালাবার চেষ্টা করায় পুলিশ তাঁকে শক্ত করে ধরে রাখল। কিন্তু এক ফাঁকে ক্ষুদিরাম জামার নিচ থেকে রিভলভার বের করে গুলি ছোঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করায় তাঁর দেহ তল্লাশী করা হল। তল্লাশী করে পাওয়া গেল দুটি রিভলবার ও কার্তুজ। **শৃঙ্খলিত** ক্ষুদিরাম **সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টিত** হয়ে মজঃফরপুর আনীত হলেন সেদিনই অপরাহ্নে" (পৃঃ ৫৪)।

"মজঃফরপুর স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে বন্দীবীরকে নিয়ে। স্টেশন লোকে লোকারণ্য শৃঙ্খলিত কিশোর পুলিশের গাড়িতে বসে যখন উদাত্তকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, তখন **সকলে ব্যাকুলকণ্ঠে সেই ধ্বনি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। মজঃফরপুরের আকাশ বাতাস সেই সন্ধ্যায় মাতৃমন্ত্রে পূত হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম মুহূর্তে জনমানসে মুক্তিদূতের স্থান অধিকার করে বসলেন**" (পৃঃ ৫৫)।

এই বইখানির প্রথম প্রকাশ বঙ্গাব্দ ১৩৭৭ এর আষাঢ়, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮০ ফাল্গুন, যথাক্রমে ১২ ও ৯ বছর আগে অথবা ১৯৭০/১৯৭৩ এ, অথবা ভারতীয়দের হাতে ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তরের ২৩/২৬ বছর পরে। কোন তাড়া ছিল না, অযথা আবেগ-উচ্ছ্বাসে তথ্যাভাব পূরণের জন্য ভুলের রম্য পসরা সাজাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তথ্য সমাবেশই যথেষ্ট মর্মস্পর্শী হ'ত।

তবু এঁরা ভাবাবেগে কিছু শোনা কথা, কিছু কল্পনা মিলিয়ে বিপ্লবেতিহাসের

একটা ঠাট তৈরির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি যেসব বইয়ের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি তাঁরা বাঙলার বিপ্লবেতিহাসে এসব ঘটনার অনুল্লেখের অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন। অথবা অধিকাংশ লেখক ইতিহাস লিখতে চান নি, চেয়েছেন টেনেবুনে নিজের কথাটা, আর একটু উদারতর হয়ে দলের কথাটা বলতে। যাঁরা দলের কথা বলতে চেয়েছেন তাঁরা অবশ্যই ইতিহাসের কিছু উপকরণ দিয়েছেন কিন্তু যাঁরা স্মৃতিচারণায় নিজেকেই শুধু জাহির করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর দল বা দলীয় লোকের কুৎসা গাইতে চেয়েছেন তাঁরা নিজেকে হাস্যাস্পদ ও স্বকৃত গ্রন্থ অশ্রদ্ধেয় করে ফেলেছেন।

(১৬)

সুতরাং, এই বিপরীত পরিবেশে সত্যোদ্ধারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি থেকে শুরু করে মামলার বিবরণ অনুসরণ করা; প্রসঙ্গত প্রফুল্ল চাকীর আত্মহনন। আমি অকপটে স্বীকার করব আমার যাবতীয় তথ্যের অধিকাংশ অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। তার আগে, এতাবৎ যে ধারা অনুসরণ করে এসেছি অর্থাৎ তথাকথিত বিপ্লবেতিহাসের বিভিন্ন বইয়ে কি লিখেছে তা উল্লেখ করব। সত্যাসত্য মামলার বিবরণে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"শহীদ-যুগল" গ্রন্থে নগেন্দ্রকুমার গুহরায় "গ্রন্থকারের নিবেদন"-এ তাঁর তথ্য সংগ্রহের সহায়করূপে অন্যান্যের মধ্যে "সঞ্জীবনী" পত্রিকার (১৩১৫, ২৪ বৈশাখ ১৯০৮, ৭ মে) নামোল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "গাড়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠীতে পঁহুছিবামাত্র ম্যাজিস্ট্রেট [H. C. Woodman] ক্ষুদিরামের উক্তি শুনিবার জন্য আগমন করিলেন। ক্ষুদিরাম বলিল—আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু—বাড়ী মেদিনীপুর। **এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত** পড়িয়াছিলাম। আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় উৎপীড়ক আর ভারতবর্ষে কেহ নাই। তাঁহাকে বধ না করিয়া দুইজন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে যে আমি হত্যা করিয়াছি, এজন্য আমার মর্মান্তিক যাতনা হইয়াছে। আমি **মেদিনীপুর হইতে** এখানে আসিয়াছি। **হাওড়ায় আমার সহচর দীনেশের সঙ্গে দেখা হয়।** দীনেশের সঙ্গে একটি বোমা ছিল। **দীনেশ বোমা তৈয়ার করিতে পারিত।** আমার সঙ্গে ২ টা রিভলভার ও কতগুলি গুলি ছিল। উহা আমি কলিকাতায় কিনিয়াছিলাম। আমরা **৭।৮ দিন পূর্বে** মজঃফরপুর

পঁহুছিয়া ধর্মশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ধর্মশালার নিকট কিশোরীবাবুর অফিস ছিল। আমাদিগকে কেহ যখন জিজ্ঞাসা করিত যে, আমরা কোথায় থাকি, আমরা বলিতাম কিশোরীবাবুর বাসায় থাকি।

"আমরা সর্বদা মিঃ কিংসফোর্ডের খবর লইতাম। আমরা দেখিলাম মিঃ কিংসফোর্ড কুঠী হইতে কয়েক গজ দূরবর্তী ক্লব ব্যতীত আর কোথাও যান না। একদিন কাছারীতে গিয়া দেখিলাম তিনি সেসনের বিচার করিতেছেন। একবার মনে হইল, তখনই বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণে যখন মনে হইল, অনেক নির্দোষের মৃত্যু হইবে তখন ক্ষান্ত হইলাম। ৩০ শে এপ্রিল মিঃ **কিংসফোর্ডের গাড়ী** যখন ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখানা গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমাদের উভয়ের পা খালি ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ বাঁকীপুরের দিকে পলাইল, আর আমি সমস্তিপুরের দিকে দৌড়িয়া গেলাম। ওয়াইনি ষ্টেশনে এক মুদির দোকানে যখন আমি **জল** খাইতেছিলাম, তখন **দুইজন কনেষ্টবল** আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে। **কলিকাতায় এক গুপ্ত সমিতি আছে, সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি মিঃ কিংসফোর্ডকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছিলাম।** যদি ধরা পড়ি, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা অভিপ্রায়ে **পিস্তল** সঙ্গে রাখিয়াছিলাম।" (পৃঃ ১০৭)

গুহরায় মশাই লিখেছেন: "ক্ষুদিরামের পূর্বোক্ত বর্ণনা (statement) তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ সি উডম্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

"কমিটিং [দায়রাসোপর্দকারী] ম্যাজিস্ট্রেটের [E B. Berthoud] আদালতে ২৩শে পুনরায় ক্ষুদিরামের জবানবন্দী লওয়া হয়। ক্ষুদিরাম পয়লা মে তারিখ জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ঘটনা সম্পর্কে যে স্বীকারোক্তিমূলক বর্ণনা (confessional statement) দিয়াছিলেন, তাহা মূলতঃ প্রত্যাহার করিলেন না। তবে তাঁহার প্রদত্ত জবানবন্দীর কোনো কোনো অংশ সংশোধন করিলেন এবং স্থল বিশেষে উক্তি অসত্য বলিয়া তৎপরিবর্তে আবার নূতন উক্তি যোজনা করিলেন। (পৃঃ ১১০)

নগেন্দ্রবাবুর মন্তব্য: "জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের [উডম্যানের] নিকট ক্ষুদিরাম প্রথম যখন বর্ণনা দিলেন, তখন তাঁহার সতীর্থ প্রফুল্ল চাকীকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে

নিজের উপর ঘটনার দায়িত্ব যে বেশী করিয়া চাপাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ২।৩ দিন পরেই প্রফুল্লর মৃত্যুর কথা ক্ষুদিরাম জানিতে পারিলেন। সুতরাং ২৩শে মে নিম্ন আদালতে কমিটিং ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে দ্বিতীয়বার বর্ণনা দিবাব কালে সতীর্থকে বাঁচাইবার কোনো সমস্যা তাঁহার সম্মুখে ছিল না। তখন অবস্থা বিবেচনায় ক্ষুদিরাম ঘটনার দায়িত্ব কম-বেশী করিয়া চাপাইলেন প্রফুল্ল চাকীর উপর। এমন কি প্রফুল্লই তাঁহাকে কিংসফোর্ড বধের জন্য প্ররোচনা দিয়া কলিকাতা হইতে মজঃফরপুর পর্যন্ত আনিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তিও করিলেন। দ্বিতীয়বাবেব বর্ণনাতে ইহাও বলিলেন যে, সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও নেতাদের বক্তৃতা শুনিয়া কিংসফোর্ডকে হত্যা করার প্ররোচনা পাওয়ার কথা সত্য নহে। দীনেশ অর্থাৎ প্রফুল্লর উপদেশ মতেই ক্ষুদিরাম ঐরূপ অসত্য উক্তি করিয়াছে। বস্তুতপক্ষে দীনেশই বোমা নিক্ষেপ করার জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। হাওড়া স্টেশনে দীনেশের সঙ্গে ক্ষুদিরামের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হইবার কথা সত্য নহে বলিয়া ক্ষুদিরাম কমিটিং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রকাশ করেন। কলিকাতা ছাড়িবার ৫।৬ দিন পূর্বে যুগান্তর কার্য্যালয়ে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বলিয়া ক্ষুদিরাম তাঁহার দ্বিতীয়বারের বিবৃতিতে বলেন।" (১১০-১১ পৃঃ)

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় কোন এক সময় নোয়াখালী নিম্ন আদালতে মোক্তার ছিলেন। সুতরাং তিনি লিখেছেন, "দ্বিতীয় বর্ণনা [যাকে তিনি বর্ণনা বলেছেন, তা আসলে স্বীকারোক্তি] প্রদানকালে স্বপক্ষেব উকিলদের পবামর্শ দ্বাবা ক্ষুদিরাম প্রভাবিত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান কবা অযৌক্তিক হইবে না।" নিঃসন্দেহে এটি নগেন্দ্রবাবুর অনুমান, তথ্যসন্ধানীর কাজ নয়। নগেন্দ্রবাবু এত খোঁজ নিয়েছেন কিন্তু এখবব পান নি যে, দায়রা বিচাবের আগে কোন স্তরেই ক্ষুদিরাম আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন আইনজীবীরই সাহায্য পান নি ? "দ্বিতীয় বর্ণনা কালে" উকিলদের পবামর্শ দ্বারা প্রভাবিত হলে সবকিছুই বদলে যেতে পারত। পক্ষান্তরে, অমৃতবাজার পত্রিকায় আছে, দায়রাবিচারের পূর্বে Khudiram went undefended throughout. উকিলের পরামর্শ নিলে তো মামলার গতিই আর এক রকম হত। নগেনবাবু নিজেই মন্তব্য করেছেন যে, "কোনো

বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সদস্যের পক্ষে এরূপ অবস্থায় প্রকৃত কথা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া বলা স্বাভাবিক নহে, ববং অধিকাংশ স্থলেই সত্য গোপন রাখিয়া একেবারে বানানো কথাব আশ্রয় লইতে হয়।" (পৃঃ ১১২)

ভাল কথা। কিন্তু অনুমান-নির্ভর লেখা কি হয়ে দাঁড়াতে পাবে তার দৃষ্টান্ত দি। "ক্ষুদিরামেব ন্যায বীর-বালকের মনে এই চিন্তা স্থান পাওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, সে নিজে তো শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া পডিল, তাহার মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত, সুতরাং সেই অবস্থায় তাহার সতীর্থ **প্রফুল্লকে** যেভাবে বক্ষা করা যায়, সে চেষ্টা করাই কর্তব্য। বিশেষতঃ প্রফুল্লর ন্যায নির্ভীক দেশভক্ত বীর যুবক বাঁচিয়া থাকিলে মাতৃভূমির বন্ধন মোচনের পথ অনেকাংশে নিষ্কণ্টক হইতে পাবে। প্রফুল্লকে রক্ষা করিবার জন্যই **ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর প্রকৃত নাম গোপন করিয়া তাঁহাকে দীনেশচন্দ্র রায় বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিলেন।** এমন কি, এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইবাব চেষ্টা করিলেন যে, **প্রফুল্লর সঙ্গে তাঁহার পূর্বে পরিচয় তো দূরে কথা কোনোদিন দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় নাই**···ইত্যাদি-

নগেনবাবু মতিলাল রায়েব মতো এই ভয়ানক অভিযোগ করেন নি যে, পুলিসেব পৈশাচিক মারেব চোটে স্বীকারোক্তি কবেছেন। তবু অপবাধ স্বীকার, বোমা ফেলা ও সঙ্গী প্রফুল্লকে প্রথম দফায়ই-জডিয়ে ফেলেছেন। এমন নয়, মাব হজম কবেও কিছু বলেন নি। বিনা মাবেই (হয়তো অনুশোচনায হয়তো হতাশায়) যা বলেছেন তাতে বীরত্বের পরিচয় নেই। তবু এও গ্রাহ্য। কিন্তু বীর বালক সতীর্থ প্রফুল্লকে "বক্ষা কবিবার" জন্যই প্রফুল্লব প্রকৃত নাম গোপন কবলেন নগেনবাবুব এই অনুমানেব কি ভিত্তি ? আগেই বারীন্দ্রকে উল্লেখ করে দেখিয়েছি, ক্ষুদিবাম প্রফুল্লব প্রকৃত নাম জানতেন না। জানতে দেওয়া হয় নি। বারীন্দ্র ছাড়া অতিরিক্ত প্রমাণ ? নগেনবাবুবই "শহীদ-যুগলেব" জীবদ্দশায় ভূমিকা-লেখক বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, "ক্ষুদিবাম সত্য কথাই বলেছিল। সে প্রফুল্ল সম্বন্ধে কিছুই জানত না। · প্রফুল্ল ও ক্ষুদিবাম পূর্বে কেও কা'কে চেনে নাই। ক্ষুদিবামকে মেদিনীপুব হতে আনিয়ে প্রফুল্লকে দেখিয়ে ব'লে দেওয়া হয় এব নাম দীনেশচন্দ্র বায়, বাঁকুডাব একজন কর্মী। আর ক্ষুদিরামকে হবেন সরকার ব'লে প্রফুল্লকে জানিয়ে দেওয়া হয়।"

ক্ষুদিবাম যে দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি করেছেন সে তো প্রফুল্ল চাকীর আত্ম-হননের, প্রফুল্লব নিষ্প্রাণ দেহ দর্শনের অনেকদিন পর। ১ যে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন,

২ মে প্রফুল্ল আত্মহনন করেন, তারপর সনাক্তকরণের জন্য সেই দেহ ক্ষুদিরামকে দেখান হয়। ক্ষুদিরাম বলেন, এ হচ্ছে দীনেশচন্দ্রে রায়ের দেহ। প্রফুল্লর প্রকৃত নাম জেনে দীনেশচন্দ্র বলে মিথ্যা পরিচয়ে আর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে কি করে? কিন্তু এই ইতিহাসই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপহার দেওয়া হয়েছে।

ভূপেন্দ্রকিশোব রক্ষিত রায় তাঁর "ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব"-এ ১ মে (১৯০৮) ধরা পড়ার দিনই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষুদিরাম যে প্রথম স্বীকারোক্তি করেন তার আভাষমাত্রও দেন নি। "শৃঙ্খলিত ক্ষুদিরাম" একেবারে বিচার শুরু হলে ২১ মে নাকি জেলা কর্তার কাছে বললেন: কিংসফোর্ডকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কারণ, এই ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতের অত্যাচারী শাসকদের অন্যতম। **কিংসফোর্ডের গাড়ি** এবং সেই গাড়িতে তিনি আছেন মনে করেই আমি বোমা ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিংসফোর্ডেব পরিবর্তে গাড়িতে ছিলেন দুটি নিরপবাধা মহিলা। তাঁদেব মৃত্যু ঘটেছে শুনে আমি দুঃখিত।" (Roll of Honour, p. 106) অর্থাৎ, রোল অব অনারে যেটুকু পেয়েছেন সেটুকুই। "জিলা কর্তা" কে বলেন নি। আসলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রথম স্বীকাবোক্তি ধরা-পড়ার দিনই, দায়রা সোপর্দকাবী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্থুডের কাছে দ্বিতীয় (বা কিঞ্চিৎ সংশোধিত) স্বীকারোক্তি ২২ দিন পরে। আর গাড়িটা আদৌ কিংসফোর্ডেব নয়, গাড়িটা তাঁদেবই যাঁবা মারা গেছেন। মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা। বক্ষিত রায় মশাই উচ্ছ্বাসে এত ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখেছেন যে, এ ব্যাপারে আব একটু খবব নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। (পৃঃ ৫৫)

অবশ্য Roll of Honour এব লেখক শ্রীকালীচরণ ঘোষ তাঁর বাংলা সংস্কবণ (দ্বিতীয় খণ্ড)-এও এর চাইতে বেশি সংবাদ দেন নি। স্বীকাবোক্তির কিছুই নেই, সোজাসুজি মামলাব তারিখ "মে ২৫, ১৯০৮" (পৃঃ ২৯৮)

"ধৃত ক্ষুদিরাম নিজের কাজ অবলীলাক্রমে স্বীকার করে।" লিখেছেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁব "বিপ্লবীযুগের কথায়," ৩৬ পৃষ্ঠায়। আরও লিখেছেন, কিংসফোর্ডের পরিবর্তে দুইজন মহিলা খুন হইয়াছে শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুদিরাম নির্ভীকভাবে অপবাধ স্বীকাব করিল এবং প্রাথমিক তদন্তে (মানে, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে) **অথবা সেসন আদালতে** সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিল না।" কথাটা আংশিক সত্য, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ঠিক আছে, সেসনসে তাঁর পক্ষ সমর্থনে আইনজীবী ছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, আমি যত বই পড়েছি ও যত বইয়ের নোট নিয়েছি তার অধিকাংশই ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে নীরব, এর কারণ আমার বোধগম্য নয়। গুপ্ত ধর্ম-কর্মে-স্বীকারোক্তি প্রশংসনীয় অবশ্যই নয় কিন্তু সত্য কি কখনও লুকানো যায়, না, তাতে কারও মাহাত্ম্য বাড়ে? দোষে-গুণে মানুষ, যেখানে নির্ভয়ে মরবার গুণ আছে সেখানে যা দোষ বলে মনে হয় তা তুচ্ছ। স্বীকারোক্তি যদি দোষের হয় তবে মৃত্যুতেই তা খারিজ হয়ে যায়। আর স্বীকারোক্তি যদি নিজের মুক্তির আশায় ও পরের অনিষ্ট করার মতলবে হয় তবে নিশ্চয়ই তা নিন্দনীয়। ক্ষুদিরাম তো তা করেন নি। পরবর্তীকালেও আমরা দেখব, বারীন্দ্র-প্রমুখের স্বীকারোক্তি সম্পর্কেও এমনি একটা লুকোচুরি খেলা চলেছে। চাপা তো কিছু থাকেনি এবং মুক্তির পর তাঁরা তো সগৌরবেই জীবন যাপন করে গেছেন। সুতরাং, ইতিহাস লিখতে বসে সব কথা প্রকাশ করাই সততা। সততা তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের মেরুদণ্ড।

দায়িত্বহীন লেখক সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "অগ্নিযুগের অগ্নিকথা"য় লিখেছেন: প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়বার পর তাঁদের মুখ থেকে ইংরেজ সরকার 'যুগান্তর' সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পেরেছিল।"—পৃঃ ১৬১

প্রফুল্ল ধরাই বা পড়লেন কবে, আর, তাঁর "মুখ থেকে ইংরেজ সরকার যুগান্তর" বা কোন কিছু জানতেই বা পারলেন কি করে? ধরা পড়ার আগে কোন কোন বই বা সংবাদমতে তিনি দেশদ্রোহী নন্দলালকে বলেছিলেন, আপনি বাঙালি হয়ে বাঙালিকে ধরিয়ে দিচ্ছেন? ধরা দেবেন না ও কিছু বলবেন না বলেই তো নিজের হাতের ব্রাউনিং পিস্তল নিজের দেহে প্রয়োগ করে চিরতরে নির্বাক হয়ে গেছেন। আর ক্ষুদিরাম ধরাও দিয়েছেন এবং কথাও বলেছেন, কিন্তু পুলিসের সব জেনে ফেলবার সূত্র কতটুকু ছিল? ক্ষুদিরাম বিপ্লবী ঘাঁটিগুলি সম্বন্ধে জানতেনই বা কতটুকু? প্রফুল্লকেও ভাল চিনতেন না, দীনেশচন্দ্রই প্রফুল্ল কিনা তাও জানতেন না। ক্ষুদিরাম যে স্বীকারোক্তি করেছেন তার প্রত্যায়িত ইংরেজী বয়ান দিয়েছেন একমাত্র ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র তাঁর "Boy Revolutionary of India"-য়। অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে আমার আহৃত স্বীকারোক্তি তুটি পরে দেব।

"The examination of Khudiram Bose, aged 19 years, taken before me, H. C. Woodman, District Magistrate on the 1st day of May 1908, in the Bengali language.

"My name is Khudiram Bose. My father's name is Trailakya Nath Bose, deceased. I am by caste Kayastha, and by occupation student. My home is at Midnapore, mouza Megbile, District Midnapore. I reside at Midnapore.

"I came to Muzaffarpore *five or six days ago* [জজের রায় দ্রষ্টব্য] *from Calcutta* to kill Kingsford. I went to the Dhurmsala by the station. Another man came with me, Dinesh Charan Roy, who told me that he belonged to Bankipore. I met him at Howrah Station, and had never seen him before. We came together, as he came for the same purpose. I came of my own initiative, *having read in various papers things which incited me* to come to this determination. These papers were *the Sandhya, Hitabadi, Yugantar and many others.* They wrote of the great zulum done to India by the English Government. Kingsford's name was not specially mentioned, but I determined to kill him because he had put several men in jail. We spoke of them in conversation. I did not ask him if anybody had incited him to do this. We met by chance *in the train*, and I got into conversation with him. In the course of *conversation he told me his purpose* and *I told him mine.* There were other passengers in the carriage, but I did not speak to them.

"When *we* reached the Dhurmsala at Muzaffarpore we *sat there for four or five days* consulting about an opportunity to kill him. *Two or three days* we went out and looked at his house. We used to see him when he went out in the morning, but I went once to his cutchery and saw him there.

"My intention was to shoot him with a revolver, I had two revolvers. These are they (shows and identifies Ex. 1 and 2). Dinesh had with him a revolver and a bomb. He

had brought it with him ready and did not make it at the Dhuramsala, He did something sitting in the Dhuramsala, I was out, but when I came back I saw him that he had opened the bomb and was putting it right. Dinesh told me he knew how to make these bombs, but he did not tell me where he had brought it from. This bomb was of tin, It was round and about so big (shows with his hands a size about 3 or 4 inches in diameter).

"The bomb was ready two days after we arrived. We kept it with our clothes and other articles in a Gladstone bag in the Dhuramsala. Two or three days I took the bomb out with me in a tin box. Dinesh and I went out two or three evenings and walked in the maidan in front of the Judge's house. We saw him two or three times, but it was not convenient. We saw him in his carriage, but could not make out whether the coast was clear.

"Last night I got an opportunity and threw the bomb. Dinesh and I were together under the tree on the maidan. I saw the carriage going from the club. I thought I recognised Kingsford's carriage, and so I threw the bomb. I now know that I made a mistake , the constables arrested me. I threw one bomb only. I ran to the carriage on the road and threw it in. I thought the Judge was in it but I could not see clearly how many persons were in it. It was rather dark. At that time I was wearing this striped coat (identifies Ex. 3). Dinesh was at first wearing a white silk kurta (identifies Ex. 4). Under the tree he took it off and gave it to me, as it was not convenient. He then wore a vest and a chadar. We had shoes but we put them under the tree before throwing the bomb. I went rushing ahead to throw it, and I did not

see how Dinesh followed. Dinesh had a revolver with him. I did not see if it was in his hand. I cannot say if he fired. I was not injured in any way by the bomb. I cannot say if Dinesh was. *We ran away together for a short time as far as the Dhuramsala and then we separated.* I went by the side of the line and then by the Samastipur road. Dinesh ran straight when I branched off by the Dhuramsala.

"As we came near the Dhuramsala, running away, a constable called out to us. We took no notice of him, but ran on in silence. That evening at about 7-30, while we were waiting near the Judge's house, two men spoke to us and asked us where we lived. I said we lived with Kishori Babu. We knew his name because he was the manager of the Dhuramsala. We had not met him The man then said, 'The sahibs pass by this road, move on'. I said 'I am wating for a boy and then I will go.' Then we went away towards the east. We went away only a short way and then turned round and came back by Judge's cutchary and the tank to the place under the trees, where we stayed till the carriage came. When I spoke to these men I was carrying the bomb in my left hand. My hand was hanging down by my side. It was in a tin box. This tin box we threw away before we went to the tree.

"Although the bomb was Dinesh's, *I* threw it because I had the greater zeal (*beshi-iccha*) for the work.

"When we fled I left a dhoti in the Dhuramsala. I can't say if Dinesh left anything.

"Dinesh is about my age. He has a round face and is better built than I. He is about my height. His eyebrows are separate, his hair is curly like mine and black. He told me he had a brother serving in the railway at Bankipore.

"Besides reading papers I heard the lectures of Bepin Pal, Surendra Nath Banerji. Gishpati Kabyatirtha and others. These lectures were deliverd at the Beadon Square and the College Square, and they inspired me to do this. There was also a Sannyasin who lectured at the Beadon Square and who was very strong.

"In Calcutta I lived with my maternal uncle Satish Chandra Dutta. He is a distant relation of mine. He lives in Corporation Street, No. 4 or 5 and is a school master. The school is in Corporation Street

"These cartridges (23 small, 14 big) are mine (Ex. 5). I bought them in a bazar in Cornwallish Street and Bow Bazar. I have no license. A boy named Amulya Ratan Das got the revolver for me. I paid Rs. 25 for one and Rs. 15 for the other. This was about two months ago.

"This watch is mine (Ex. 6), also these portions of railway timetables (Ex. 7), also this candle and matches (Ex. 8), this purse is also mine (Ex. 9), it contains three 10-rupee notes, a rupee, a two anna piece, and other small coins (total amount Rs. 31-7-3).

"The tin box (Ex. 10) is mine. The bomb was in it. wrapped in this piece of cloth which is inside it. This pair of shoes (Ex. 11) is mine and this other pair (Ex. 12) belongs to Dinesh. This chadar (Ex. 13) belongs to Dinesh. He used sometimes to wrap it round his head. The portion from out of it was used for wrapping the bomb in the tin box. It was torn two or three times.

"I left *Midnapur college* about a year ago.

"Q—Have you made the whole statement ?

"A—All that I have said is true, and I have said it wholly of my own wish.

"I believe that the whole of this statement was *vlountanly* made. It is a full and complete reproduction of the statement made by the accused.

(Sd) Sri Khudiram Basu (in Bengali). 2-5-08.

(Sd). H C. Woodman, District Magistrate. 1.5 08.

"Read over and admitted correct in my presence.

Sd H. C. Woodman. 1.5 08.

Signed in my presence. Sd. (illegible) Assistant Magistrate. 2.5.08."

এই প্রথম স্বীকারোক্তিতে কি কি পাওয়া যাচ্ছে? (১) স্বীকারোক্তির তারিখ ১ মে ১৯০৮, ঘটনার পরদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং সর্বাংশই স্বেচ্ছায় ও বাংলায় শ্রীক্ষুদিরাম বসু স্বাক্ষরিত। (২) ক্ষুদিরাম বছর খানেক আগে মেদিনীপুর কলেজ ছেড়েছেন। (অন্যত্র আমরা দেখব, ক্ষুদিরাম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকতে পড়া ছেড়ে দেন)। (৩) Ex মানে Exhibit, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপিত আলামত বা নিদর্শন, যেসব জিনিস ক্ষুদিরামের হেফাজতে অথবা তাঁর স্বীকৃত বলে পাওয়া গিয়েছে—যেমন, দীনেশের চাদর, ন্যাকড়া, তিনটি দশ টাকার নোট, একটা টাকা (মুদ্রা), একটি দু' আনি ও খুচরো মিলিয়ে ৩১ টাকা সাত আনা তিন পাই। (৪) কোন্‌টা দীনেশের কোন্‌টা তাঁর তা সনাক্ত করেন। জুতো দু' জোড়া কোন্‌টা কার তাও। (৫) ঘড়িটা ক্ষুদিরামের। (৬) ২৩টা ছোট ও ১৪টি বড় কার্তুজ তাঁর। বিনা লাইসেন্সেই কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ও বৌবাজারের দুটি বাজার থেকে কিনেছেন। (৭) মোমবাতি, দেশলাই, রেলওয়ে টাইমটেবল। (৮) অমূল্যরতন দাসের কাছ থেকে দু' মাস আগে ২৫ টাকা ও ১৫ টাকায় রিভলভার দুটি কিনেছেন। (রিভলভার ও কার্তুজ কেনার কথা যে বানানো তা বারীন্দ্রের বিবরণীতেই প্রকাশ। পুলিস অমূল্যরতন দাসেরও কোন হদিস পেয়েছে বলে জানা যায় নি)। (৯) কলকাতায় ৪।৫ নং কর্পোরেশন স্ট্রীটে সতীশ চন্দ্র দত্ত নামে এক দূর সম্পর্কের মামাবাড়িতে থাকতেন। তিনি কর্পোরেশন স্ট্রীটেরই এক স্কুল মাষ্টার। (এঁরও কোন খোঁজ পুলিস পেয়েছিল কিনা জানা যায়নি)।

(১০) বীডন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়াবে যাঁদেব বক্তৃতায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁবা হচ্ছেন বিপিন পাল, সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও অন্যান্য। (১১) দীনেশের বয়স, গড়ন, আকৃতি, উচ্চতা, ভ্রূ, কেশ ইত্যাদির বিশদ বিবরণ দেন। (১২) দীনেশ যে তাঁব সঙ্গী, এখবব তিনিই দেন। পুলিস জানত না। অস্বীকার করলে পুলিসেব পক্ষে জানা শক্ত ছিল। (১৩) ফেলে আসা ধুতির কথাও বললেন, বললেন, বোমাটা দীনেশেব, তাঁব বেশি ইচ্ছা থাকায় তিনি ছুঁডেছেন। (১৪) স্থিতিকালে তাঁদের গতিবিধি ও কনষ্টেবলদের সঙ্গে বাক্যালাপেব উল্লেখ কবেন। (১৫) কখন গাড়ি দেখেছেন, কখন বোমা ফেলেছেন, তাঁব গায়ে ও দীনেশেব গায়ে কি বকম জামা ছিল, সুতী না সিল্ক, গেঞ্জি, চাদব বর্ণনায় কিছু বাদ পড়োন। (১৬) একসঙ্গে দৌড়েছেন ধর্মশালা অবধি, তারপর দুই পথে। (১৭) দীনেশ বলেছেন তিনি বোমা তৈবি জানেন, একদিন খুলেও দেখছিলেন, এমন সময় ক্ষুদিবাম এসে পড়েন, কি আকাবেব বোমা তাও বলেছেন। (১৮) দীনেশচন্দ্রকে দীনেশচবণ বলে জানিয়েছেন, সন্ধ্যা, হিতবাদী, যুগান্তব পড়ে তিনি প্রবোচিত হয়েছেন। (১৯) নিজেব আসল নাম, ইত্যাদি সব বলেছেন। (২০) কিশোরীবাবুব কথা বলেছেন।

এই বলাই শেষ বলা নয়। এ হ'ল ১ মেব কথা, দ্বিতীয় বলা ২৩ মে, দায়বা সোপর্দকাবী ম্যাজিস্ট্রেট ই ডবলিউ বার্থুডেব কাছে, মামলা তৈবি।

ক্ষুদিবাম ধবা পড়াব ও প্রাথমিক স্বীকাবোক্তিব পব বিচাবেব দিন ধার্য হল ২১ মে। সীতামাবিব মহকুমা হাকিম মিঃ বার্থুডেব সামনে হবে, তিনি মজঃফবপুব আসছেন। বাঁকীপুবেব ব্যাবিষ্টাব মান্নুক দাঁড়াবেন সবকাব পক্ষে।

ক্ষুদিবাম কড়া পাহারায় জেলে আছেন। তাঁব গ্রেপ্তাবেব পব ২৪ ঘণ্টাব নোটিসে বাঙালি জেলাবকে বদলি করা হয়েছে, গয়া থেকে নতুন জেলাব আসছে। ক্ষুদিবামকে যে খাবার দেওয়া হয় তা পুঙ্খানুপুঙ্খ পবীক্ষা কবে দেওয়া হয়। পাচককে তা আগে খেতে দেওয়া হয়। এক পদস্থ পুলিসকে নাকি বলতে শোনা গেছে যে, কলকাতাব এক লক্ষপতি বলেছেন, ক্ষুদিবামকে কেউ গুলি করে মাবলে তাকে লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। সম্ভবত এই কাবণেই গত শুনানির দিনে তাঁকে আদালতে আনা হয় নি। (অমৃতবাজাব পত্রিকা, মে ১৫, ১৯০৮)

(১৭)

কিন্তু এই মজঃফরপুর অভিযানের মূল নায়ক প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায়ের সংবাদ কি ? ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার ও স্বীকারোক্তি করবার সময় তিনি কোথায় ? প্রথমে যেসব বই তার উল্লেখ করেছে আগে সেই সব বইগুলোর খবর নি।

ঈশান মহাপাত্রের "Boy Revolutionary of India" একান্তভাবে ক্ষুদিরামেরই কাহিনী, তাতে প্রফুল্লর কোন খবর নেই। মতিলাল রায়ের "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী"-তে যেটুকু আছে তা দিয়েছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে কিছু নেই। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 'বিপ্লবের পদচিহ্নে', পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের 'বিপ্লবের পথে' নেই, পক্ষান্তরে, পূর্ণানন্দ প্রফুল্লর নাম বাদ দিয়ে লিখেছেন : "জাতির প্রস্তুতি ঘোষণা করলেন ক্ষুদিরাম ও কানাইলাল নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে।" প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ার "বিপ্লবী জীবন"-এ নেই। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "বিপ্লবের যুগের কথা"য় এ বিষয়ে কিছু নেই। সুবোধকুমার লাহিড়ীর 'বিপ্লবের পথে' এসবের কাছে-ধারেও নেই। শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্তের 'বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার' এ বিষয়ে নীরব। কিছু নেই বিপ্লবী 'অতীন্দ্রনাথ বসু স্মরণে'। মতিলাল রায়ের 'বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল'-এ, রাজেন্দ্রলাল আচার্যের 'বিপ্লবী বাঙ্গলা বা স্বাধীনতার ইতিহাসে' নেই, বরং এক উদ্ভট কথা আছে (পৃঃ ২৪২), "যে বাঙ্গালী দারোগা কিশোর সিংহশাবক খুদিরামকে গ্রেপ্তার করেন ১৯০৯ সালে বিপ্লবীদের রিভলভারের গুলিতে কলকাতায় তাকে জীবন দিতে হয়।" একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। ক্ষুদিরামকে কোন দারোগা গ্রেপ্তার করেনি, করেছে দুটি কনস্টেবল। প্রফুল্ল চাকীকে যে দারোগা (সাব ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি) মোকামাঘাট স্টেশনে গ্রেপ্তারে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু প্রফুল্ল তা আত্মহননে ব্যর্থ করে দেয় তাকে পরে কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে হত্যা করা হয়েছিল। তবে এই ইতিহাসকার যা মনে এসেছে তাই লিখেছেন : ১৯০৮ সালে **৩রা মে** মজঃফরপুরে রাজদ্রোহের প্রকাশ দেখামাত্র দুর্বলচিত্ত বিপ্লবীর সহায়তায় মাণিকতলায় বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করে ফেল্লে। সেদিন ছিল **১৯০৮ সালের ২রা জুন**।" বিপ্লবেতিহাসের পোড়াকপাল। ফকিরচন্দ্র রায়ের "স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় কিছু নেই।

কালীপদ বাগচীর 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী'-তে অবশ্যই আছে। কিন্তু বাগচী

মশাই যে খুব নির্ভরযোগ্য নন তার কিছু দৃষ্টান্ত আগে দিয়েছি। তথাপি যেহেতু এ বই পাঠকমহলে বিরাজমান, সেজন্য এর অনুল্লেখ অকর্তব্য মনে করি। তিনি লিখেছেন: "দীর্ঘ ২২ মাইল অতিক্রম করিয়া সে উপস্থিত হইল সমস্তিপুরে (৫৭)। নন্দলাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রফুল্লর সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। যতদূর জানা যায়, তিনি নিজেকে একজন স্বদেশহিতে উৎসর্গীতপ্রাণ বিপ্লবী বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মজঃফরপুরের ঘটনা বর্ণনা করিলেন—লক্ষ্য করিলেন—ভ্রমক্রমে দুইটি নারীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া বিমর্ষ হইলেন। মোকামাঘাট জংসনে উভয়েই নামিলেন। নন্দলালের জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখিয়া প্রফুল্ল দেখিল পুলিশ আসিতেছে। নন্দলাল যখন ইঙ্গিতে পুলিশদিগকে প্রফুল্লকে চিনাইয়া দিল তখন সমস্ত ব্যাপার তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল (পৃঃ ৫৯)। দুই তিন মিনিট চলিল জীবিতাবস্থায় তার গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা। শক্তিশালী প্রফুল্লর বিক্রমে পুলিশদল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—এই অবসরে সে রিভলভার বাহির করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইটি গুলি করিল পুলিশবাহিনী লক্ষ্য করিয়া, পুলিশদল একটু পশ্চাত হটিলেই সে রিভলভারের অবশিষ্ট দুইটি গুলির সদ্ব্যবহারে ও আদেশ পালনে ব্রতী হইল। একটি গুলি ভেদ করিল কণ্ঠনালী আর একটি ফুসফুস।" (পৃঃ ৬০)

এ বিবরণ যেমনই সংক্ষিপ্ত তেমনই বিভ্রান্তিকর।

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রের এবং নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের বই থেকে ইতিমধ্যে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ সেনের একই কাহিনী উল্লেখ করেছি।

হেমন্ত চাকী তাঁর 'অগ্নিযুগের শহীদ'-এ যা লিখেছেন (পৃঃ ১৩৭-১৪১) তা সংক্ষিপ্তাকারে এই দাঁড়ায়: সমস্তিপুরে এক বাঙালী ভদ্রলোক, ত্রিগুণাচরণ ঘোষ, সকল কিছু অনুমান করে জেনে প্রফুল্লকে আশ্রয়, আহার, নতুন বস্ত্র, জুতো দেন, মোকামা স্টেশনে টিকিট কিনে দেন। একই কামরায় নন্দলাল ও মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী নামে আর এক ব্যক্তি। মজঃফরপুর ঘটনার আলোচনা চলে। প্রফুল্ল যোগ দেন। মৃত্যুঞ্জয় বাবু সাবধান হতে বলেছিলেন প্রফুল্ল বোঝেন নি। পরে কোন এক স্টেশনে কামরা ছেড়ে যান। গাড়ী সোমারিয়া ঘাটে আসে। স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে মোকামেঘাটে আসেন। নন্দলাল পূর্বাচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল। তারপর গ্রেপ্তারের চেষ্টা হলে প্রফুল্ল আত্মহনন করেন। নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের 'শহীদ যুগলে'ও একই গল্প। কে কার থেকে নিয়েছেন তা বলা মুস্কিল, বর্ষক্রমানুসারে 'শহীদ ক্ষুদিরাম' ও 'শহীদ যুগল' সমকালীন (১৯৪৮),

হেমন্ত চাকী ও কালীপদ বাগচীর বই যথাক্রমে ১৯৫২ ও ১৯৬২। সূত্র সম্ভবত "শনিবারের চিঠিতে" উপেনবাবুর লেখা। ওটি ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, হিসেব করলে দাঁড়ায় ১৯৪৭।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের গল্পেও আছে, সেই ভদ্রলোক প্রফুল্লকে ইণ্টারক্লাসে তুলে দিয়ে গেলেন এবং তারপর—

"সেই কামরাতেই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন সাব-ইন্সপেকটার কলিকাতা যাইতেছিল। সে মজঃফরপুরের তৎকালীন সরকারী উকীল স্বর্গগত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। সে বিদায় লইয়া কয়েকদিন দাদামহাশয়ের বাড়ীতে ছিল এবং ছুটি কাটাইয়া কলিকাতা যাইতেছিল। পূর্বদিন বোমা নিক্ষেপের ঘটনার রাত্রিতে সে মজঃফরপুরে ছিল এবং ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়া আসিয়াছিল। গাড়ীতে বোমার ঘটনা সম্পর্কে সহযাত্রীদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। প্রফুল্লও তাহাতে যোগ দেন এবং বিস্তারিত বিবরণ শুনিবার জন্য আগ্রহ দেখান। প্রফুল্লর আচরণ ও কথাবার্তায় নন্দলালের সন্দেহ জন্মে। গাড়ীতে নন্দলালের সঙ্গে তাহার বেশ ভাব হইয়া গেল। মোকামাঘাট স্টেশনে যাইতে হইলে অতি প্রত্যূষে জাহাজে গঙ্গা পার হইতে হয়। তখন কুলি পাওয়া যাইতেছিল না দেখিয়া নন্দলাল উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ কুলির খোঁজে ডাকাডাকি করিতেছিল। প্রফুল্ল তাহাকে ভরসা দিয়া বলিলেন যে, চিন্তিত হইতেছেন কেন, কুলির প্রয়োজন হইবে না। নন্দলালের বাক্স বিছানা প্রফুল্ল নিজেই বহন করিয়া তাহার সঙ্গে জাহাজে উঠিল।

"পরপারে পৌঁছিয়া প্রফুল্ল ও তাঁহার সহযাত্রীরা কলিকাতাগামী ট্রেনের জন্য মোকামাঘাট স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে নন্দলাল প্রফুল্লর অগোচরে সরিয়া পড়িল। পরে সে কয়েকজন কনস্টবল সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিতে আসিল। বীর যুবক ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া নিমেষের মধ্যে বিভলভার বাহির করিয়া বলিল, 'তুমি বাঙালী হয়ে এই কাজ করলে। আচ্ছা, নাও তবে', এই বলিয়া সেই পুরুষ-সিংহ দেশদ্রোহী নন্দলালকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। নন্দলাল মাথা নীচু করিয়া সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেল। উপেন বাবু লিখিয়াছেন :—

'তখন পুলিস ওকে ঘিরিয়া ফেলিলে প্রফুল্ল একবার নিজের কপালে আর একবার বুকে গুলি করিয়া প্ল্যাটফরমে পড়িয়া গেল। বাংলার এই প্রথম বীর পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিল। পুলিস মৃত

প্রফুল্লর ফোটো তুলিয়া লইল। **শুনিয়াছি, ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ছিন্নমুণ্ড মজঃফরপুরে লইয়া আসিয়াছিল**। বিচারকালে প্রফুল্লর সেই অবস্থার ফোটো আমি দেখিয়াছি। কপালের ঊর্ধ্বদিকে একটি ও বাঁ দিকের বুকের উপর দিকে একটি গুলি প্রবেশের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, কি অমিত বীর্য ও মনের বল থাকিলে মানুষ নিজের শরীরে দুইবার গুলি লাগাইতে পারে। কি প্রশস্ত নিটোল ললাট ছিল প্রফুল্লর। আর বক্ষদেশ কি উন্নত ও বিস্তৃত। বাঙ্গালী হইয়া এই প্রথম দেখিলাম বাঙ্গালী-বীরের প্রকৃত মূর্তি।' ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মে (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় দিবস। এই পুণ্য দিনে প্রফুল্ল মুক্তিযজ্ঞে আত্মবলিদান করিয়া প্রথম শহীদের মর্যাদালাভ করিলেন।"—পৃঃ ১৮৫-১৮৭

উপেনবাবু যেখানে লিখেছেন, "শুনিয়াছি ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার **ছিন্নমুণ্ড** মজঃফরপুরে লইয়া আসিয়াছিল" (পৃঃ ১৮৬) সেখানে একই বইয়ে নগেন্দ্রকুমার ১৯০ পৃষ্ঠায় সঞ্জীবনীর উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, "**প্রফুল্লর মৃতদেহ** (ছিন্নমুণ্ড নয়) সনাক্ত করিবার জন্য মজঃফরপুর আনা হইল। বন্ধুর মৃতদেহ দেখিয়া ক্ষুদিরাম শোকাচ্ছন্ন হইল। ইহা তাহার বন্ধু দীনেশচন্দ্র রায়ের মৃতদেহ।"

এইটিই সঠিক সংবাদ। কেননা, ক্ষুদিরাম মৃতদেহটি দীনেশচন্দ্র রায়ের—এর বেশি বলেন নি, এর বেশি জানতেনও না। কিন্তু দীনেশচন্দ্র রায় কে? মজঃফরপুরে কেউ জানতেন না। ধর্মশালার কিশোরীমোহন ব্যানার্জিও নন। মণিঅর্ডারও এই নামে এসেছিল। সুতরাং দীনেশচন্দ্র রায় কে পুলিসকে একথা জানতেই হবে এবং তা জানতে যে অকারণ বর্বরতার পথ নিয়েছিল সেটি একটি পৃথক অধ্যায়। তার আগে প্রফুল্লকে ধরবার চেষ্টার কাহিনীটি অন্যান্য সূত্র থেকে একত্র করি। নগেন্দ্রকুমার 'সঞ্জীবনীর' যে প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন তা এই: (১৯০৮-১৪ ই মে), ক্ষুদিরাম যে যুবকের মৃতদেহ দেখিয়া পুলিশের নিকট দিনেশ চন্দ্র রায় নামে পরিচিত করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম প্রফুল্লচন্দ্র চাকী।"

খেয়াল রাখা দরকার, 'সঞ্জীবনী'র এই প্রতিবেদন যখন লেখা বা প্রকাশ করা হচ্ছে তখন দিন বারো পেরিয়ে গেছে। যথাস্থানে দেখা যাবে, প্রফুল্লর গ্রেপ্তার প্রচেষ্টার সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরোয় দিন সাতেক আগে। সঞ্জীবনী লিখেছেন: "মজঃফরপুর হইতে প্রফুল্ল হাঁটিয়া সমস্তিপুর আসিয়া পৌছে ও

সেখান হইতে একখান নূতন কাপড় ও এক জোড়া নূতন জুতা কিনিয়া বেশ পরিবর্তন করে। সমস্তিপুর হইতে হাওড়ার টিকেট লইয়া রাত্রির গাড়ীতে মোকামা ঘাটের দিকে রওনা হয়।

"সমস্তিপুরে প্রফুল্লর নূতন কাপড, জুতো, ফুলো পা দেখিয়া একজন পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের মনে সন্দেহ জন্মিল। ইহার নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফরপুরের গবর্নমেণ্ট উকীলের নাতি। নন্দলাল রাঁচিতে কার্যস্থলে যাইতেছিলেন। প্রফুল্লের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাড়ীতে তাহার সঙ্গে এক কামরায় উঠিয়া বসিল এবং পুলিসের চতুরতার সহিত প্রফুল্লের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ মতসকল প্রকাশ করিতে লাগিল যাহাতে প্রফুল্ল নন্দলালকে তাহারই মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিল। ইতিমধ্যে নন্দলাল মজঃফরপুরে গবর্নমেণ্ট উকীলকে তারযোগে জিজ্ঞাসা করিল যে, সন্দেহের উপরে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে কিনা। ম্যাজিস্ট্রেটের মত লইয়া মজঃফরপুর হইতে গ্রেপ্তারের হুকুম দেওয়া হইল। নন্দলাল তখন স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইল।

'ফেরিষ্টীমারে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পৌঁছিল। প্রফুল্ল তরুণ বয়স্ক বালক। সে তখনও নন্দলালকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই। নন্দলাল স্বদেশের জন্য তাহারই মত বেদনা বোধ করে—তাহারই মতাবলম্বী দেখিয়া প্রফুল্ল তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ষ্টীমার হইতে ট্রেনে উঠিবার সময় প্রফুল্ল নন্দলালের জিনিষপত্র নিজের কাঁধে করিয়া বহিয়া লইল—নন্দলালকে কুলী নিযুক্ত করিতে দিল না।' এদিকে নন্দলাল বরাবর ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা জানাইল, এবং প্রফুল্ল প্লাটফর্মে আসিবামাত্র **একজন কনষ্টেবলকে হুকুম দিল—গ্রেপ্তার কর।**

"প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইল। তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। সে চীৎকার করিয়া বলিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—**তুমি বাঙ্গালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ?** (এই স্থূলাক্ষরগুলো উদ্ধৃতাংশেরই, আমার নয়)। কনষ্টেবল পশ্চাৎ দিক হইতে প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে কনষ্টবলকে ভূপাতিত করিল। পরমুহূর্ত্তেই পিস্তল বাহির করিয়া প্লাটফর্মের অপর দিকে কয়েক পা হটিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অপর এক দিক হইতে আর একজন কনষ্টবল আসিয়া পড়িল। প্রফুল্ল এই কনষ্টবলের দিকে গুলি চালাইল।

কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। এদিকে ভূপাতিত কনষ্টবল আবার অগ্রসর হইল। প্রফুল্ল দেখিল আর পলাইবার উপায় নাই। তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল নিজের দিকে বাঁকাইয়া ধরিল। পিস্তলের দুইবার আওয়াজ হইল—প্রথম গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয় গুলি চিবুকের নিম্নদেশ বিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই প্রফুল্লের মৃতদেহ ভূপতিত হইল।

"প্রফুল্লের মৃতদেহ সেনাক্ত করিবার জন্য মজঃফরপুরে আনা হইল। বন্ধুর মৃতদেহ দেখিয়া ক্ষুদিরাম শোকাচ্ছন্ন হইল। সে বলিল, ইহা তাহার বন্ধু দিনেশচন্দ্র রায়ের মৃতদেহ।"—শহীদ যুগল, পৃঃ ১৮৮-১৯০।

এখানে কোন এক ভদ্রলোকের জামা-জুতো ও টিকিট কিনে দেবার গল্পটি অনুপস্থিত। আভাস—তিনি নিজেই কিনেছেন। একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায় যে, তাঁর দেহে কোন পয়সা-কড়ি পাওয়া যায়নি। অথচ ভদ্রলোকের গল্পটিও যথেষ্ট প্রমাণাভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবার নতুন জামা জুতোরও তো একটা ব্যাখ্যা দরকার। এক হতে পারে, পয়সাকড়ি পাওয়া গেলেও পুলিস রিপোর্টে তা নেই। সংবাদপত্র সচরাচর পুলিস রিপোর্টের উপর নির্ভরশীল।

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে আছে: "The arrest and suicide of D. C. Roy were most sensational. He got as far as Samastipur Station on the B & N. W. Railway on Friday, and took an inter class ticket from there to Mokamaghat where he alighted.

"There he took another inter class ticket for Howrah. *A plainclothes constable of Muzaffarpur police shadowed him from Samastipur and his behaviour being suspicious arrested him but the deceased wrenched himself off and ran down the platform with the police after him.*

"Finding retreat of no avail he turned round and fired at the constable nearest to him. The bullet missed and constable closed in but deceased having some freedom used the pistol on himself, one shot entered under his chin and one over the left collar bone. He dropped dead bleeding profusely. The weapon was a Browning pistol."

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় এই উদ্ধৃতি দিয়ে পাদটীকায় সঙ্গতভাবেই লিখেছেন : "মজঃফরপুর পুলিসের কোন কনষ্টবল প্রফুল্ল চাকীকে অনুসরণ করে নাই। দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল।" নগেনবাবুও একটু ভুল করেছেন। নন্দলাল দারোগা মজঃফরপুরের নয়, সে সিংভূমের সাব-ইন্সপেক্টর। মজঃফরপুরে ছুটিতে দাদামশাইর কাছে এসেছিল। আবার কাজে ফিরে যাচ্ছিল। সে মজঃফরপুর থেকে অনুসরণ করেনি, করেছে সমস্তিপুর থেকে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। একে পুলিস, তায় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ তাঁর 'First Spark of Revolution'-এর ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "Prafulla reached Samastipur, 32 *miles* from Muzaffarpur and got into a railway compartment with a ticket for Mokama Ghat. The Station Master of Samastipur had a suspicion that Prafulla was involved in some revolutionary act. He helped him with fresh clothes and some money to purchase a ticket. He also advised Prafulla to change his soiled clothes and to have a bath.......

"One Bengali police officer, Nandalal Banerji, was also travelling in the same compartment. Prafulla Chaki was worried about Khudiram and also a bit restless......*Nandalal suspected Prafulla and tried to arrest him*. But Prafulla was quite alert, he put his revolver under his own chin and pulled the trigger after having admonished Nandalal that, being a Bengali, he should be ashamed of betraying a patriot. This happened on the Mokama Station on 2nd May, 1908—the same day that large-scale arrests started in Calcutta.

"The Government agents *chopped off the head of Prafulla to be produced as an exhibit in the Muzaffarpur trial. His decapitated body was brought to calcutta and was interred somewhere on Free School Street.* Thus ended the life of a brilliant young boy—one of the earliest martyrs of this Century." p. 131

লক্ষণীয়, কোন কোন বইয়ে আছে, জনৈক রেলকর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রফুল্লর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ এবং সর্ববিধ সাহায্য করেন, অরুণবাবু নির্দিষ্ট করে ষ্টেশন মাষ্টারের নাম বলেন। তাঁদের কেউ প্রফুল্লব নতুন পোষাক পরিচ্ছদ ও টিকিট দেন। কেউ কেউ এমন আভাষ দেন যেন, প্রফুল্ল নিজেই সব কিনেছেন।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ তাঁব "জাগরণ ও বিস্ফোরণ"-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ২৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"দীনেশ রায় ঘটনাস্থল থেকে (১৯০৮, মে ১-লা) বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেল (বর্তমানে মোকামা-বারৌণী লাইন)-এব সমস্তিপুব পৌছে মোকামাঘাট যাবার টিকিট কেনেন। ইতিমধ্যে তিনি **নতুন পোশাক ও জুতো কিনে পরেছেন।** ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে তাঁকে দেখে সাব-ইনস্পেক্টব নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ হয়। তিনি ছুটি শেষে কাজে যোগ দেবাব জন্য মজঃফরপুর থেকে সিংভূম যাচ্ছিলেন। নন্দ দীনেশের সঙ্গে একই কামরায় ওঠেন ও আলাপ জমাতে চেষ্টা কবেন। **দীনেশের সেটা মোটেই ভাল লাগে না।** সেমুবিয়া-ঘাটে নেমে গঙ্গাজল খেয়ে তিনি ভিন্ন কামবায় ওঠেন এবং মোকামা জংশনে নামেন। শিকাব ফস্কে যায় মনে করে নন্দ ঘুবে-ফিবে মোকামা ঘাটে দীনেশকে খুঁজে বাব কবেন এবং তাঁব বিবক্তি উৎপাদনেব জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবেন। ইতিমধ্যে তিনি মজঃফরপুরে এক টেলিগ্রামে অবস্থাব বিববণ দিয়ে দীনেশকে গ্রেপ্তাব কববার অনুমতি চান। দীনেশ মোকামা ষ্টেশনে নেমে হাওড়া যাবার টিকিট কেনেন। এখানে নন্দব ইচ্ছা পূবণ করে টেলিগ্রাম আসে। তিনি দীনেশকে গ্রেপ্তার কবছেন সানন্দচিত্তে এই কথা বলেন। "বাঙ্গালী হয়ে এই কাজটা করলেন?"—বলেই **দীনেশ সরে পড়তে চেষ্টা করেন।** নন্দব **আর্দ্দালী** পশ্চাদ্ধাবন কবে। **দীনেশ ফিরে গুলি চালান,** কিন্তু কনষ্টেবলেব গাযে লাগে না। প্ল্যাটফর্মেব প্রায় শেষে উল্টো দিক থেকে আর এক পাহাবাওয়ালা এসে পলাযমান দীনেশেব পথবোধ কবে। এখন সামনে ও পিছনে দু'জনে তাঁকে জাপটে ধবে ফেলে। **অসীম শক্তিবলে দীনেশ হাত দুটো মুক্ত করে নেন** এবং দু'বাব তাঁর ব্রাউনিং পিস্তল হতে নিজ দেহে গুলি ছোড়েন। একটি তাঁর চিবুক ও দ্বিতীয়টি তাঁর কণ্ঠার হাড ভেদ করে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে (মে ১-লা)। **দীনেশের মৃত দেহ কলিকাতায় আনা হয়** এবং স্বল্পকালের মধ্যে তাঁকে রংপুরের প্রফুল্ল চাকী বলে সনাক্ত হলে পুলিশ স্বস্তিলাভ করে।"

নানা গ্রন্থে বিচিত্র সংবাদ। আমি স্থূল অক্ষরে ঐসব বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছি। দীনেশের দেহ কলকাতা আনা হয়নি। আনা হয়েছিল তাঁর ছিন্নমুণ্ড স্পিরিটে ডুবিয়ে। ঐ মাথা থেকেই বগুড়ার, রঙপুরের নয়, প্রফুল্লর পরিচয় পাওয়া যায়। আর "হাত দুটো মুক্ত করে" নিয়ে তিনি স্বদেহে গুলি ছোঁড়েন নি, আবদ্ধ অবস্থায়ই তা করেন এবং এই তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব (দারোগা শর্মার জবানবন্দী দ্রষ্টব্য)।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাঁর "অবিস্মরণীয়"তে লিখেছেন: "অশ্রান্ত অজেয় শ্রীপ্রফুল্ল চাকী পালালেন। ক্ষুদিরাম বসু **সহকর্মীকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সঙ্গীর নাম বললে শ্রীদীনেশ চন্দ্র রায়। সমস্তিপুরে কোন বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে কিছুক্ষণ থেকে** প্রফুল্ল চললেন কলকাতার দিকে। ট্রেনে ছিলেন পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছুটি অন্তে কাজে যোগ দেবার জন্যে চলেছিলেন। সন্দেহ হতে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিয়ে মোকামাঘাট ষ্টেশনে প্রফুল্লকে ধরবার চেষ্টা করতেই প্রফুল্ল বললেন, 'বাঙালী হয়ে আপনি আমায় ধরবার চেষ্টা করছেন ?' বলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালেন। মাথা নীচু করে নন্দলাল আর তার দুই সঙ্গী কনেষ্টবল তখনকার মত প্রাণে বাঁচলেন। প্রফুল্লও পরপর দুটি গুলি চালিয়ে দিলেন নিজের দেহে।" পৃঃ ৬১

সহকর্মীকে বাঁচাবার জন্যে ক্ষুদিরাম তাঁর সঙ্গীর নাম দীনেশচন্দ্র রায় বলেন নি, এ ছাড়া আর কোন নামই তিনি জানতেন না। ক্ষুদিরামকে ঐ নামেই প্রফুল্লর পরিচয় দেওয়া হয়, ক্ষুদিরাম প্রফুল্লকে প্রকৃত নামে কখনও চিনতেন না। (অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিবৃতি দ্রষ্টব্য)।

"Prafulla shot himself dead when he was on the point of being arrested by a trap laid by a police officer Nandalal Banerjee", লিখেছেন সরলকুমার চ্যাটার্জি, 'Anushilan Samiti as a Revolutionary Party' : 1905-1913', শিরোনামায় ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "Freedom Struggle and Anushilan Samiti", গ্রন্থে পৃঃ ৪০। হোক সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরলবাবুর অতি সরলোক্তি তথ্যভ্রষ্ট হয়েছে সেইখানে (পৃঃ ৫২) যেখানে তিনি লিখেছেন: "On 9 November sub-inspector *Nandalal Banerjee who had arrested Khudiram Bose* was shot dead in Central Calcutta and the assasin could not be

arrested. সবলবাবুর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, জন্ম ১৯৩৫, যখন বাঙলাদেশে বিপ্লববাদের সমাপ্তি, কিন্তু তিনি কলকাতার কোন এক কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান এবং শীগগিরই 'Radical Nationalist Politics and ideology in Bengal 1903-11" নামে একখানি গবেষণা-গ্রন্থ বেরোবে। ১৯৭৯ সালের কথা—এদ্দিনে হয়তো বেরিয়েও গেছে। দেখার সৌভাগ্য হয় নি। আশা করি, সেখানে এইরকম উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দেওয়া হয়নি। ক্ষুদিরামকে বিহারের ওয়েইনি স্টেশনে ধরেছিল দুজন কনস্টেবল, নন্দলাল ব্যানার্জি নয়, নন্দলাল সিংভূমের সাব-ইন্সপেক্টর। সে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল প্রফুল্ল চাকীকে ধরবার, প্রফুল্ল আত্মহননে তা ব্যর্থ করে দেয়। সরকারি পুরস্কার অবশ্যই পায়। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড পায় বিপ্লবীদের কাছে, প্রধানত 'আত্মোন্নতি সমিতি'র উদ্যোগে, কলকাতার সার্পেন্টাইন লেন হয়েছিল তার বধ্যভূমি। একেবারে পরিচ্ছন্ন ব্যাপার। ক্ষুদিরামকে যারা ধরেছিল তারাও সরকারি পুরস্কার পায়, বিপ্লবীরা তাদের মৃত্যুদণ্ড দেন নি বা দিতে পারেন নি।

সবলবাবু একথাও জানান নি, দীনেশচন্দ্র রায় ওরফে প্রফুল্ল চাকীর আত্মহননের পর তাঁর দেহের গতি কি হল। পরবর্তী ব্যাপারটা আর যাই হোক, সবল নয়।

'বঙ্গভঙ্গ' লেখক সমুদ্রগুপ্ত লিখেছেন: মজঃফরপুর থেকে সমস্তিপুর বত্রিশ মাইল।·

"বেলা দ্বিপ্রহর। ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, ক্ষুধিত প্রফুল্ল হেঁটে চলেছে রেল কর্মচারীদের বাসভবনের সামনে দিয়ে। প্রফুল্লর শুকনো, উষ্কখুস্ক চুল, ময়লা পোষাক দেখে এক-জন রেলকর্মচারীর মনে সন্দেহ হল—এ নিশ্চয়ই বিপ্লবী। তাকে ডেকে নিয়ে এল নিজের বাড়াতে। দিলে স্নানের জল। খাবার ভাত। পরার জন্যে জামা জুতো কাপড়। তারপর কেটে দিলে রাত্রির ট্রেনের একটা ইণ্টার ক্লাসের টিকিট।

"গাড়ির যে কামরায় চলেছে প্রফুল্ল, সেই কামরাতেই চলেছেন নন্দলাল ব্যানার্জি।· সন্দেহ হল নন্দলালের।···

"গাড়ি এসে থামল মোকামাঘাটে। নদী পেরিয়ে আবার রেলগাড়ী।·

নন্দলাল কিছুক্ষণের জন্য চলে গেলেন চোখের আড়ালে।··

"দুজন কনস্টেবল স্টেশন থেকে যোগাড় করে নন্দলাল এলেন প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে। প্রফুল্ল শত্রু-পরিবৃত। তবু পরাভূত নয়। লুকনো জায়গা থেকে টেনে বার করলে **টোটা ভরা রিভলভার**।·· মুখে ভীষণ ধিক্কার। 'তুমি

বাঙালী হয়ে এই কাজ করলে। আচ্ছা, নাও তবে—' গর্জে উঠল বন্দুক, নন্দলালের দিকে। মাথা নীচু করে নন্দলাল প্রাণ বাঁচাল। কনস্টেবলরা তখন তাকে ঘিরে ফেলেছে। প্রফুল্ল অকম্পিত হাতে বন্দুকের মুখটা ঘুরিয়ে নিলে নিজের দিকে। পর পর দুটো গুলির শব্দ। একটা বিঁধল কপালে আর একটা বুকে। প্ল্যাটফর্মের পাথুরে জমির উপরে লুটিয়ে পড়ল আত্মঘাতী প্রফুল্লর বীরদেহ, আত্মবিনাশের অবিনাশী মহিমায়। · প্রফুল্ল জাতীয় আন্দোলনের প্রথম শহীদ।"
—পৃঃ ২৯১-২৯৩

সুশীল বন্দোপাধ্যায়ের "অগ্নিযুগের অগ্নিকথার" গল্প কতটা নির্ভরযোগ্য তার আর এক প্রমাণ—তিনি লিখেছেন: "প্রফুল্ল সমস্তিপুরে এসে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনে তাঁর সঙ্গে **কলকাতার সি আই ডি বিভাগের তরুণ দারোগা নন্দলাল বসুর দেখা হল**।" (পৃঃ ১৪৯)

সিংভূমের পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর লেখকের কল্যাণে হল সি আই ডি দারোগা আর নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় হল নন্দলাল **বসু**।

আরও আছে: "প্রফুল্লর বড় খিদে পেয়েছিল। তিনি খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন [যে-খাবার আনার অজুহাতে নন্দলাল "বসু" ট্রেন থেকে নেমে গেছল সেই খাবার?] পুলিসবাহিনী-সমেত নন্দলালকে দেখে প্রফুল্লর অন্তরের ক্ষণিকের প্রফুল্লতা [খাবার পাবার সম্ভাবনায়?] মিলিয়ে গেল। নন্দলাল সঙ্গের কনস্টেবলদের ইঙ্গিত করলেন প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে।

"প্রফুল্ল নন্দলালের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে **জামার পকেট** থেকে নিজের রিভলভর বার করলেন। দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, কিন্তু আমাকে ধরতে পারবেন না। আমার মুক্তপ্রাণ।

"প্রফুল্ল নিজের রিভলভর নিজের বুকে বসিয়ে গুলী করলেন।

ব্যাপারটা যে এমন সরলভাবে হয়নি, কিভাবে হয়েছে তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি বাহুল্য মাত্র। সুশীলবাবুর গল্প তার নিজস্ব।

(১৮)

প্রফুল্ল মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস তার যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি করতে দেয়নি এবং এই কলঙ্কের ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার কাজ করেছে মুখ্যত কয়েকটি বাঙালি পুলিস অফিসারই। পুরস্কার ও পদোন্নতিলোভী নন্দলাল

ব্যানার্জি কয়েকজন বিহারী পুলিসের সাহায্যে দীনেশকে ধরতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র রায় কে ? নন্দলাল জানে না, ক্ষুদিরাম জানেন না, কিশোরীমোহন ব্যানার্জিও জানেন না। দীনেশের প্রকৃত পরিচয় কি ? তাঁর নিষ্প্রাণ দেহের ফোটো নেওয়া হল মোকামে ঘাটে, বরৌনি জংসন স্টেশনে, মানে, বেশ কটি। তাতেও সন্তুষ্ট হল না। কেউ যখন দীনেশ নামটির রহস্যোদ্ঘাটন করতে পারল না, তখন তাঁর শিরশ্ছেদ করা হল। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন শির। সেই শির ডোবানো হল সুরাসারের (স্পিরিটের) এক পাত্রে, তারপর তা নিয়ে আসা হল কলকাতার পাপপুরী লালবাজারে। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৯০৮ এর ৩ মে লিখলেন "The head of the late D C. Roy... has been brought to Calcutta for the purpose of identification. It is preserved in spirits of wine".

ক্ষুদিরামের মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাচ্চু নারায়ণ লাল আদালতে প্রকাশ করেন, ঐ ছিন্ন মুণ্ড প্রফুল্ল চাকীর এবং তাই দীনেশের প্রকৃত নাম। মানিকতলায় থাকতেন। সম্ভবত এই ডেপুটিই প্রফুল্লর ছিন্নমুণ্ডের বাহক। লালবাজারে সনাক্ত করতে নিয়ে আসেন। সাক্ষ্যদানকালে অবশ্যই তা প্রকাশ করেন নি। জহ্লাদটির নামও নয়। এই অসামান্য বীরের শির ও ছিন্ন দেহের কি হল তাও না।

এত ফোটো তোলা সত্ত্বেও সনাক্তকরণের জন্য দেহ থেকে মাথাটি বিচ্ছিন্ন করা হল কেন, এই সঙ্গত প্রশ্নটিই অমৃতবাজার পত্রিকার বগুড়ার সংবাদদাতা সাহসভরে তুলেছিলেন। প্রফুল্ল ছিলেন বগুড়া জেলারই সন্তান। সংবাদদাতার দীর্ঘ চিঠিটির তারিখ ২৬ মে, তাতে উল্লেখ ছিল চাকী-পরিবারের প্রতিক্রিয়াও : "Verily, we could not make out what the paternal Government would gain by this unseemly act when photos for identification had already been taken. The dead bodies, even of the enemies, are respected by all civilised nations. This revolting decapitation of the corpse reminds one of the treatment which the Committee of Public Safety, during the French Revolution, meted out to the dead body Valaz, one of the Girondists, who made away with himself with a poniard, just after the sentence of death was passed on him-

self. The president decreed in ghastly words that the warm corpse of Valaz would be carried to the prison, conveyed in the same cart with the accomplices to the scaffold".

সমগ্র ব্যাপারটি এমনই ঘৃণ্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একথা প্রায় সকলেরই অজ্ঞাত এটি সর্বাংশে বাংলা অনুবাদে তুলে দেওয়া কর্তব্য বোধ করছি:

"প্রথম যখন এখানে খবর এল যে, বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী বোমা বিস্ফোরণের একজন, এখানকার কোন লোকই যেন বুঝে উঠতে পারল না। ঐ অল্প বয়স, সবল ও বিনম্র, বগুড়ার মত 'নিদ্রাচ্ছন্নপ্রায় দেশ' থেকে গিয়ে বক্তক্ষয়ী কাণ্ডের গুপ্ত আড্ডায় যোগ দেবে, কেউ ভাবতে পারেনি।

"শান্ত, ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্ম। বগুড়া থেকে ১২ মাইল দূরবর্তী গ্রাম বিহারের প্রয়াত রাজনারায়ণ চাকার পঞ্চ সন্তানের কনিষ্ঠ প্রফুল্ল নামের সঙ্গে মিল রেখে কখনও প্রফুল্লচিত্ত ছিল না, বরং শৈশবকাল থেকেই সাধকের মত ভাবুক ছিল। কদাচিৎ সঙ্গীদের সাথে খেলতে দেখা যেত, কি এক ভাবনায় একাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। কিঞ্চিৎ শ্যামাঙ্গ, প্রশস্ত ললাট, লক্ষণীয় ভ্রূ-যুগল, দৃপ্ত মুখমণ্ডল—সব যেন ছিল তার দৃঢ় চিত্তের দর্পণ। ফুলারের আমলে যে আশীটি ছেলে রঙপুর জেলা স্কুল ছেড়ে দিয়ে বঙ্গদেশে জাতীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিভূমি রচনা করে সে ছিল তাদেরই একজন।

"অসংসারী ও সংক্ষিপ্ত এই জীবনটি প্রস্ফুটিত হয় এক সংস্কৃতিবান সচ্ছল পরিবারে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বি-এ পর্যন্ত পড়ে এখন বগুড়ার নবাবের কর্মচারী। অন্য দুই ভাইও শিক্ষিত ও ভদ্র। চার ভাই, এক বোন, কোমলাপ্রকৃতি কিন্তু দৃঢ়মনা। যখন ভাইয়ের বিষাদময় ও রোমহর্ষক খবর তাঁকে জানানো হল, সহোদরার অন্তরে সঞ্চারিত এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, একটা মৃদু শব্দও উচ্চারণ করলেন না, নিঃশব্দে শোবার ঘরে গেলেন এবং সারারাত গীতা ও মহাভারতের সেই অংশ পড়ে গেলেন যেখানে আছে 'অভিমন্যু বধের' কাহিনী। প্রফুল্ল পরিবারের স্নেহের পাত্র ছিল, সকলেরই প্রিয়। তবু এই স্নেহনীড় ও মায়ের কোল ছেড়ে কেন যে সে চলে গেল তা অনুমানও দুঃসাধ্য। বছরখানেক আগে সে মা'র কাছে বিদায় চেয়ে নেয়, সে মা'র কাছে বিদায় প্রার্থনাকালে যে রহস্যময়কথা বলে, বৃদ্ধা মাতার কাছে তা দুর্বোধ্যই থেকে গেছল, আজ তা অর্থময় হয়ে উঠেছে।

"সেই ভয়ঙ্কর অভিসারে বেরিয়েও সে মাকে ভোলে নি এবং সঠিক ঠিকানা

না দিয়ে মাকে দু'খানি চিঠি দেয়, মাকে এই বলে আশ্বাস দেয়, তাঁর সন্তান লেশমাত্র কষ্টে নেই, অস্বাচ্ছন্দ্যে নেই। মাকে জানায়, সে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়েছে, ধর্মাচরণে বেশ খানিকটা এগিয়েছে। অন্যান্য বিষয়ও পড়ছে। তার জন্যে কোন উৎকণ্ঠার কারণ নেই।

"এই মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্তও মোটামুটি বেশ চলছিল, হঠাৎ বজ্রাঘাত হল, পরিবারের সকলের প্রিয়তম স্নেহাস্পদের মর্মন্তুদ জীবনাবসান—সেই বজ্র। তারপর যখন ঐ নিষ্ঠুর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে, প্রফুল্লর মাথাটি দেহ থেকে ছিন্ন করা হয়েছে ও স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে তখন আমরা সত্যি সত্যি সন্ত্রাসে হতবাক্ হয়ে গেলাম। সত্যি বুঝতে পারছিনে, এই বর্বরোচিত কর্মানুষ্ঠানে সরকার কি পরমার্থ লাভ করলেন ? সনাক্তকরণের জন্য ফোটোই তো নেওয়া হয়েছে। সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে বিপক্ষীয় মৃতদেহ সম্মানিত হয়ে থাকে। একটা মৃতদেহের ন্যক্কারজনক শিরশ্ছেদ ফরাসী বিপ্লবকালে কমিটি অব পাবলিক সেফটি জিরণ্ডিস্ট ভালাজের প্রতি যে আচরণ করেছিল তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কমিটি প্রেসিডেন্ট তাঁর ডিক্রিতে এই রোমহর্ষক উক্তি করেছিলেন যে, ভালাজের উষ্ণ মৃতদেহ তাঁর সহচরদের সঙ্গে একই গাড়িতে কারাগারের বধ্যমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হবে। ভালাজ মৃত্যুদণ্ডের পর একটি ছোরায় আত্মহনন করেছিলেন। আমি এই দ্রুতলিখিত অসম্পূর্ণ রূপরেখাটি অন্তিমপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল শেষ যে কথা কটি বলেছিলেন, তাই দিয়ে উপসংহার করি : হাঃ হাঃ, তুমি বাঙালি, আমার দেশবাসী, তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছ ?"*

কালীপদ বাগচী তাঁর "শহীদ প্রফুল্ল চাকী"-তে (৬৫ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন : "প্রফুল্লর কর্তিত মস্তকের ফটো প্রেরিত হইল বগুড়ায়। বগুড়ার পুলিশ ঐ ফটো লইয়া প্রফুল্লের বাড়িতে সনাক্তের জন্য ধাওয়া করিল। প্রফুল্লর বৃদ্ধা মাতা তখনও জীবিতা। বড় ভাই প্রতাপচন্দ্র ও জগৎনারায়ণ সনাক্ত করিল। মাতা স্বর্ণময়ী বলিলেন, 'এ আমারই পুত্র প্রফুল্লর ফটো—আজ আমি ধন্য।'

"প্রফুল্লর খণ্ডিত মস্তক মাটিতে প্রোথিত করা স্থির হয়। বর্তমানে যে রাস্তার নাম ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট তথায় তদানীন্তন একজন সাব-ইন্সপেক্টর হেমচন্দ্র লাহিড়ী উহা প্রোথিত করেন। হেমচন্দ্র লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী।—পৃঃ ৬৯

*বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জানা দরকার, বিপ্লবী আন্দোলন দমনে ইংরেজের সাহায্যে বাঙালি পুলিসেরা যত নীচে নামতে পেরেছিল এমন আর কেউ পারেনি। প্রফুল্ল চাকী প্রসঙ্গে তার আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

"প্রফুল্লর দেহের কোন অংশই পাওয়া গেল না। শ্রাদ্ধের ব্যবস্থায় মায়ের উৎসাহ সর্বাধিক। গুরুদেব, পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত নেওয়া হইল। স্থির হইল, প্রফুল্লর কুশপুত্তলিকা করতোয়াতীরে দাহ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে। শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধের দিনে মাতা স্বর্ণময়ী সর্বক্ষণ শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন।"—পৃঃ ৭২

কালীপদবাবুর বইয়ে নিম্নোক্ত অভিযোগগুলোও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সরকার সর্বতোভাবে প্রফুল্লর স্মৃতিনাশের চেষ্টা করেছে। প্রতাপচন্দ্র চাকী, গ্রামের ভারতচন্দ্র পোদ্দার, আলিমহম্মদ মণ্ডলকে সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে প্রফুল্লদের বাড়ি তল্লাসী করা হয়েছে। পরিবারের কোন ব্যক্তিই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান নাই। প্রতাপচন্দ্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ভ্রাতুষ্পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণের কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষায় বিঘ্নোৎপাদন করা হয়েছে। ভ্রাতুষ্পুত্র কোচবিহারে পড়তে যান, পুলিশের রিপোর্টে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। প্রফুল্লর গুণগ্রাহীরা অনেকেই বিনা বিচারে অবরুদ্ধ হন।

হেমন্ত চাকী তাঁর "অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী"-তে লিখেছেন : "প্রফুল্লর দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় এবং অবশিষ্টাংশ ডোমের দ্বারা শ্মশানে শৃগাল কুকুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়।"—পৃঃ ১৪৬

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় তাঁর "শহীদ যুগল"-এ ১৯০৮, ১৪ মের 'সঞ্জীবনী' থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন : [ক্ষুদিরাম সনাক্ত করার পর] "পুলিসের কর্তাদের হুকুমে প্রফুল্লের মৃতদেহ হইতে গলা কাটিয়া ফেলা হইল এবং একটা কেরোসিনের টিনে স্পিরিটে ডুবাইয়া প্রফুল্লর ছিন্ন মস্তক কলিকাতায় আনা হইল। ভাল করিয়া সেনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই নাকি এরূপ করা হইয়াছে।"—পৃঃ ১৯০

২৮ মে ১৯০৮ তারিখের 'সঞ্জীবনী' থেকে তুলেছেন : [ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর দেহ দেখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যানকে বলেন] "চেহারা দেখিয়া আমি বলিতেছি যে, এই মৃতদেহ দীনেশচন্দ্র রায়ের, কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া ইহা বলিতেছি না। (একটা রক্তাক্ত নূতন পাঞ্জাবী জামা দেখিয়া) আমি ইহা চিনিতে পারিতেছি না। (এক জোড়া নূতন জুতা ও ময়লা গেঞ্জি দেখিয়া) আমি ইহা কখনও দেখি নাই। (ব্রাউনিং পিস্তল দেখিয়া) এই পিস্তল কখনও দেখি নাই। একখানা চাদর ছিঁড়িয়া দুইখানা করা হইয়াছে। আমি যখন দেখিয়াছিলাম তখন ইহা ছেঁড়া ছিল না। আমি ধুতি চিনিতে পারিতেছি না। দীনেশ বাঁকীপুরে

থাকিত। আমি সত্য কথাই কহিতেছি। সে নিজে আমাকে এই কথা কহিয়াছিল। সে তাঁহার ভাইয়ের সঙ্গে থাকিত। কোথায় পড়িত, তাহা জানি না। তাহার ভাই এর নাম জানি না।"—পৃঃ ১৯৪

ক্ষুদিরাম যতটুকু জানতেন ততটুকুই স্বীকার করেছেন। নাম দীনেশচন্দ্র রায়। পিস্তলও দেখেন নি। বাকিটা প্রফুল্ল যে-রকমটি বলেছিলেন তেমনই বলেছেন। প্রফুল্লর ভাইয়ের কোন খবর তাঁর জানার কথা নয়।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ তাঁর 'First Spark of Revolution'-এ লিখেছেন: "The Goverment agents chopped off the head of Prafulla *to be produced as an exhibit in the Muzaffarpur trial. His decapitated body was brought to Calcutta and was interred somewhere on Free School Street.*" (p. 131)

অরুণবাবু মাথাটি রাখলেন মজঃফরপুর মামলায় নিদর্শনরূপে দেখাতে আর দেহটি আনলেন কলকাতার ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের কোথাও কবর দিতে। একেবারেই উল্টো ব্যাপার। ছিন্নমুণ্ড আনা হয়েছিল কলকাতায়, দেহ অসম্মানিত অজানিত স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, হয়তো কোন শ্মশানে-মশানে, কলকাতায় নয়। কলকাতায় আনা হয়েছিল ছিন্ন শির, ফ্রীস্কুল স্ট্রীট খুঁড়লে হয়তো কোথাও পাওয়া যেতে পারে নর-কপাল নয়তো কিছু কররের মাটি। মজঃফরপুর মামলায় ছিন্নমুণ্ডের ফটো উপস্থিত করা হয়েছে, ছিন্নমুণ্ড নয়। অরুণবাবুর মতো বিপ্লবী-লেখকের এই ভ্রান্তি কেবল পাঠকের পক্ষে নয়, তাঁর পরবর্তী লেখকদের পক্ষেও মারাত্মক।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ মশাইও তাঁর "জাগরণ ও বিস্ফোরণ ২য় খণ্ডে" লিখেছেন: "দীনেশের **মৃতদেহ কলিকাতায় আনা হয়** এবং স্বল্পকালের মধ্যে তাঁকে **রংপুরের** প্রফুল্ল চাকী বলে সনাক্ত করা হলে পুলিশ স্বস্তিলাভ করে।" পৃঃ-২৯৬-৯৭

অরুণবাবু তবু মস্তক-বিচ্ছিন্ন দেহটি কলকাতায় এনেছেন এবং মস্তকটি রেখেছেন মজঃফরপুরে মামলার নিদর্শনরূপে। কালীচরণবাবু এনেছেন অবিচ্ছিন্ন দেহটা। কোথায় গেল সেই দেহ, সেই মাথা—কেউই তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। ঘামাতেও হত না, সেকালের কাগজেই মাথার খবর পাওয়া যায়, দেহটির নয়। আত্মীয়স্বজনের হাতে দেওয়া হয় নি, শ্রাদ্ধের জন্য তাই কুশপুত্তলিকা দাহ করতে হয়েছিল। প্রফুল্ল "রংপুরের" নন, বগুড়ার।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের লেখাও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু মাথা কেটে নেওয়ার কথাটা আছে। তাঁর "অবিস্মরণীয়"র ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় আছে : "ফটো তুলে নেওয়া সত্ত্বেও সনাক্তকরণের নাম করে তাঁর **মাথাটা কেটে আনা হল মজঃফরপুরে।** বিচারের নামে কি নৃশংসতা! ফরাসী বিপ্লবের সময় হয়ত ঠিক এমনি করে 'M. Valaze' এর মৃতদেহ থেকে তাঁর মাথাটা কেটে আনা হয়েছিল।" এডভোকেট শ্রীচন্দ্র "9 Calcutta Law Journal 55"-কে সাক্ষ্য মেনেছেন। কিন্তু তৎকালীন সংবাদপত্রের সঙ্গে এর মিল নেই।

(১৯)

মজঃফরপুরের ঘটনাবলী ও ক্ষুদিরামের ফাঁসী উপলক্ষ্য করে সেকালে, পরবর্তীকালে এবং আজও যেসব সঙ্গীত প্রচলিত তাদের মধ্যে কি ভীষণ তথ্যবিকৃতি ঘটেছে এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতেই বোঝা যাবে। মামলার বিবরণে তা আরও পরিষ্কার হবে। এসব গানে প্রফুল্লর নাম গন্ধও নেই। ঈশান মহাপাত্র মশাই তাঁর 'শহীদ ক্ষুদিরাম'-এ গুটি কয়েক গান দিয়েছেন, তার একটি তুলে দিচ্ছি :

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে চেয়ে ভারতবাসী
কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে
জজ সাহেব মারব বলে মারলাম দু'জন নির্দোষী
হাতে যদি থাকত ছোরা তোর ক্ষুদে কি পড়ত ধরা?
ওমা এক চাবুকে চলে যেতাম গয়া গঙ্গাকাশী।
শনিবার ছ'টার পরে আদালতে লোক না ধরে
ইংরাজ-রাজ বিচার করে রায় দিল তোর ছেলের ফাঁসি।
ছাড় কাঁচের বাসন চুড়ি, পরবে না বিলাতী শাড়ী
মনের দুঃখ মনে রইল মা হল না আর স্বদেশী।
দশ মাস দশ দিন পরে, ক্ষুদিরাম তোর আসবে ফিরে
চিনতে যদি না পারিস মা দেখবি গলায় ফাঁসি।"

এই গানটি পাঠান্তরে আছে ঃ

> শনিবার বেলা দশটার পরে, জজ ব্যারিষ্টার বিচার করে মাগো
> (হাইকোর্টেতে লোক না ধরে মাগো) **অভিরামের দ্বীপান্তর মা**
> ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
> **হাতে যদি থাকত ছোরা,** তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা মাগো
> রক্তে মাংসে এক করিতাম দেখতো ভারতবাসী॥
> তের লক্ষ তেত্রিশ কোটি **রইল তোমার নাতিপুতি** মাগো
> তাদের নিয়ে ঘর করো মা **বৌকে ক'রো দাসী**॥ ইত্যাদি

দুটি গানেই আছে 'হাতে যদি থাকত ছোরা', ক্ষুদিরামের কাছে ছিল দুটি রিভলভার। তবু ধরা পড়েছেন। অভিরাম কে? দীনেশ থেকে প্রফুল্ল? তাঁর তো দ্বীপান্তর হয় নি।

(২০)

সুতরাং, আমাদের সত্যোদ্ধারের শেষ আশ্রয় ক্ষুদিরামের মামলা। মামলার বিবরণ, সাক্ষ্যসাবুদ—তা যতই সাজানো হোক—, ক্ষুদিরামের দুটি স্বীকারোক্তি—তাতে যতই বানানো কথা থাক, ম্যাজিস্ট্রেটের কথা ও হুকুমনামা, জজের রায়, বিচারপতির জিজ্ঞাসাবাদ, সিদ্ধান্ত, তৎকালীন সংবাদপত্রের রিপোর্ট। আমার অধিকাংশই অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে সঙ্কলন। কয়েক বছর ধরে আমি ১৯০৭ থেকে ১৯১১ অবধি যত রাজনৈতিক মামলা হয়েছে তার কিছু ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি। আমি এজন্য অমৃতবাজার পত্রিকার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

২১ মে সকালবেলা ক্রাউন (মানে সম্রাট) বনাম ক্ষুদিরাম বসু ও কিশোরী-মোহন ব্যানার্জি মামলা শুরু হল। বিচারক সীতামারির মহকুমা হাকিম মিঃ বার্থ্ড (Berthoud)। বাঁকীপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ মান্নুক সম্রাটপক্ষে, ক্ষুদিরামের পক্ষে কেউ নয়, কিশোরীমোহনের পক্ষে সবচাইতে দক্ষ স্থানীয় উকিল। মিঃ মান্নুক সরকারপক্ষে ফরিয়াদ করতে গিয়ে বললেন, There was straight-forward simplicity in inverse ratio to tortuous offence. They were about to enquire fairly substantial and as it subsequently transpired, an accurate descriptlon of two suspects which

was immediately obtained and promulgated. Every exit from North Behar was practically blocked. কাঠগড়ায় ১ নং বন্দী ওয়েইনি স্টেশনে সেই পরিচ্ছদেই ধরা পড়েছে যে-পরিচ্ছদ অপরাধ অনুষ্ঠানকালে তার পরিধানে ছিল। এখনও তার পায়ে জুতো নেই, সেই ডোরাকাটা কোট, সনাক্তকরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন এবং তার হেফাজতে পাওয়া গেছে নীবর সাক্ষী ছুটি বিভলভার, একটি গুলি-ভরা, ধরা না দেবার জন্য সে এটি তুলতেও চেয়েছিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট ঘটাবার আগেই সে পর্যুদস্ত হয়েছিল এবং তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। তা'ছাড়া, তার কাছে টাইম-টেবল ও রেল-মানচিত্রও পাওয়া গেছে, এরই সাহায্যে সে পালাতো। তার ষড়যন্ত্রের সঙ্গীটির ভাগ্যও এর চাইতে বেশি সুপ্রসন্ন ছিল না, ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে মোকামেয় তাকে পাওয়া গেছল, সেখানে সে গ্রেপ্তার এড়াতে বিভলভারে আত্মহত্যা করে। মজঃফরপুরের ঘটনার সময়ে সনাক্ত করবার মতো যদিও কোন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না, ঘটনার পারিপার্শ্বিক নিঃসংশয় সাক্ষ্য প্রভৃত। ২ নং বন্দী একটি মনি অর্ডার কুপন দিয়েছে, সেটি মোকামেয় যে আত্মহত্যা করেছে তার এবং এটি ডাকঘরের এক পিয়নের সাক্ষ্যে সমর্থিত। ধর্মশালায় ২ নং বন্দীর অফিস আছে এবং সেখানেই অপরাধ-অনুষ্ঠাতারা ছিল। ২ নং বন্দীর বাসস্থান তল্লাসী করে কিছু উগ্র ও রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক বাংলা সঙ্গীত পাওয়া গেছে। এগুলোয় ২ নং বন্দীর মানসিক ঝোঁক বোঝা যাচ্ছে—যেখানে অপরাধ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই ছিলেন মিঃ কিংসফোর্ড।

মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর্মষ্ট্রং প্রথম সাক্ষী হিসেবে বললেন : মার্চ মাসের শেষাশেষি মিঃ কিংসফোর্ড কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলি হয়ে আসেন। কলকাতা থেকে পাওয়া এক সংবাদ সূত্রানুসারে আমি কিংসফোর্ডের বাংলো প্রহরার ব্যবস্থা করি। সন্দেহভাজন অপরিচিতদের সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নি। মিঃ কিংসফোর্ডের গেটের কাছে দুজন কনস্টেবলকে মোতায়েন রাখি, আদেশ দি, ছটা সাড়ে ছটা থেকে জজ ক্লাব থেকে ফেরা অবধি টহল দিতে। তারা কিংসফোর্ডের গেট আর ক্লাবের গেটের মধ্যে টহল দেয়। আমার আদেশ ওরা পালন করে। কনস্টেবল তহশিলদার খাঁন ও ফিয়াজুদ্দিনকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমি ঐদিন ক্লাবের রিডিংরুমে ছিলাম। ৮-৩৫ মিনিট নাগাদ আমি একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনি। আমি ভাবলাম, কোন বিয়ের উৎসবে বোমা ফাটল। আমি সময় দেখে নি, কেননা, আমি ঠিক

করে ফেলি, লোকটাকে আইনে ফেলব। আমি বাড়ি ফিরে খেতে বসে যাই। কিছুক্ষণ পর মিঃ লী গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন এবং কি হয়েছে তা বলেন। আমি মিঃ লীর গাড়িতে উঠে পড়ি এবং একসঙ্গে ঘটনাস্থলের দিকে এগোই। যাবার পথে মিঃ কিংসফোর্ড ও উডম্যানের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁরা আমাকে তুলে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। মিঃ কিংসফোর্ডের গেটের উল্টোদিকে ঐ দৃশ্যপটটি আমি পর্যবেক্ষণ করি। কাঠের টুকরো, গাড়ির ভগ্নাংশ, ভাঙা কাঁচ, টুপির ছিন্নভাগ, দগ্ধ রুমাল, রক্তচিহ্ন, আসনের গদা আর গাড়ির স্প্রিং দেখতে পাই। এখানে কনস্টেবল ফিয়াজুদ্দিনকে পাই। সে-বলে, সে বোমা ফাটার শব্দ শুনেছে এবং দুটি মূর্তিকে ময়দানের দিকে ছুটে যেতে দেখেছে। সে তাদের পিছু ছোটে কিন্তু তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। 'আমি তাকে আরও প্রশ্ন করি এবং সে বলে, সে সন্ধ্যে সাতটায় দুটি বাঙালি জওয়ানকে দেখেছে। সে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিল, তাঁরা বলেছেন তাঁরা ছাত্র, কিশোরীবাবুর বাড়িতে আছেন। সে তাঁদের চলে যেতে বলে। তার হিসেবমতো তাঁদের উনিশ বছর বয়স হবে। সে আরও বলে, আবার যদি দেখা হয়, সে তাঁদের সনাক্ত করতে পারবে। সে বলে, একজনের গায়ে ডোরাকাটা কোট ছিল, আর একজনের গায়ে সার্ট। আমি তক্ষুণি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিশোরীবাবু কে ? সে বলেছিল, সিরাজগঞ্জ বাজারে ঐ নামে একজন আছেন। আমি তাকে তাঁর বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে যেতে বললাম। বাড়িটা তল্লাসী করলাম। এ সন্দেহভাজন কিশোরীবাবুর বাড়ি নয়। তল্লাসীর পর আমি সাব-ইন্সপেক্টর চতুর্বেদী শর্মাকে কিছু নির্দেশ দিলাম বাঁকীপুর ও মোকামে সম্পর্কে। আমি টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশে তারবার্তা পাঠালাম। তখন তাঁদের কোন বর্ণনা দিই নি, কেননা, মনে হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। আমি শুধু জানিয়েছিলাম, দুটি ১৯।২০ বছরের বাঙালি তরুণ। আমি ঘটনাস্থলে ফিরে এলাম। সেখানে মিঃ উডম্যানকে পেলাম। তিনি জজবাড়ির গেটে সাক্ষ্যসাবুদ নথিভুক্ত করছেন। গেটটা রাস্তার পাশে। তিনি বিস্ফোরণ সম্পর্কে তদন্ত করছিলেন। আমি ঐ দু'জন কনস্টেবলকে তাঁর কাছে হাজির করলাম। মিঃ উডম্যান তাদের বিবৃতি নথিভুক্ত করলেন। তারপর আমি সেই ময়দানে গেলাম যে ময়দানে সেই মানুষ দুটি গেছল। পূবদিককার গোলপোস্টের ধারে একটা টিন পেলাম। জায়গাটা ম্যাপে ক্রশচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। একটা ঢাকনা-সুদ্ধ তামাকের টিনের মতো। বিস্ফোরক সংক্রান্ত ইন্সপেক্টর মেজর স্মলউড ওটা নিয়ে গেছেন। টিনটার

ভেতরে এক টুকরো ন্যাকডা ছিল। আমি তারপর মাঠ পার হয়ে গেলাম এবং ওখানকার বাড়ির লোকেদের কাছে খোঁজ নিলাম। আমি কয়েকটি বাডি তল্লাসও করলাম। আবার ঘটনাস্থলে ফিরে এলাম। দেখলাম, মিঃ উডম্যান গেটের উল্টো দিকে রাস্তাব ওধাবে একটা গাছের নীচে কতকগুলো জুতো পরীক্ষা কবছেন। ওখানে একটা চাদবও পাওয়া গেছল। সেখানকার স্কেচটা এই, ম্যাপে জুতো ও চাদর পডে থাকবার জায়গা দেখানো আছে। ম্যাপটা আমাব আঁকা। এই বড ম্যাপটা আমাব প্রত্যক্ষ পবামর্শমতো আমিনের আঁকা। ইচ্ছে করেই একসঙ্গে দুটো জুতো বাখা হয়েছে। আবার টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম স্কেচটা কববার পব। এবাব মানুষ দুটিব পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে তাববার্তা পাঠালাম। বেলস্টেশন গেলাম, মোকামে পযন্ত যে সাব-ইন্সপেক্টর কনস্টেবলবা যাচ্ছে তাদেব পাকা হুকুম দিলাম। স্টেশনে সন্দেহভাজন দু'জনের বর্ণনাও দিলাম। আমি বেলস্টেশনে জানিয়ে দিলাম আততায়ী দু'জনকে ধবতে পারলে ৫০০০ টাকা পুবস্কাব দেওয়া হবে।

খবব পেয়ে ধর্মশালা আবাব তল্লাস কবা হ'ল, কিন্তু বৃথা। বেলা সাডে তিনটায় আমি আমার ডায়েবী বন্ধ করলাম। পবদিন সকালবেলা ময়দান তল্লাস কবলাম। সকাল সাতটায় গাডিটাব ভাব নিলাম। সাবা রাত ওটা পুলিস প্রহবায ছিল। পোডা কাপড চোপড, টিনেব টুকবো সংগ্রহ কবলাম। আমি মনে কবেছিলাম, ঐ টিনেব টুকবো বোমাবই খোল। এই বকমই একটা টুকবো সিভিল সার্জেন আমায হাতে দেন, ওটা মিসেস কেনেডিব দেহে গ্রথিত ছিল। বাকিগুলো আমি মেজব স্মলউডকে দিগেছি। এই সেই চাদর যেটি গাছতলায় পাওয়া গেছল, এক জায়গায ছিঁডে গেছে। গাছতলায় এই দু'জোডা জুতোও পাওয়া গেছে। এবপব আমি আমিনকে দিগে একটা ম্যাপ আঁকাই। গোটা তদন্তে সাহায্য কবেছেন ডি-এস পি মিঃ বাচ্চু নারায়ণ লাল।

১ মে বেলা একটায় ওয়েইনি ষ্টেশন থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম; পাঠিয়েছে কনষ্টেবল ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ মিশির। ঐদিন (১ মে) আমি যে হল্লা দাবি করেছিলাম এই সেইটি। তাববার্তা পেয়ে আমি ২-২৫ এর ট্রেন ধবলাম, এখান থেকে ২৪-২৫ মাইল দূরে ওয়েইনি ষ্টেশনে গেলাম। আমি দেখলাম একজন কনষ্টেবলের হেফাজতে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তাব হয়ে আছে। (ডকে ক্ষুদিরামকে দেখালেন) একজন কনষ্টেবল এক বাণ্ডিল কাপড় দিল। খুলে দেখি, তাতে দুটি রিভলবার রয়েছে, একটায় গুলি নেই, একটা গুলি ভবা। রিভলভার

দুটো সম্পূর্ণ কার্যোপযোগী। কোট পকেটে ক'টা কার্তুজ পাওয়া গেল। গোটা ত্রিশেক। এই সেই কার্তুজগুলো। এর মধ্যে যেটা বড় সেটা দুটো বিভলভারেই ব্যবহারোপযোগী। দুটো ডামি কার্তুজ, ১৪টি বড় কার্তুজ। মোকামেতে দীনেশ চন্দ্র রায় যে ব্রাউনিং পিস্তল দিয়ে আত্মহনন করেছিলেন এই ২১ টা তাতে খাপ খায়, ওটির ম্যাগাজিনে চারটি কার্তুজ ছিল, ক্ষুদিরামের ডোরাকাটা কোট থেকে ঐ জাতীয় যে ২১ টা কার্তুজ পাওয়া গেছে তার মতই। নোটে এই ত্রিশটা টাকা ও কিছু খুচরো বন্দীর কাছে পাওয়া গেছে। কনেস্টবল আমার হাতে তাই দিল। এই ঘড়ি আর চেনটাও পাওয়া গেছে। এই টাইম টেবিলের খানিকটা, রেলওয়ে ম্যাপের কাটিং। মোমবাতি আর দেশলাই। সিল্কের কুর্তা।

আমি বন্দীকে চারটার ট্রেনে নিয়ে রওনা হলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় এলাম। এখানে পৌঁছে সব চাইতে কাছে যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ছিল সেখানে তাকে নিয়ে যাই। আমি তাকে স্টেশন ক্লাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেলাম। সেখানে বন্দীর বিবৃতি নথিবদ্ধ করা হল। দু'জন কনস্টেবল, তহশিলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিন বন্দীকে এই বলে সনাক্ত করল যে ৩০ এপ্রিল তারা যে দুটি বাঙালি তরুণকে দেখেছে বন্দী তাঁদেরই একজন। আবদুল করিম নামে একটি ছেলেও বলল, ২ মে সকালবেলা খেলার মাঠে জজ আদালতের আশে পাশে ঘোরাফেরা করছিল যে-দুটি ছেলে বন্দী তাদেরই একজন।

আমি যখন অফিসে এলাম, আমাকে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, শিবচন্দ্র ব্যানার্জি তাঁকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। টেলিগ্রামটা তার কাছে সমস্তিপুর থেকে তার নাতি সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি পাঠিয়েছে। ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লোকটিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে জবাব পাঠিয়েছেন। বেলা চারটে নাগাদ মোকামের রেল পুলিসদের কাছ থেকে দুটি টেলিগ্রাম পাই। আমি দেহটার ফোটোগ্রাফ তোলবার জন্য নির্দেশ পাঠাই। কলকাতার সি-আই-ডিকে যোগ দেবার জন্যও আমি তারবার্তা পাঠাই। আমি দু জন এস-আইকে দেহ সনাক্তকরণের জন্য তিনজন সাক্ষী নিয়ে যেতে হুকুম দি। তারা ৩ মে রাত্রি ৩টার ট্রেনে রওনা হ'য়ে যায়। আমি একটা তারবার্তা পাই। তার জবাবে আমি সমস্তিপুরে একটা তার পাঠাই। দুপুরবেলা দেহটি আনা হয়। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আমি ব্রাউনিং পিস্তলটার ভার নি।

৩ মে বেলা তিনটের সময় (বন্দী) ক্ষুদিরামকে নিয়ে আমি ধর্মশালায়

যাই, আমার সঙ্গে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে বন্দী একটা ঘর দেখিয়ে দেন। এই ঘরে তিনি এবং "মৃত" ব্যক্তি থাকতেন। ঘরটা তালাবন্ধ ছিল। তালাটা ভাঙা হল। দেখলাম একটা ক্যানভাস ব্যাগ, একটা চাদর। এই সেই টাইম টেবিল। চতুর্থ দিনে সকালবেলা আমি সকাল সাড়ে সাতটায় মেজর স্মলউডের সঙ্গে দেখা করি, তাঁকে আমাদের হস্তগত কয়েকটি জিনিস দিলাম। মৃতদেহের পায়ে জুতো জোড়া লাগে কিনা দেখবার জন্য ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেনকে বললাম। কতগুলো খবরের ওপর নির্ভর করে আমারই আদেশে কিশোরী-মোহনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জেরা আপাততঃ স্থগিত থাকে। শুনানীও এদিনকার মত শেষ। তারপর দিন। যে দু'জন কনস্টেবল কেনেডির বাংলোর সামনে টহল দিচ্ছিল তাদের একজন, তহশিলদারখান, বলল: আমি এখানকার জজ সাহেবকে চিনি। ঘটনার ৮।১০ দিন আগে আমাকে হুকুম দেওয়া হয়, দেখো, যেন কোন "হল্লা গোল্লা" না হয়। আমার সঙ্গে কনস্টেবল ফিয়াজুদ্দিন। ঘটনার রাত্রে আমি যখন বোমার আওয়াজ শুনলাম আমরা তখন ক্লাবের পশ্চিম গেটের দিকে ছিলাম। শব্দটা রাত আটটার পর শুনি। রাত সাতটায় দুটি ছেলেকে দেখেছিলাম। ওরা প্রথম পশ্চিম পানে যায় তারপর ফিরে আসে। আমি ফিয়াজুদ্দিনকে ওদের প্রশ্ন করতে বললাম। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কে গো বাবু? তারা বলল, আমরা ছাত্র, কিশোরীবাবুর বাড়ি থাকি। আমি বললাম, এখানে ঘুর ঘুর করবেন না। তারা বলল, খেলাধুলার জন্য তারা একটা ছেলের জন্য অপেক্ষা করছে।

আমার মনে হল, ওদের সন্দেহ করবার কিছু নেই। তাদের পূব গেটের দিকে দেখলাম। কথায় ও চেহারায় তাদের বাঙালি বলে মনে হল। পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়ে বলল, তারা বাঙালি।

আমরা জজ সাহেব আসবেন বলে অপেক্ষা করছিলাম। কেনেডি সাহেবের ফিটনটা পশ্চিম গেট দিয়ে বেরিয়ে এল। কেনেডি সাহেব ও কিংসফোর্ড সাহেবের ফিটন দুটো দেখতে একই রকম। তবে জজ সাহেবের ফিটনের চাকায় রবার আছে। একটু পরেই পশ্চিম দিকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম। ওদিক থেকে কেনেডি মেম সাহেবের গাড়িটা আসছিল। আমরা শব্দ লক্ষ্য করে সেদিকে ছুটলাম। কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাইনি। আমরা তখন ডাক বাংলোর দিকে ছুটলাম। ফিটনে দেখলাম দু'জন আওরৎ জখম হয়ে রয়েছে,

কাপড়ে আগুন। ডাক বাংলো থেকে এক সাহেব বেরিয়ে এলেন এবং ওঁদের জজ সাহেবের বাসায় নিয়ে যেতে বললেন। আমরা সবাই সেখানে গেলাম।

আওরং দু'জনকে যখন গাড়ি থেকে বের করা হ'ল তখন আমি ফিয়াজকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। দেখি, গাড়ীর সইস গেটের কাছে পড়ে আছে, ফিয়াজ তার শুশ্রূষা করছে।

বিস্ফোরণের পর আমি যেন দক্ষিণ দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে এমন দুটি ছায়া দেখলাম। শাদা পোষাক বলে মনে হ'ল। (ক্ষুদিরামকে দেখিয়ে বলল) যে দু'জন বাঙালিকে দেখেছিলাম এ তাঁদের একজন। যখন তাকে গ্রেপ্তার করে ক্লাবে আনা হয় আমি তখন থানায় ছিলাম। আমাকে বলা হল সাব-ইন্সপেক্টর বাবু আমায় ডাকছেন। সেখানে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এঁকে সনাক্ত করলাম। আসামীর কাঠগড়ায় যিনি আছেন ইনিই সেই লোক। ইনিই বলেছিলেন তারা কিশোরীবাবুর বাড়ী আছেন।

আর এক যে বাঙালি ছিলেন তাঁকে দেখলাম ববৌনি জংসনে তাঁর মৃত্যুর পর। আমি, ফিয়াজুদ্দিন ও আবদুল করিম লাশকে সনাক্ত করবার জন্য সাব-ইন্সপেক্টর বাবুর সঙ্গে কলকাতা যাচ্ছিলাম। এর মধ্যে পুলিস সাহেব ও ম্যাজিস্ট্রেটের জিম্মাদারিতে লাশ এসে পৌঁছোল ববৌনিতে। ক্ষুদিরামের সঙ্গী বলে আমি লাশটিকে সনাক্ত করলাম। আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এঁরা দুজন কি পোষাকে ছিলেন তার বর্ণনা দিলাম। ওদের চেহারারও। কিন্তু ঘটনাস্থলে যখন আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনায় আমি সে বর্ণনা দিতে ভুলে গেছি।

মিঃ উইলসনকে দেখিয়ে সাক্ষী বলল, এই ভদ্রলোককেই আমি ডাক-বাংলোতে দেখেছিলাম।

সাক্ষী বলল, ম্যাজিস্ট্রেটকে ববৌনি জংসনে আমার জবানবন্দী দিলাম। আমি সেখানে বলেছি, ডাকের বন্দীর সঙ্গে যিনি এখন মৃত আমি তাঁকে সার্ট পরা অবস্থায় দেখেছি।

বলা বাহুল্য, তহশিলদার খানের সাক্ষ্য যে আগাগোড়া বানানো, সাজানো, এটা বুঝতে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধি আইনজ্ঞের দরকার করে না। সে বোমা বিস্ফোরণের কাছে ছিল না। সুতরাং, সে বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষদর্শী নয়। সে ছুটে গেছে, শব্দ শুনে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায় নি। তারপর বলেছে দুটি ছায়ামূর্তিকে সে বিলীন হয়ে যেতে দেখেছে। কায়ারূপে তাদের দেখেছিল টহল

দেবার সময়। রাত সাতটার অন্ধকারে। বিজলী বাতির দিন নয়। কত আলো ছিল সেই টহল দেবার পথে? একবারই মাত্র তাঁদের দেখেছে ঐ অন্ধকারে। কিন্তু সনাক্তকরণের ব্যাপারে যেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, কোন্ ভাষায় কথা বলেছে, চেহারা কেমন, সব ঠিক ঠিক ঠাহর করে রেখেছে। স্পষ্টতই কিশোরীবাবুকে জড়াবার জন্যই ঐ সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে তার মুখে যে, বাঙালি বাবুরা বলেছেন, তাঁরা কিশোরীবাবুর বাড়িতে আছেন। একটা কনস্টেবলের এত কথা জানবারও নয়, মনে রাখবার কথাও নয়। বিহারী হিন্দী-ভাষীরা বাংলা শব্দ স্বভাবতই কিছু অন্য টানে অশুদ্ধ উচ্চারণ করেন; অশিক্ষিত কনস্টেবলের তো কথাই নেই।

আর ক্ষুদিরামকে সনাক্ত করা এমন কি শক্ত কথা? তাঁকে তো প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচরে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে সেখানে নেওয়া হচ্ছে, আদালত থানা-জেল হয়েছে। আশ্চর্য যা, তা হচ্ছে ববৌনি স্টেশনে মৃত প্রফুল্ল চাকীকে সনাক্ত করা।

প্রত্যেকটি ঘটনায় আরও লক্ষণীয়, নন্দলাল ছাড়া, প্রহরী, সাক্ষী, এমন কি, তল্লাসীর সাক্ষী নির্বাচনেও ইংরেজের কূটবুদ্ধি ভেদবুদ্ধি কাজ করেছে, নন্দলালকে বাদ দিলে সব বাঙালিই ছিল কার্জনী মতে সন্দেহভাজন এবং এজন্য বেছে বেছে সেই বঙ্গভঙ্গ আমলে প্রতিরোধ আন্দোলনে বিভেদ শলাকা ঢোকাবার জন্য অবাঙালি ও মুসলমান সাক্ষী ইত্যাদির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। বেফাঁস হয়ে যাবার কোন রন্ধ্রই রাখেনি শাসকেরা।

ক্রমশঃ দেখা যাবে, ক্ষুদিরামের বিবৃতি বা সাক্ষ্য ছাড়া, স্বতন্ত্র নির্ভরশীল সাক্ষ্য এতই সামান্য ছিল যে, সন্দেহের অবকাশে মামলা ভেস্তে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। এই সাজানো মামলার প্রয়োজনেই দুই কনস্টেবল, তহশীলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিন, রঙ্গমঞ্চে এসেছিল। তহশীলদার নেপথ্যে গেলে এলেন মিঃ উইলসন। কনস্টেবল কিন্তু এর নাম বলতে পারেনি, বলেছে এক সাহেব।

মিঃ উইলসন বললেন: আমি ডাকবাংলোর ঘরে বসে পড়ছিলাম। তখন রাত সাড়ে আটটা ন'টা হবে। আমি একটা নিদারুণ বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম। মুহূর্ত পরেই আর একটা শব্দ শুনলাম। আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় আমাকে একজন বলল, কাউকে গুলি করা হয়েছে। আমি দেখলাম লোকজন বেরিয়ে আসছে যার যার বাড়ী থেকে। আমি তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললাম, "পাকড়ো" "পাকড়ো"। আমি শুনলাম, জজবাড়ির পশ্চিম গেটে কে

একজন চীৎকার ক'রে বলছে : "মেম সাহেবকো মার দিয়া।" আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। দেখলাম, জজের বাংলোর পশ্চিম দিকে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোচম্যানকে তার আসনে দেখলাম।

গাড়ির ভেতরে দেখলাম দুজন মহিলা। ঘোড়ার দিকে মুখ রেখে একজনের মাথাটা গাড়ীর ডান পাশে ঝুঁকে পড়েছে, ভীষণ গোঙাচ্ছে, পরিচ্ছদে আগুন, দুটো হাতই গাড়ির বাইরে ঝুলছে। আর এক মহিলার মাথাটা, যেখানে সহিস বসে সেখানে, বাঁকা অবস্থায় শায়িতা। তাঁর পরিচ্ছদেও আগুন এবং তিনিও গোঙাচ্ছেন।

আমি মহিলাদের চিনতে পারলাম না। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম : কে আপনারা ? কোন জবাব পেলাম না। রাত্রিটা ছিল ঘোর অন্ধকার, গাড়ীর লম্ফে যে আলো ছিল তাও নিভে গেছে। আমি কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ গাড়ি কার ? সে বলল, কেনেডি সাহেবের। এরপর দেখলাম, ডানদিকে যে মহিলা ছিলেন তাঁর পরিচ্ছদ রক্তাপ্লুত। আমি কোচম্যানকে বললাম গাড়িটা জজ বাড়ির প্রাঙ্গনে নিয়ে চলো। আমি পেছন পেছন গেলাম। সিঁড়িতেই মিঃ কিংসফোর্ডের সঙ্গে দেখা। তিনি ডানদিকের মহিলাকে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন, আর একজনকে নিয়ে আসতে। আমি তাই করলাম। ওখানে একজন ছিল যাকে আমি পরিচ্ছদের আগুন নিবোতে বললাম।

আমি গাড়িটা চিনি। চারদিকে গাছ—স্টেশন ক্লাব থেকে ডাকবাংলো অবধি রাস্তার দক্ষিণে। ফলে, ছায়াপাত ঘটেছে জায়গাটায়। ঘটনাস্থলে মিঃ উডম্যান আমার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করলেন।

মিঃ কেনেডির কোচম্যান কালারাম তার সাক্ষ্যে বলল : আমরা যখন জজ বাড়ির পূব গেটে পৌঁছোলাম তখন দুটি লোক দক্ষিণে গাছগুলোর নীচ থেকে বেরিয়ে এল। তারা গাড়িটার কাছাকাছি আসতেই সহিস বলল, হঠ্ যাও ! কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দু'জনের একজন রোগামত, দুই হাতে একটা গোল জিনিস ছুঁড়ে মারল। গাড়িতে মেয়েরা বসেছিলেন সেইদিকে। রোগা লোকটির পেছনে যে লোকটি ছিল সেও একটা কি গোল জিনিস ছুঁড়ে মারল। দুজনের গায়েই শাদা সার্ট ও খালি মাথা। রোগা লোকটা গাড়ির দেড় হাত দূরে ছিল দক্ষিণ পানে। অন্য লোকটি তার পাশে ছিল দক্ষিণ পশ্চিমে হাত খানেক দূরে। ওদের মুখ খানিকটা দেখতে পেয়েছি। রোগা লোকটি ১৭।১৮

বছরের হবে, আর একটি বয়স কিছু বেশি হবে। আমি তাদের চিনতে পারিনি। (১)

শব্দটা প্রচণ্ড হয়েছে। ঘোড়াটা ছুটে পশ্চিমে ডাকবাংলোর দিকে যায়। চৌমাথায় আমি থামলাম এবং চেঁচিয়ে বললাম, "মেম সাহেবকো মার দিয়া।" সইস পড়ে গেছল।

আমার চীৎকারে শাদা পোষাকে দু'জন কনষ্টেবল ও একজন সাহেব সেখানে এলেন। মেম সাহেবের পোষাকে আগুন ধরে গেছল। কনষ্টেবলরা ও সাহেব আগুন নিবিয়ে দিল। সাহেব আমাকে জলদি গাড়িটা জজ বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। জজ দু'জন মহিলাকেই গাড়ির বাইরে নিয়ে এলেন। গাড়ির আলো নিবে গেছল।

প্রথমে যখন আমি বিবৃতি দিই তখন আমার মনে বিভ্রান্তি ছিল, তাই বলেছিলাম, একটি লোক, পরদিন সকালেও বলেছিলাম একটি লোক।

ক্ষুদিরাম নিজে জেরা করলেন। সাক্ষী বলল, আমি নিজে দেখেছি প্রত্যেকেই (অর্থাৎ দুজনই) একটি করে গোলাকার বস্তু ছুঁড়েছে। একথা সত্যি নয় যে, প্রথম লোকটি চার পাঁচ হাত দূরে ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট এখানে ক্ষুদিরামকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তিনি কিন্তু জেরায় একথা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, যে-লোক মিঃ কেনেডির গাড়ির কাছে ছিল সে লোক তিনিই। এ সবই তার বিরুদ্ধে যাবে। ক্ষুদিরাম একথায় থেমে যান এবং আর জেরা করেন না। (২) কিশোরী বাবুর উকিল জেরা স্থগিত রাখেন।

কনষ্টেবল ইয়াকুব বলল: আমি যখন মতিঝিল মহল্লায় ছিলাম তখন একটা প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। আমি ট্রেজারি গার্ডব্যারাকে থেকে আসছিলাম। আমি যখন দাতব্য হাসপাতালের দক্ষিণ-পশ্চিমে এলাম তখন রাস্তা দিয়ে দুটি লোককে পশ্চিম থেকে পূব দিকে রেল-ষ্টেশনমুখো ছুটে যেতে

---

(১) মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা ঘটলেও বেচারাম আততায়ীদের দুজনকে দেখেছে। গায়ে শাদা সার্ট দেখেছে, রোগা না মোটা তাও লক্ষ্য করেছে, শুধু তাই নয়, তাদের মুখ দেখে ঠিক ঠিক বয়স অনুমান করেছে। ক্ষুদিরামের ১৭।১৮, প্রফুল্ল চাকীর কিছু বেশি। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীরা নিজেদের বয়সই বলতে পারে না, এই আমাদের অভিজ্ঞতা।

(২) এ আমাদের পরম লজ্জা যে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে কোন উকিল পাওয়া যায়নি বা দাঁড়াননি। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে ধন্যবাদ, তিনি সেই দুঃসময়েও ক্ষুদিরামকে ক্ষতিকর জেরা থেকে নিরস্ত করেছিলেন। আদালতের বাইরে বিবৃতি এক কথা, আদালতের ভেতরে আর এক কথা।

দেখলাম। আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। লোক দুটো রাস্তার দুদিকে ছিল। দৌড়োচ্ছিল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম: দৌড়োচ্ছো কেন? একজন জবাব দিল: একটি লোক চলে যাচ্ছে। (এর পর সাক্ষী ওদের পরিচ্ছদের যে বর্ণনা দিল তাতে আগের সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমর্থন পাওয়া যায়)। তাদের কথাবার্তা থেকে আমি বুঝতে পারলাম তারা কোন্ শ্রেণীর লোক। সে সময় আমার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। আমি পুলিস সাহেবকে বলেছি, তারা ধর্মশালার দিকে যাচ্ছিল। আমরা সবাই মিলে পুলিস সাহেবের সঙ্গে ধর্মশালায় গেছলাম। জেরা স্থগিত থাকে।

এদিনকার শেষ সাক্ষী আবদুল করিম। সে বলল, আমার তারিখটা মনে আছে ৩০ এপ্রিল। কাঠগড়ার এই ক্ষুদিরামকে আমি এর আগে ২৯ এপ্রিল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ র‍্যাকেট (Racquet) হাউসের দক্ষিণে দেখেছি। তার সঙ্গে আরও একটি লোককে দেখেছি। দু'জনই বাঙালি। আমি টাউন ক্লাবের একজন সভ্য। আমি ফুটবল খেলছিলাম। ফুটবল মাঠের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দু'তিন "লোগ" দূরে দুজনকে বসে থাকতে দেখেছি। আগে তাদের কখনও দেখিনি। আমি তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কোত্থেকে আসা হচ্ছে? ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, তাঁরা নৈহাটি থেকে এসেছেন। আমি বললাম, ক্লাবে গিয়ে বসুন না, নয়তো আসুন, খেলি। ক্ষুদিরাম বললেন, তিনি খেলবেন না। অন্যজন বললেন, তিনি কাল খেলবেন। ৩০ এপ্রিল আমি দীর্ঘতর লোকটিকে দেখলাম। তাকে আদালতে দেখছিনে। লোকটি জজ-বাড়ির গেটের বিপরীত ভাগে কোনাকুনি মাঠ পার হয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে খেলায় যোগ দিতে বললাম। সে বলল, তার সঙ্গী এখনও আসেনি, সে এসে গেলে খেলবে। দেখলাম যে, র‍্যাকেট হাউসের কাছাকাছি বসল। আধ ঘণ্টা পর, ক্ষুদিরামকেও দেখলাম। সে রাত্রে আমি সাড়ে সাতটা পৌনে আটটায় ক্লাব থেকে চলে আসি। টাউন ক্লাব থেকে কোনাকুনি ময়দান পার হয়ে এলাম। যখন ষ্টেশন ক্লাবে পৌঁছোলাম তখন আমি দুই ক্লাবের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তার ধারে একটা খালের ধারে ঐ দুটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমি চলে গেলাম। ওদের কিছু বললাম না।

সাক্ষী লোক দুটির পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়ে বলল, আধ ঘণ্টা পর বাড়ি থেকে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনি। ভাবলাম, ও বোধ হয় দিনাপুর সময় সঙ্কেতের কামান গর্জন।

আমি স্টেশনে গেছি। দুটি লোকের একজনকে সনাক্ত করেছি। আমি স্টেশন ক্লাবে গিয়ে মিঃ উডম্যানকে সব কথা বলেছি। বরৌনিতে গিয়ে আমি বারহাব (Bahr) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অন্য লোকটির লাশ সনাক্ত করেছি।

২২ মে, দ্বিতীয় দিনের শুনানীকালে মিঃ কিংসফোর্ড বললেন, আমি ১৯০৪-এর আগস্ট থেকে ১৯০৮-এর মার্চ অবধি সি-পি-এম (চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট) ছিলাম। অনেক রাজদ্রোহের মামলা করেছি। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্‌' ও অন্যান্য সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে। যত ছেড়েছি, তত দণ্ড দিয়েছি। আমার ধারণা, এসব মামলা শুরু করার আগেই আমি বিরাগভাজন হয়েছিলাম। আমি কলকাতা আসবার আগে 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতো কাগজগুলো আমার খুব অপযশ ছড়িয়েছে। যখন আমি রাজদ্রোহের মামলা করি তখন 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায় আমার নামে খুব প্রচার হয়। আমি ওসব কাগজের এমন অসংখ্য লেখা পড়েছি। তাতে থাকত অশালীন গালমন্দ। আমি ২৬ মার্চ মজঃফরপুরে আসি। ঘটনার পর জানতে পারলাম, আমাকে রক্ষার জন্য পুলিস ব্যবস্থা নিয়েছিল। ঘটনার রাত্রে আমি ক্লাবে সাড়ে আটটা অবধি ছিলাম। সন্ধ্যাটা ক্লাবেই কাটিয়েছি। আমার গাড়িটা এক ঘোড়া টানা ল্যাণ্ডোলেট। আমার ও মিঃ কেনেডিরটা একই ধরণে তৈরি। কেনেডির ও আমার ঘোড়া দুটো ছিল দ্রুতগতির ঘোড়া। আমার স্ত্রী ক্লাবে ছিলেন। আমরা একসঙ্গে সাড়ে আটটায় বেরিয়ে এলাম। মিসেস ও মিস কেনেডি আমাদের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। আমি তাদের চলে যেতে দেখিনি। আমরা যখন ক্লাব-গেটের ২০ গজের মধ্যে রয়েছি তখন আমি একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম, দেখলাম একটা ঝলকানি। জায়গাটা ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। রাত্রিটা ছিল ঘোর অন্ধকার। আমরা অবশ্য চলতে লাগলাম। বাড়ির ওপর আমার যে গেটটা, অর্থাৎ যে গেট দিয়ে আমি সচরাচর যাতায়াত করি, সেখানে কি একটা জ্বলতে দেখলাম। আমি বুঝিনি যে, বিশেষ কিছু ঘটেছে, সুতরাং, আমি বাড়ি চলে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আমি আমার আর একটা গেট, অর্থাৎ পশ্চিম গেটের দিক থেকে একটা চীৎকার শুনলাম। চীৎকারটা একটি গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছিল। শুনলাম কে হাঁকছে, "জজ সাহেব!" কণ্ঠস্বর কোন ইউরোপীয়ানের। আমি এ চীৎকারও শুনলাম: "বাঙালি লোক মেম সাহেবকো মার দিয়া।" গাড়িটা থামলে উইলসন নামলেন। আরও পাঁচজন কারা এল, তাদের মধ্যে একজনকে মনে হল কনস্টেবল।

তারপর দেখলাম গাড়িতে মিসেস ও মিস কেনেডিকে ভীষণ আহতাবস্থায়। উভয়েই কার্যতঃ অচেতন। মিস কেনেডির শরীর আগাগোড়াই শায়িত অবস্থায় ছিল। আমি ও উইলসন ধরাধরি করে মহিলাদের আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। আমি প্রথমে মিসেস কেনেডিকে নিয়ে যাই। মিস কেনেডিকে নিয়ে যেতে উইলসন আমাকে খানিকটা সাহায্য করেছিলেন। তারপর আমি গাড়ি ক'রে সিভিল সার্জেনের বাড়ি গেলাম। তারপর গেলাম উডম্যানের বাড়ি। তাঁকে পেয়ে আমার গাড়িতে তুলে নিলাম। আমরা মিঃ আর্মস্ট্রংয়ের খোঁজে বেরোলাম। পথেই পেলাম। তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে এলাম। আমি যখন ফিরলাম, দেখলাম, সিভিল সার্জেন এসে গেছেন। আমার বাড়িতে ফেরবার পরে পরেই মিস কেনেডি মারা গেলেন। মিসেস কেনেডি তখনও বেঁচে। পরদিন আমি বাঁকীপুর গেলাম। আমি মতিহারীতে যাবার পথে মজঃফরপুর স্টেশন ছুঁয়ে যাওয়া ছাড়া মজঃফরপুরে ফিরিনি। তখন আমি আমার বাড়ি যাইনি। আমি মজঃফরপুর স্টেশনে মিসেস কেনেডির মৃত্যু সংবাদ শুনি।

বারহার মহকুমা-হাকিম বাবু জ্যোতিষচন্দ্র সেন তার জবানবন্দীতে বলেন. ২ মে'র রাত্রি। মিঃ সোয়েইন আমাকে বললেন, মোকামে স্টেশনে যে মানুষটি আত্মহত্যা করেছে তার দেহটি আনবার জন্য, প্রয়োজন হ'লে মোকামে থেকে মজঃফরপুরে। সনাক্তকরণ বরৌনি জংসনে হ'তে পারে। সনাক্তকরণ হ'ল। এই সেসব ফটোগ্রাফ দেহটির। এগুলো আমার সামনেই তোলা হয়। তিনজন সাক্ষী ছিল। প্ল্যাটফর্মের যেখানে দেহটি ছিল সেখানে তাদের এক এক করে আনা হয়। আমি সে-সময় নোট নি। করিম ছিল প্রথম সাক্ষী। প্রথমে সে বলল, ফুলে গেছে বলে সে চিনতে পারছে না। আর দু'জন সাক্ষীর জবানবন্দী তার সামনে নেওয়া হলে, সে বলল, সেও চিনতে পারছে, এ হচ্ছে সেই দুজনের একজন যে দুজনকে সে ঘটনার দিন বেলা সাড়ে পাঁচটায় জজ-বাড়িতে দেখেছিল। কনস্টেবল তহশীলদার খান সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল, এই সে দুটির একটি লোক যারা ৩০ এপ্রিল রাত সাতটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হ্যাঁ, এই লোকটির গায়েই শাদা সার্ট ছিল। পরের সাক্ষী ফৈজুদ্দিন। সেও তৎক্ষণাৎ দেহটি চিনতে পারল—৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে সাতটায় যে দুটি লোক ক্লাবের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই সার্টপরা লোকটি তাদের একজন। সাক্ষীদের দূরে দূরে রাখা হয়েছিল এবং একজনের পর আর একজনকে আনা হয়েছিল। আমরা বরৌনিতে পৌঁছোবার পরই সনাক্তকরণ শুরু হয়। সুতরাং

সাক্ষীদেব পরস্পরের সঙ্গে পবামর্শ কববার কোন অবকাশ মেলেনি। কনস্টেবল-দেব শব সনাক্তকবণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েছে এবং তাবা সবাই বলেছে, তাবা সুনিশ্চিত।

কনস্টেবল ফৈজুদ্দিন প্রধানতঃ তহশীলদাবেব সাক্ষ্যই সমর্থন করে।

কেশবলাল চ্যাটাজি বলেন, কাঠগড়াব আসামীকে আমি চিনি। আমি সকালে তাঁকে সেকেন্দাবপুব ময়দানে দেখেছি। তাবিখটা মনে আছে। ১০ই। হিন্দুদেব কি একটা ছুটিব দিন, অফিস বন্ধ ছিল। এঁব সঙ্গে আরও একজন ছিল, বাজেন্দ্রলাল মিত্র। পুবোনো চাঁদমাবিব শেষ গাছটির নীচে মানুষটি বসে ছিল। অপবিচিত বলেই মনে হ'ল। জিগ্যেস কবলাম, আপনি কে বটেন? তিনি বলেন, আমি বাবাণসী যাচ্ছি, একজন পযটক, টাকা চুবি গেছে। বললাম, এতো ব্রাঞ্চ লাইন, মেন লাইন তো নয়। জিজ্ঞেস কবলাম, কি কবে এখানে এলেন, কোত্থেকে এলেন? তিনি মেদিনীপুব, না, ফবিদপুব বললেন ঠিক মনে নেই। তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন ছাত্র। আমি জিজ্ঞেস কবলাম, কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কি? তিনি বললেন, না, তিনি ধর্মশালায় আছেন। বাড়ী পালিয়েছে বলে আমি সন্দেহ কবলাম, মজঃফবপুবে প্রায়ই এরকম আসে। তিনি কে বলবাব জন্য চেপে ধবতে বললেন, সবাইকেই ঘব-পালানো মনে কবেন কেন? আমি ভাবলাম, এবাব ভেগে পড়াই ভাল, যদি কিছু চেয়ে বসে।

তাঁকে গ্রেপ্তাবেব পব যখন তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালতে আনা হল তখন আমি তাঁকে কাঠগড়ায় দেখেছি। তক্ষুণি আমাব মনে হ'ল, একে যেন কোথাও দেখেছি। একটু ভেবে এই উপসংহাবে এলাম যে, এই সেই লোক যাকে আমি ১০ তাবিখে দেখেছি। আমি তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু মনসারঞ্জন সেনকে সব বললাম, তিনি আমাকে তক্ষুণি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে খবব দেবাব জন্য পবামর্শ দিলেন। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে খবব দিলাম।

সাক্ষীকে জেবা কবতে চান কিনা ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞেস করা হ'লে ক্ষুদিবাম বলেন, কি জিজ্ঞেস কবব। আমি তো তখন মেদিনীপুব ছিলাম।

তাবপর তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিক বলছেন, তাবিখটা দশোই?

সাক্ষী বললেন, তাবিখটা যে দশোই, এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

মজঃফবপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ সি উডম্যান এর পরের সাক্ষী। তিনি বললেন, ঘটনার সময় আমি বাড়ি ছিলাম। আমি একটা বিস্ফোরণেব

আওয়াজ শুনেছিলাম। আমার বাড়িটা মাইলটেক দূরে। তখন রাত্রি সাড়ে আটটার কিছু পর।

মিঃ কিংসফোর্ড স্বয়ং গাড়ি করে আমার বাড়ি এলেন। তিনি বাড়ির চাকরদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনে বেরিয়ে আসি। তখন ৯টা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। তিনি আমাকে বললেন, একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আমরা যখন গাড়ি করে যাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে সব বৃত্তান্ত বললেন। এসে প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, বোমা বিস্ফোরণে দু'জন মহিলা আহত হয়েছেন। পথে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা, তাঁকে তুলে নিলাম, তারপর ঘটনাস্থলে গেলাম। গাড়ির টুকরোটাকরা দেখলাম, আসনগুলো এলোমেলো, ছেঁড়া ছেঁড়া কাপড়। এই দেখে আমরা মহিলা দু'জনকে দেখতে গেলাম। মিস কেনেডি অতি দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। মিসেস কেনেডিও কিছু বলতে পারছিলেন না। কমিশনারের উদ্দেশে তারবার্তা পাঠালাম, বাজ সরকার ও আরও কারও কারও নামে। আমি গেটের বাইরে সইসকে দেখতে গেলাম। সইস নিম্নাঙ্গে আহত হয়েছিল। একটা টেবিল আনালাম, কাগজ, চেয়ার ইত্যাদি। একটা স্লিপে সইসের বিবৃতি লিখলাম এবং তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। আমি হাসপাতাল গেলাম এবং আবার সইসকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম—যদি তার নতুন কিছু বলবার থাকে। মাথার ওপর আচমকা চোট পেয়ে সে ছিল কাতর, অবস্থাও ছিল উদ্বেগজনক। কোচম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কোচম্যানকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। উইলসন, তহশীলদার খান ও ফৈজুদ্দিনের বিবৃতিও নিলাম।

বিবৃতি নেবার সময় কিছুক্ষণ বিরাম দিতে হয়েছিল, ডাকবাংলোয় গেছলাম। আর একবার এক হেড কনস্টেবলের জন্য কিছু বাধা পেয়েছিলাম। সে এসে বলে, সে একটা জুতো পেয়েছে। টেবিল থেকে একটা ল্যাণ্টার্ন তুলে নিলাম, খাল পেরিয়ে বড় গাছটার নীচে এলাম, হেড কনস্টেবল কাঁকর স্তূপের দক্ষিণে জুতোটা দেখিয়ে দিল। জুতোর কাছে একটা চাদরও পাই। আরও তিনটি জুতো পাওয়া গেল। ওর মধ্যে প্রথম জুতোর আর এক পাটি। বড় গাছটার কাছে আলাদা আলাদা পড়ে ছিল। চাদরটায় মস্ত এক ফুটো, ২নং নিদর্শনের মতই। এসব জিনিস পাবার পর আমি ফিরে গেলাম জজের বাড়ি। এরপর বাড়ি চলে গেলাম এবং মাঝরাতের কিছু পর আবার এলাম এখানে। এরপর টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম, পুরস্কার ঘোষণা করে নানা জায়গায়

টেলিগ্রাম পাঠালাম। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললাম, তিনি একটা বিবরণ শহরে প্রচার করুন।

জুতোগুলো পাবার পর আমি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ঘটনাস্থলের একটা স্কেচ-ম্যাপ করতে বললাম। আমি স্টেশনে গেলাম, কনস্টেবলদের পাঠিয়ে দিলাম। আরো কিছু ব্যবস্থাবিধি করে আমি রাত দুটো কি তিনটেয় বাড়ি ফিরলাম। গাড়িটা পরীক্ষা করতে গেলাম। কোচম্যান, আব্দুল কবিরের বিবৃতি নিলাম এবং হাসপাতালে গিয়ে সইসের বিবৃতি নিলাম। কোচম্যানের জবানবন্দী নেবার পর কনস্টেবল ইয়াকুব আলিরও জবানবন্দী নিলাম। মিস কেনেডি সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছলেন। ওয়েইনি স্টেশনে গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনলাম বেলা চারটেয়। সন্ধ্যা ৬-২০ মিনিটে স্টেশনে গেলাম, ট্রেনটা পাওয়া গেল, ক্ষুদিরামের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য পুলিস দেখলাম। আমি আমার কাছারীতে এলাম। তালাবন্ধ ছিল। ক্লাবে গেলাম। আমাকে বলা হল যে, আসামী বিবৃতি দেবে। আমি তক্ষুণি ক্লাবে বিবৃতি নথিবদ্ধ করলাম। আমি ক্লাবে গেছলাম, কেননা, ওটাই ছিল নিকটতম জায়গা। বন্দীকে একটা ফিটনে করে স্টেশন থেকে ক্লাবে আনা হয়। কোন চাপ না দিয়েই ঐ বিবৃতি পাওয়া যায়। বন্দীর বিবৃতি বেশির ভাগ ছিল বাংলায়, সামান্য কিছু ইংরেজী শব্দ। একটু সাহায্য নিয়ে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। আমি যা নথিভুক্ত করেছি সে সম্বন্ধে আমার আস্থা আছে। আমি এক বাঙালি ইন্সপেক্টরকে দিয়ে আমার উপস্থিতিতে বন্দীকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলাম। বন্দী বলেছে ঠিক আছে। আমি রাতে যে দুটি কনস্টেবলের বিবৃতি নিয়েছিলাম এবং এ-ছেলেটি যেচে সাক্ষ্য দিয়েছিল তারা সবাই বন্দীকে এই বলে সনাক্ত করে যে, ঘটনার আগে তারা যে দুজনকে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখেছে এ তাদেরই একজন।

আমি সাদা পোষাকের কনস্টেবল ফৈজুদ্দিনের ও তহশীলদার খাঁনের আরও খানিকটা বিবৃতি নিয়েছি।

ক্ষুদিরাম দীনেশ রায়ের শব সনাক্ত করলেন

পরদিন আমি কনস্টেবল শিউপ্রসাদ ও ফতে সিংয়ের বিবৃতি নথিভুক্ত করলাম। এরাই বন্দীকে ওয়েইনি স্টেশনে ১ মে তারিখে গ্রেপ্তার করেছিল। যে মানুষটি নিজেকে গুলি করে মেরেছে তার শব আনা হল। আমি স্টেশনে

গেছলাম। ক্ষুদিরামকে দিয়ে দেহটি সনাক্ত করালাম। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ক্ষুদিরামের বিবৃতি নথিবদ্ধ করলাম। পড়ে শোনালাম, বললেন ঠিক আছে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ বিবৃতি স্বেচ্ছায় দেওয়া। আমি সার্টিফিকেটটা গেঁথে দিই নি, আমি মনে করিনি ওটার দরকার আছে। আমি মনে করি ওটা পরিপূরক মাত্র। আমি তারপর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে গেলাম। ধর্মশালার যে ঘরে বন্দী থাকত সে ঘরটা দেখিয়ে দিল। ঘরটা তালাবদ্ধ ছিল। নানারকম জিনিস পাওয়া গেল। ৯ তারিখে বিস্ফোরকের ইন্সপেক্টর এলেন। আমি তাঁর হাতে টিনের বাক্সটা অর্পণ করলাম। আমি কে চন্দ্রকে এক জোড়া জুতো জেলে বন্দীর পায়ে পরিয়ে দেখতে বললাম। কলকাতা থেকে কিশোরী-মোহন ব্যানার্জির প্রযত্নে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে যে টাকা এসেছিল তার মনি অর্ডার ফরমটা পাঠাবার জন্য ৬ তারিখ পি এম জিকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। বিস্ফোরক ইন্সপেক্টর সযত্নে গাড়িটা, বাক্সটা, থলেটা, বোমার টুকরোগুলো পরীক্ষা করলেন। আমার উপস্থিতিতে তাঁকে ওগুলো দেওয়া হয়েছিল। আমি ২ মে কে এল চ্যাটার্জির বিবৃতি নি।

সাব-ইন্সপেক্টর জে শারন (J. Saran) থানার ডায়েরী এনে প্রমাণ করেন যে, তহশীলদার খান ও ফিয়াজুদ্দিন কনস্টেবলকে ২৭ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন ডেপুট করা হয়েছে। ২৩এ দুজন কনস্টেবলকে সন্ধ্যা ছটায় টহল দেবার জন্য ডেপুট করা হয়েছিল। ৩০এ একা তহশীলদারকেই ডেপুট করা হয়েছিল। ২৬এ আর একজন টহল দিয়েছিল।

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ফতেসিং বলল, আমি বন্দী ক্ষুদিরামকে চিনতে পারছি। আমি তাকে ওয়েইনি স্টেশনের বাইরে দেখতে পাই। ১ তারিখে এক মুদির দোকানে দেখতে পাই। আমি মজঃফরপুর থেকে সকাল ১টার ট্রেনে এক সাব-ইন্সপেক্টর, ৮ কনস্টেবল ও এক হেড কনস্টেবলের সঙ্গে যাই। ৩০ এপ্রিল রাত্রে আমি ও শিউপ্রসাদ ওয়েইনিতে নেমে পড়ি, এখানেই আমাদের মোতায়েন করা হয়েছিল। ঠিক ভোরে আমরা সেখানে পৌছোই। আমরা যে ট্রেনে এলাম সে ট্রেনটা তল্লাস করলাম। কাউকে পাইনি। ট্রেনটা চলে গেল, আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল সাড়ে সাতটায় আর একটা ট্রেন। খোঁজ করলাম, কেউ নেই। আমাদের যে দুটি বাঙালির বিবরণ দেওয়া হয়েছিল তাদের খালি পা, একজনের ডোরাকাটা কালো কোট, আর একজনের শাদা সার্ট গায়ে, বয়স ১৮। আমরা সাধারণভাবে বিবরণ মিলিয়ে দেখলাম।

স্টেশন থেকে পনের গজ দূরে আমরা জিতুরামের দোকানে গেলাম। দেখলাম বন্দী জল খাচ্ছে। আমাদের দুজনের শাদা পোষাক। আমার ছিল এম্যুনিশন বুট। আর এক কনস্টেবলের ছিল খালি পা। বন্দী আমাদের কাছে দেওয়া বিবরণের সঙ্গে মিলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছেন, কোত্থেকে এসেছেন? তিনি বললেন, পূব থেকে আসছি, তেজপুর থেকে, যাচ্ছেন বাঁকীপুর। আমি বললাম এখানে কেন নামলেন? আপনাকে তো মজঃফরপুরে বদলি করতে হবে।

আমি যখন তাকে দেখি, তিনি তখন মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাছেই ছিল এক ঘটি জল। তিনি বললেন বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল। জল খেতে নেমেছি, বলেই দিলেন দৌড়। আমরা দুজন পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরলাম। যখন জাপটে ধরলাম তখন তাঁর কোমর থেকে একটা পিস্তল পড়ে গেল। আমরা তাকে বেঁধে ফেলবার আগেই তিনি আর একটা রিভলভার নিলেন। আমরা দুজনে তাও কেড়ে নিলাম। এরপর তাঁকে তালাস করলাম। এখন যে পোষাকে সে পোষাকেই ধরা পড়েছেন। এই কালো কোট, এই সার্ট। এখন যে কুর্তা পরে আছেন তাতেই ছিল কিছু কার্তুজ আর কিছুটা ছিল কোমরে ধুতি জড়ানো। সব জিনিস একত্র করে আমাদের চাদরে বাঁধলাম, তাকে রেল স্টেশনে নিয়ে এলাম। পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেটের নামে তার পাঠালাম। পুলিস স্থপার এলেন বিকেল সাড়ে তিনটায়। বন্দীকে তাঁর হেফাজতে দিলাম, দিলাম বাণ্ডিলটাও। ঐদিনই আমরা সন্ধ্যা ছটায় মজঃফরপুর এলাম। পরদিন সকালবেলা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিবৃতি লিখে নিলেন।

মজঃফরপুরের সিভিল সার্জেন কর্ণেল গ্রেঞ্জার (Col. Granger) বোমাহত মহিলাদের পরীক্ষাসংক্রান্ত সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন বোমার আঘাতেই তাঁরা আহত হয়েছেন। কিন্তু তার বিবরণ এতই পীড়াদায়ক যে তিনি না-প্রকাশের অনুরোধ জানালেন।

ফতে সিংহের সঙ্গে যে আর এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবল গেছল সেই শিউপ্রসাদ মিশিরেরও সাক্ষ্য নেওয়া হল, সে ফতে সিংয়ের কথাই সমর্থন করল।

ধর্মশালায় এক দাওয়াইখানা ছিল, তার কম্পাউণ্ডার ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি নাকি ঘটনার আগের দিন পান-লেমনেডের দোকানে দুটি বাঙালিকে দেখেছিলেন। ঘটনার ১০।১৫ দিন পর পুলিস স্থপার ধর্মশালায়

ক্ষুদিরাম ও দীনেশের ফটো দেখিয়েছিলেন। এঁদেরও তিনি পান-লেমনেডের দোকানে দেখেছিলেন বলে চিনতে পারলেন। কাঠগড়ায় ক্ষুদিরামকেও তিনি সনাক্ত করলেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর চন্দ্র বললেন, ৬ মে তিনি জেলে যান এক জোড়া জুতো ক্ষুদিরামের পায়ে লাগে কিনা যাচাই করতে। তাঁর সম্মুখেই ক্ষুদিরাম জুতো জোড়া পরেছিলেন। ঠিক লেগেছিল। ক্ষুদিরাম নিজেই বলেছেন, ও তারই।

ডাঃ এস সি ব্যানার্জি বললেন, আমি ১১ এপ্রিল মিঃ কেনেডির সইস সঙ্গতকে পরীক্ষা করেছি। তিনি আটটি ক্ষতের বিবরণ দেন। বলেন, কোন ভোতা হাতিয়ারের আঘাতে এগুলো হয়ে থাকবে। সইস এখনও হাসপাতালে আছে। সে তার কাজ করতে অক্ষম।

নাটের অন্যতম নায়ক নন্দলাল ব্যানার্জি বলল: সিংভূম থেকে ছুটি নিয়ে আমি ৩০ এপ্রিল মজঃফরপুর ছিলাম। আমি ১ তারিখ সকাল বেলা বাঙালিদের কাণ্ড শুনলাম। ১ তারিখ আমি ট্রেনে মজঃফরপুর থেকে সিংভূম ফিরছিলাম। সমস্তিপুরে যিনি এখন মৃত তাঁর সঙ্গে আমার রেল প্ল্যাটফর্মে দেখা হয়ে যায়। নতুন পাঞ্জাবী, নতুন ধুতি, নতুন পাম্পস্যু, খালি মাথা। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কখন গাড়ী ছাড়ে? আমি এই সুযোগে আলাপ জমালাম। তাঁর সঙ্গে ছিল মোকামাঘাটের টিকিট। আমরা দুজন একই কামরায় উঠলাম। তাঁর কথা বলার ধরণ ও চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। ট্রেন সমস্তিপুর ছেড়ে যাবার আগে আমি আমার দাদামশাই, মজঃফরপুরে সিনিয়ার গবর্মেন্ট প্লীডার ও প্রবীণ সরকারী উকিল শিবচন্দ্র চাটার্জিকে এই বলে এক তার করি, সন্দেহবশে লোকটাকে গ্রেপ্তার করবার অধিকার দেবার জন্য তিনি যেন পুলিস সুপারকে বলেন। ২ মে সকাল সাড়ে দশটায় মোকামেয় নেমে পড়ি। ঐ মানুষটিও আমার সঙ্গে মোকামে স্টেশনে আসেন এবং আমার প্রশ্নে প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে আর একটা কামরায় গিয়ে ওঠেন। আমি এজন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মোকামে স্টেশনে তাকে আমার জিনিসগুলো দেখতে বলি। তারপর সোজা চলে যাই স্টেশন মাষ্টারের অফিসে ওকে গ্রেপ্তারের জন্য দুটি লোক আনতে। (অবশিষ্টাংশ ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য মাত্র) আমি শব আগলে সেই রাত্রেই মজঃফরপুর গেলাম। এস ডি ও এবং পাটনার এস পি শবের সঙ্গে এলেন। বরৌনিতে শবটির ফটো নেওয়া হ'ল এবং সনাক্তকরণ হ'ল।

সাব-ইন্সপেক্টার শর্মা তাঁর সাক্ষ্যে যা বলেছেন তা ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য, পুনরুক্তি

নিষ্প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সন্ধ্যার ট্রেনে শব সরিয়ে আনা হ'ল রেল স্টেশনে। এই সময় পাটনার এস-পি মিঃ সোয়েইন (Swaine) এলেন। ফটো নেওয়া হল শবটির ঐ রাত্রেই খুব জোরালো আলোর সাহায্যে।

১টায় এস পি, এস ডি ও, নন্দলাল, আমি ও কনস্টেবলরা শব নিয়ে মজঃফরপুরের ট্রেনে উঠলাম। ফটোগ্রাফারও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা সকাল সাড়ে সাতটায় বরৌনি পৌছোলাম। সকালে আবার শবটির ফটোগ্রাফ নেওয়া হ'ল।

সঙ্গং সইসকে আদালতে একটি চেয়ারে করে আনা হল, তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ। সে বলল, সে কেনেডি সাহেবের গাড়িতে ছিল, ক্লাব থেকে ফিরছিল, রাত ৮টা হবে, গাড়িতে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। গাড়িটি যেই জজ সাহেবের পূবের গেটের বিপরীত দিকে এসেছে, অমনি একটি লোক একটা গোল বল গাড়ির দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি তার মুখ দেখিনি। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: 'হেই—হেই।' আমি আর একটি লোককে দেখিনি। আমি শুধু একটি লোককে গাড়িতে একটা গোলা ছুঁড়তে দেখেছি। বিস্ফোরণ হয়েছিল। আমি অচেতন হয়ে পড়ে যাই। আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম আমি জজ সাহেবের গেটের কাছে পড়ে আছি। কালেক্টর সাহেব আমাকে হাসপাতালে পাঠান। সেখানে এখনও আমি চিকিৎসাধীন আছি।

মামলায় যাকে বলা হয় 'মেটিরিয়াল উইটনেস' বা প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই সহিসটি তেমনই একজন সাক্ষী। সে একেবারে ঘটনা ও দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিল, নিজে আহত হয়েছে। সাধারণ লোকের সময় জ্ঞান থাকে না। তবু যাহোক তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাত আটটা বলানো গেছে। কিন্তু অন্যান্য অনুগতভাষী সাক্ষীদের মতো সেই অন্ধকারে যুবক দুটির হুবহু বয়স, পরিচ্ছদ, বর্ণ ইত্যাদির বর্ণনা সে দিতে পারেনি। সে বলেছে, একটি লোক, কিন্তু তার মুখ সে দেখেনি। দ্বিতীয় লোককেও সে দেখেনি। সাধারণভাবেই বলেছে গোল বল। শিখিয়ে পড়িয়ে গোল বল পর্যন্ত বলানো গেছে, বোমা নয়। ওটা ফাটবার কথাও সে বলেছে। তারপরেই সে অচৈতন্য।

এই সাক্ষ্য থেকে কাউকে জড়ানো যায় না—না ক্ষুদিরামকে, না দীনেশ রায় ওরফে প্রফুল্ল চাকীকে। আততায়ীকে বা আততায়ীদের কেউ দেখেনি। এই সাক্ষীর ওপর মামলা দাঁড়ায় না অথচ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে সইসের সাক্ষীই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, কোচম্যানের দৃষ্টি ঘোড়া ও পথের দিকে

নিবদ্ধ, সইসেব দৃষ্টি শুধু পথের দিকে, তার দৃষ্টিপথ প্রশস্ততর। এই সাক্ষ্যের ঘটনাব ওপবও সামান্যই আলোকপাত কবে, আততায়ীদেব ওপব সে-সামান্যটুকুও কবে না।

পুলিস ইন্সপেক্টবেব পদভাব-প্রাপ্ত জামিরুল হোসেন ধর্মশালায় সেই কক্ষটি তালাসার জন্য যান যে কক্ষটি ক্ষুদিবাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখিয়েছিলেন। দবজাটায় তালা লাগানো ছিল। আমবা দবজা ভেঙে ঢুকলাম এবং যে জিনিসগুলোব কথা আগেই বলা হয়েছে সেগুলো পেলাম। এই থলি কবে বোমা আনা হয়েছে বলে ক্ষুদিরাম বলেছেন। মোকামে থেকে যে মৃতকে আনা হয়েছিল আমিই তাব পায়ে জুতো লাগিয়ে দি। ঠিক লেগে যায়। ৩০ তাবিখে বাত্রে কিশোবীমোহনেব বাড়ি গেলাম। কিছুই পেলাম না। কোন অপবিচিত লোক তাঁর কাছে এসেছিল একথা তিনি অস্বীকার কবলেন। আমি জিজ্ঞেস কবেছিলাম ১৮।২০ বছবেব কোন অপবিচিত বাঙালি তাঁব বাড়িতে এসেছিল কিনা এবং তিনি তাদেব জানেন কিনা। তিনি বলেন, অপবিচিত কেউ আসেনি, তিনি এমন কোন অপবিচিতেব কথা জানেনও না। এ ছাড়া, ৫ তাবিখে আব কিছু জিজ্ঞেস কবেছিলাম কিনা আমাব মনে নেই। আমি ডেপুটি সুপাবিন্টেণ্ডেন্টেব সঙ্গে তাঁব বাড়ি তালাসীতে গেছলাম। সেখানে পৌছোলে তাঁকে ডেপুটি সুপাবিন্টেণ্ডেন্ট জিজ্ঞেস কবেছিলেন ক্ষুদিবাম ও দীনেশচন্দ্র বায়কে চেনেন? তাঁদেব চলাফেবাব খবব বাখেন কিছু? তিনি বলেন, তাঁদেব সঙ্গে তাঁব কোন সম্বন্ধ বা কাববাব নেই। দীনেশচন্দ্র বায় সম্পর্কে সব কথা অস্বীকাব কবলে তাকে গেপ্তাব কবা হয়। অন্যান্য কাগজেব সঙ্গে তাব কাছে একটা মনিঅর্ডাব কুপনও পাওয়া যায়। ঠিকানাসহ আব একটা কাগজ, দুটি বাংলা গান, একটা ছাপা, একটা হাতে লেখা।

পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটুকু

যাঁবা গবর্ণমেণ্টকে ভয়ংকব মূর্তি ধাবণের পবামর্শ দেন তাঁবা গবর্ণমেণ্টেব বন্ধু নন, শত্রু। পীড়ন নীতি কি সবনাশা পবিণতি ডেকে আনতে পাবে তা দেখবাব চোখ তাদেব নেই। দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টিব জন্য কর্তৃপক্ষ কি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কবেন নি?

"They have deported men without trial, they have filled jails with men whom the people believe to be innocent, they

have quartered punitive and military police in various parts of the country to create terror in the minds of tens of thou sands, they have pitilessly punished little boys, uninformed youths, conductors of newspapers and some well-known popular leaders. And the result?

"তাঁরা বিনাবিচারে মানুষকে নির্বাসন দিয়েছেন, সাধারণে। যাঁরা নিরীহ বলে গণ্য তাঁদের নিয়ে জেল ভর্তি করছেন, হাজার হাজার লোকের চিত্তে ত্রাস সৃষ্টির জন্য দেশের নানা অংশে পিটুনি ও মিলিটারি পুলিশ বসিয়েছেন, নির্দয়ভাবে শিশুদের অপরিণত তরুণদের, সংবাদপত্র পরিচালকদের এবং কয়েকজন প্রখ্যাত জননায়ককে সাজা দিয়েছেন। কি ফল হয়েছে?

"Well, the police in the interior have had to be doubled and trebled. The District Magistrates have, as a rule, to keep themselves constantly guarded, additional officials, both civilian and non-civilian, have had to be posted in several districts, and a feeling of vague uneasiness now fills the mind of almost every European official in the country. And in thus seeking to infuse terror in the hearts of the people, Government have only made its own officials extremely nervous—some of them ludicrously so.

"মফঃস্বলে পুলিশের সংখ্যা দুইগুণ তিনগুণ করা হয়েছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা সদা সতর্ক থাকবার জন্য নানা জায়গায় নানা লোক বসিয়েছেন। অধিকাংশ পদস্থ ইউরোপীয়ানদের মনে এক অস্বস্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ জনসাধারণের চিত্তে ভীতি সঞ্চারের জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজেদের অফিসারদেরও নাভাস করে তুলছেন।

"আর যে মানুষদের ভয় দেখাবার জন্য গবর্মেণ্ট যত এই দমন-নীতি অনুসরণ করছেন তাঁরা ক্রমশঃই তত নির্ভয় হয়ে উঠছে। 'যুগান্তর'-এর কথাই ধরুন, কেবল যে আর একজন মুদ্রাকর পাওয়া গেছে তাই নয়, ঐ যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটকে খোলাখুলি ও স্বচ্ছন্দে বলেছে যে, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, সে তার পূর্বগামীদের এই পরিণতি জানে যে, তাঁরা জেলে পচে মরছেন এবং তারও সেই একই পরিণতি হতে পারে। তবু যে কাগজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে তারই মুদ্রাকর হবে!

"Is this not a most extraordinary spectacle? The young men who are undergoing trial for 'waging war against the king' are quite unconcerned about their terrible surroundings and their dismal outlook......The jail, even gallows, seem to have no terror for them. No, they appear to be cheerfully courting them. The repressive measures have thus proved a failure in respect of those for whom they are intended.

আশ্চর্য বাতাবরণ নয়? রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগ যাদের মাথার ওপর ঝুলছে, তারা তাদের পারিপার্শ্ব সম্পর্কে উদাসীন। জেল, এমন কি, ফাঁসিরও ভয় তাদের নেই। হ্যাঁ, প্রফুল্লচিত্তে তারা এ বরণ করছে। যাদের উদ্দেশে এই দমন নীতি তাদের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছে।

The best advice which one can give to Government is to ask it to remember that it cannot afford to make its conscience muddy. For, a 'bad conscience makes cowards of us all.' You may gag, bind and disarm a whole nation and arm the officials with powers from head to foot. The latter would yet show symptoms of nervousness and yield to panic, if their conscience is not clear. It is, therefore, essential that the rulers should feel that they deserve well of the people—that the latter have no grievances against them".[১]

২০শে মে সকাল সাড়ে ৯টায় ক্ষুদিরামের মামলার তৃতীয় দিনের শুনানী।

ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ রায়চৌ নারায়ণ বললেন, ঘটনার রাত্রে আমি আমার বাসস্থানে ছিলাম। আমি একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম। পৌনে ন'টায় এ খবরও আমাকে পৌঁছে দেওয়া হল। আমি ঘটনাস্থলে এলাম। তদন্ত আরম্ভ করলাম। আমি রেলস্টেশনের ওয়েটিংরুম তালাস করলাম। ট্রেনে মোকামে ও বাকীপুরে লোক পাঠালাম। দু জন বাঙালীর বর্ণনা দিলাম। ১ মে আরও খোঁজখবর নিলাম। ২ মে সকালবেলা সরকারী উকিল শিববাবু আমাকে একটা তার পাঠালেন এই বলে যে, কাউকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা যায় কিনা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জেনে নিন। আমি তক্ষুণি মোকামের নন্দলালকে

১ অমৃতবাজার পত্রিকা, মে ২৩, ১৯

তারযোগে জানালাম সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করো এবং এখানে নিয়ে এস। এরপর আমি রাত আড়াইটার ট্রেনে মোকামে রওনা হলাম। সমস্তিপুরে শুনলাম, সন্দেহভাজন ধরা পড়েছিল, কিন্তু নিজেকে গুলি করে মারা গেছে।

৪ মে আমি মজঃফরপুর ফিরে আসি। ৫ মে আমার উপর আদেশ হল কিশোরীবাবুর বাড়ি তালাস করতে। দুজন তালাসী সাক্ষী যোগাড়ের জন্য আমি ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠালাম। তারা এল। কিশোরীবাবু তাঁর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন তিনি কাছে এলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে এসেছি জানতে আপনি বাঙালি দুজনকে জানেন কিনা। তিনি বললেন, তিনি কিছুই জানেন না। আমি তখন বললাম, আপনি যে-ধর্মশালার হেডক্লার্ক তারা সেখানে ছিল। তিনি বললেন, তিনি মৃতের খবর কিছু রাখেন না। কিন্তু যে-মানুষটি ধরা পড়েছেন তাঁকে তিনি দেখেছিলেন। আমি তখনও কিশোবীবাবুকে গ্রেপ্তাব করিনি বা গ্রেপ্তারের কথা কিছু ভাবিনি। আমি কিশোবীবাবুব বাড়ি তালাস করতে লেগে গেলাম। তার দেহও তল্লাস করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন তল্লাসী চালাচ্ছেন? আমি বললাম, আমি দেখতে চাইছি, চিঠিপত্রে আপনার সঙ্গে ক্ষুদিরাম-দীনেশের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা। আমি সব কাগজ জড কবলাম এবং কিশোরীবাবুকে গ্রেপ্তার করে ওগুলো আদালতে এনে উপস্থিত করলাম। ঐ কাগজপত্র তারই সম্মুখে হস্তগত করা হয়েছে। যে ড.কপিয়ন তাকে মনিঅর্ডাব দিয়েছিল তাকে খুঁজে বের করলাম। তার বিবৃতি নিলাম। সে স্বীকাব কবল যে, টাকাটা কিশোরীবাবুকে দেওয়া হয়েছিল।

দীনেশ এবং অফিস-পিয়ন রামধারীব সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে তা নিতান্তই শোনা কথা বিধায় বাবু গোবিন্দচন্দ্র তা নথিভুক্তকবণে আপত্তি করলেন।

মিঃ মানুক এভিডেন্স এক্টের ১৫৭ ধারা উদ্ধৃত করে বলেন, রামধারীর কথার সমর্থনেই এ গ্রহণযোগ্য।

গোবিন্দবাবু: আপনি কি রামধারী কি বলবে আগেভাগেই ধবে নিচ্ছেন?

মিঃ মানুক: আমাব উচিত ছিল আগেই রামধারীর জবানবন্দী নেওয়া। আমি এখনই তা করব।

গোবিন্দবাবু তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন।

মহতা এস্টেটের ২ নং কেরানী হরিনাথ চ্যাটার্জি বললেন, ১৯০৮ এব জানুয়ারি থেকে আমি কিশোরীবাবুকে চিনি। তাঁর হাতের লেখা দেখার

সুযোগ আমার হয়েছে। মনি অর্ডার ফরমে যে স্বাক্ষর তা কিশোরীবাবুর, তিনি তা দীনেশের বকলমে সই করেছেন। রসিদ আর কুপনের লেখা আমি চিনিনে, কিশোরীবাবুর লেখাটা আমি চিনি।

যজ্ঞেশ্বর তেওয়ারী বলল, আমি একজন ডাকপিয়ন। কাঠগড়ার কিশোরী-বাবুকে আমি জানি, তিনি মহতা এস্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর হেডক্লার্ক। তাঁর অফিস ও বাড়ি আমি চিনি। অফিস হচ্ছে ধর্মশালায়। তাঁর চিঠিপত্র তাঁর লোকের কাছে ডাক-ঘরের জানালায় দেওয়া হয়। ভিপিপি, মনি অর্ডার, রেজিস্টার্ড চিঠি পত্র আমিই দি। প্রথম বিলি হয় তাঁর বাড়িতে, দ্বিতীয় বিলি হয় তাঁর অফিসে। গতমাসে তাঁকে মনি অর্ডার দিয়েছি। এই মনি অর্ডার আমিই তাঁকে দিয়েছি। ঠিকানা ছিল, দীনেশ চন্দ্র রায়, প্রযত্নে কিশোরী-মোহন ব্যানার্জি, কিশোরীবাবুই সই করে নেন। আমি কিশোরীবাবুকে জিগগেস করেছিলাম, যাঁর নামে মনি অর্ডার এসেছে তিনি কে? কিশোরীবাবু বলেছিলেন, তাঁর জানা-শোনা। আমি জিগগেস করেছিলাম, তিনি কোথায়? তিনি বলেছিলেন, কি জানি কোন ঠিকানা না দিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে টাকা বা চিঠি পত্তর এলে নিয়ে রাখতে। দীনেশ চন্দ্র রায়ের নামে আমি দ্বিতীয় কোন মনি অর্ডার কিশোরীবাবুকে দিইনি।

খেমান কাহার বলল আমি বোমা বিস্ফোরণের কথা, দুজন আওরতের মৃত্যুর কথা পরদিন শুনেছি। দুপুরবেলা দারোগাবাবু এলেন আমার কাছে খোঁজ নিতে। (ফরিয়াদি পক্ষীয় কৌঁসুলি বললেন, ঠিক ঠিক মনে করে দেখো।) দুদিন পর আমাকে নিয়ে গেলেন ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহতাবাবুর বাড়ি। আমার বিবৃতি নিলেন। গত চৈত্র মাসের শেষে প্রথম ৬।৭ দিন আমি ক্ষুদিরামকে দেখেছি। তার একজন সঙ্গী ছিলেন। ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাকে একটা ফোটো দেখালেন, ক্ষুদিরামের সঙ্গীর ফোটো। কিশোরীবাবু ও রামধারী সিং ধর্মশালায় ওঁদের ঘর দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ৫।৭ দিন ছিলেন। ভিতরের ঘর খালি করে দেবার জন্য কিশোরীবাবু হুকুম দিয়েছিলেন। আমি তাঁদের পাঁচ, সাত কি দশ দিন দেখিনি। আবার দশ দিন পর দেখি ক্ষুদিরাম বারান্দার পশ্চিম দিকে রান্না করছেন। "মেমসাহেবদের" মারা যাবার তিন চারদিন আগে। মেমসাহেবদের মারা যাবার পর আর দেখিনি। আমি কিশোরীবাবুকে ক্ষুদিরামের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখিনি।

ঘটনার দু'তিন দিন পর আমি যখন ধর্মশালায় ছিলাম তখন কালেক্টর ও

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন। সেখানে ক্ষুদিরাম ও দীনেশ যে ঘরে থাকতেন সে ঘরটি তালা ভেঙে খুললেন। দুপুর বারোটা নাগাদ অফিস খুলল। দরজা যখন খোলা হয় তখন কিশোরীবাবুর তরফে কেউ আসেনি। যে ঘরে তাঁরা থাকতেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘরটা ক্ষুদিরাম দেখিয়ে দিলেন। ওটা ছিল ক্ষুদিরামের তালা। কি ভাবে খোলা হল আমি তা বলতে পারব না। ক্যানভাস ব্যাগের ভেতরে কি ছিল আমি দেখিনি। দীনেশ ও ক্ষুদিরাম ব্যাগটা নিয়ে এসেছিল। কার হাতে ব্যাগটা ছিল আমার মনে নেই।

গোবিন্দবাবুর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে:—ঘটনার পর পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করে এবং জেলে রাখে। ১৩।১৪ দিন আটক ছিলাম। জেলে থাকতে আমার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কিশোরীবাবুর গ্রেপ্তারের একদিন কি দুদিন আগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি জেল হাজতে আটক ছিলাম। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে প্রশ্ন করেন নি। একজন মুসলমান অফিসার জেলে যেতেন, কিন্তু আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেন নি।

মহতা এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অফিস-পিয়ন রামধারী মিশির বলল: আমি কিশোরীবাবুকে চিনি। তিনি হেডক্লার্ক। মহাদেও প্রসাদ হচ্ছেন ম্যানেজার। তাঁর অনুপস্থিতিতে কিশোরীবাবুই সই দস্তখত করেন। আমি কখনও ক্ষুদিরামকে দেখিনি। বোমা বিস্ফোরণের কথা আমি জানি। এ দেড় মাস আগের এক ঘটনা। ঘটনার মাসখানেক আগে, দুজন বাঙালি আসেন ধর্মশালায়, বয়স ১৯।২০ হবে। প্রথম আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে তাঁরা জিগগেস করেন, কিশোরীবাবু ধর্মশালায় আছেন কিনা। আমি বললাম, তিনি অফিসে আছেন। তখন বাবুরা তাঁর কাছে যান। তারা বাংলায় কথা বলেছেন। আমি বুঝিনি। উঠোনে খেমানের সঙ্গে দেখা হল। কিশোরীবাবু ও বাঙালি দুজন উঠোনে আমাদের কাছে এলেন। কিশোরীবাবু খেমানকে বললেন বাঙালিদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে। তারপর আমরা সবাই চলে গেলাম। ঘর ধর্মশালার ভেতরে। সেই থেকে আর কখনও আমি বাঙালি দুজনকে দেখিনি। ম্যানেজারের অফিস ধর্মশালার পূর্ব দিকে। বাঙালি দুজনার গোঁফ ছিল না। দুজনেরই মাথায় লম্বা চুল। বাঙালি দুজন কিশোরীবাবুর পূর্বপরিচিত কিনা আমি বলতে পারব না।

জেরার উত্তরে বলল, আমি বলতে পারব না আদালতে যে ফোটো দেখানো হয়েছে তার মত কাউকে আগে দেখেছি কি না।

মহম্মদ ইব্রাহিম দপ্তরি বলল, আমি মহতা কোর্ট অব ওয়ার্ডস অফিসের দপ্তবি। আমি কিশোরীবাবুকে জানি। তিনি হেডক্লার্ক। আমি ক্ষুদিরামকে জানিনে। দীনেশের মতো একজন মানুষকে আমি দেখেছিলাম। এ হচ্ছে ঘটনার ১০।১৫ দিন আগে। আমি তাঁকে কিশোরীবাবুর ওখানে ১৯ তারিখে দেখি। কিশোরীবাবুর বাড়ি হচ্ছে আবগারী দারোগাবাবুর বাড়ি থেকে ২।৩ "লোগোন।" আবগারী ইন্সপেক্টরের বাড়ি যেতে আমাদের কিশোরীবাবুর বাড়ি পার হয়ে যেতে হয়। বেলা চারটে নাগাদ যিনি মারা গেছেন তিনি কিশোরী-বাবুর বাডিব চৌকাঠে বসে ছিলেন। এই বারান্দা রাস্তার পশ্চিম পারে। সেখানে আরও দুতিনজন বাঙালি ছিলেন। বাবান্দায় দবজার কাছে একটা টেবিলের সামনে বসে ছিলেন হরিবাবু, বসন্তবাবু, কেশববাবু ও কিশোরী বাবু। যিনি মারা গেছেন তিনি দক্ষিণমুখো হয়ে একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। বাস্তা থেকে "এক লোগান" দূরে। আমি বাবান্দায় চলে গেলাম। দারোগার কাছে যাবার সময় আমি এদের দেখিনি। ফেরবার পথে দেখেছি। কিশোবী-বাবু জিগগেস করলেন, কোথায় ছিলে? আমি বললাম দারোগাব ওখানে গেছলাম। তিনি আমাকে কল্যাণী ডাকঘর থেকে কিছু পোষ্টাল এনভেলাপ আনতে বললেন। আমি নিয়ে এলাম। আমাব কিছু বেতন পাওনা ছিল এস্টেটের কাছে। আমি তাঁকে তা চুকিয়ে দিতে বললাম। তিনি আমাকে আর এক সময় আসতে বলেন। দু এক দিন পব আমি তাঁব বাড়ি গেলাম। একজন মোটা সাব-ইন্সপেক্টব সবাইকে দুই তিনখানা ফোটো দেখাচ্ছিলেন। সবাইকে বলছিলেন, যদি কেউ এদেব ধরিয়ে দিতে পাবে, পুবস্কাব পাবে। আদালতে যে দুটি ফোটো, তাছাডাও একটি ফোটো ছিল।

গোবিন্দবাবুব জেবাব উত্তবে বলল, ছেলেবেলা থেকে আমি এ শহরের বাসিন্দা। একই বাড়িতে বাবাব সঙ্গে থাকি, কিন্তু কাজ কবি আলাদা। বছর দুই আগে চোরাই মাল রাখবাব অপরাধে আমাব দুমাস জেল হয়েছিল। আমি পুলিসের চব নই। কাবাদণ্ড শেষে একটা চোরকে ধরিয়ে দেবার জন্য আমি পুবস্কৃত হই। মহতা অফিসে আসবাব সময় থেকেই আমি কেশববাবুকে জানি। তিনি এই মামলাব সাক্ষী কিনা আমি জানিনে। হ্যাঁ, তাবিখটা ১৯ই হবে। আমি স্ট্যাম্প ভেণ্ডারেব কাছ থেকে যেদিন ডাকটিকিট আনি সেদিনটা ছিল রোববার। কালিয়াকির চৌমাথায় এক স্ট্যাম্প ভেণ্ডার বসে, আমি তাকে চিনি। কমিশন প্রত্যাহার করায় ভেণ্ডাবরা স্ট্যাম্প বেচে না, এ আমি জানিনে।

আমার যেদিন জেল হয় সেদিন আমাকে ডিসমিস (কর্মচ্যুত) করা হয়। আমার কারাদণ্ডের সময় আখতার আলি কোতোয়ালি সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন না। কেবল আমার কারাদণ্ডের জন্যই আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় না। আমি কাজ ছেড়ে দি। কারাদণ্ডের জন্য কাজ ছাড়িয়ে দেওয়া হয় না। আমি যে ফোটো সনাক্ত করলাম তা একটা পকেট বইয়ে টুকে রাখা হয়। আমি সর্বদাই আদালতে আসি। ১০।১২ দিন আগে একটা আবগারী মামলায় আমাব সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। দারোগার নাম মহাবীরপ্রসাদ। আমি স্ট্যাম্প ভেণ্ডাবের নাম জানিনে। তিনি হিন্দু, বুড়োও নয়, যুবকও নয়। স্ট্যাম্প ভেণ্ডারকে সনাক্ত কবতে পাবি। আমি পুলিসকে তাকে দেখাইনি।

মহম্মদ ইয়াকিন বলল, পুলিস সাহেবের হুকুমমত আমি এই ম্যাপ কবেছি। স্কেল-পবিমাপে আঁকা।

মহম্মদ হাফিজ বিস্ফোবণ স্থানেব ম্যাপ সাবুদ করল।

এক্কা চালক ঘসিটা কবরি বলল, আমি ধর্মশালা থেকে ২০।২৫ লগি দূরে মতিঝিলে থাকি (অনুমানে যা দেখালো তা ২৫০ গজের মত হবে)। আমি ধর্মশালার সামনে ভাড়া খাটাবার জন্য আমাব এক্কা রাখি। ঘটনার চার পাঁচ দিন পর দারোগা বাবু চারখানা ফোটো নিয়ে ধর্মশালায় আসেন, অনেককে দেখান এবং জিগগেস করেন, কেউ এদেব দেখেছে কি-না। আমি দুজনকেই চিনি বললাম এবং আরও বললাম যে, আমি এদের দেখেছি। বম্-বারিব সাত আট দিন আগে আমি এদেব প্রথম দেখি ধর্মশালায় কেরাণীবাবুর সঙ্গে। কেরাণীবাবুব নাম আমি জানিনে। দীর্ঘকাল ধরে আমি কেরাণীবাবুকে তিন চারবাব ক'বে দেখতাম ধর্মশালাব কাছে। (সাক্ষী ক্ষুদিরাম ও কিশোরীমোহন ব্যানার্জীকে সনাক্ত কবে)।

জেরায় সে বলে: ঘটনাব পাঁচ সাত দিন পর এস-আই আখতার আলি প্রথম আমাব বিবৃতি লিখে নেন। একটা খোলা শাদা কাগজে দারোগাবাবু আমার বিবৃতি লিখে নেন। আমি ধর্মশালার ভেতব যাইনে। কিশোরীবাবু দীর্ঘকাল ধরে আমার চেনা। তিনি কখনও আমার এক্কায় চড়েন নি। আমি পুলিসের কাছে এর আগে কোন মামলায় সাক্ষ্য দিই নি। আমি ধর্মশালার বাইরে তিনজনকে দেখেছি। আমি একবার যাকে দেখি তাকে আবার দেখলে চিনতে পারি। ওদের সঙ্গে আমাব কখনও কোন আলাপ হয়নি।

জেরার জন্য ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেনকে ডাকা হ'ল। তিনি বললেন,

আমি চৌদ্দ বছর পুলিসের চাকরিতে আছি। প্রকৃত বোমা নিক্ষেপকদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট, এস-পির সঙ্গে আমিও তদন্ত করি। আততায়ীদের ধর্মশালায় পাব বলে আমি সেখানে যাই। কিশোরীবাবুর বাড়ির ঘর তালাস করি। আমি কিশোরীর বিবৃতি লিখে নিইনি। ৫ তারিখে ডি-এস-পি সহ যে তদন্ত হয় তার দায়িত্বভার আমার উপর ছিল। আমরা সেখানে শুধু তল্লাসীর জন্যই গেছলাম, সাক্ষ্য যোগাড়ের জন্য নয়। আমি কিশোরীবাবুর বাড়ি তালাস করা স্থির করি। ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারেই আমি এই তল্লাসীতে অগ্রসর হই। ও বাড়ির সদর দরজাটা উত্তরমুখো। কিশোরীবাবুর বাড়িটা একটা গলিতে, ঐ গলি আবার আর একটা গলিতে গিয়ে মিশেছে, শেষের গলিটা ওর্সলি রোডে (Worsely Road) গিয়ে পড়েছে। কিশোরীবাবুর বাড়িটা দুটি রাস্তার উপর। সদর দরজাটা উত্তরমুখো। কিশোরীবাবুর বাড়িতে গুটি কয়েক ঘর। কোনায় একটা ছোট ঘর। বারন্দা উত্তরমুখো। ৩০ এপ্রিলও বটে ৫ মে-তেও বটে, দু-দিনই ও বাড়িতে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে অনেকে ছিল। দু'টি বয়স্ক পুরুষও ছিল। আমি অফিসের বাক্সটা কিশোরীবাবুর শোবার ঘরে পেলাম। ৫ তারিখের তল্লাসীর সাক্ষী ছিল পুরানি বাজারের বেণীপ্রসাদ ও মহম্মদপুরের মুন্সী আলি খান। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তাদের কারুরই পরিচয় নেই। তাদের সামাজিক মর্যাদা কি তাও আমি জানিনে। বারো দিনেরও কম সময় খেমান চৌকিদার জেল হাজতে ছিল। কে কিশোরীবাবুর বিবৃতি লিখে নিয়েছে আমি জানিনে। অভিযোগ-পত্র (চার্জ-শীট) দাখিল করেছেন ডেঃ সুপার। কিরকম সাক্ষ্যসাবুদ দরকার তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয় নি। কোন অপরাধীকে আশ্রয়দান ও কোন অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া কি সহায়তা করার পার্থক্য আমি জানি। আমি একা-চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কোন তারিখে তা হয়েছিল তা আমার স্মরণ নেই। ১২ তারিখে সমস্তিপুর থেকে ফেরার পর আমি দপ্তরিকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি শহরে তাকে দেখেছি। আগে তাকে চিনতাম না। এস-আই আখতার আলিই আমাকে জানায় যে, এই সেই দপ্তরি যে ফোটোগুলো চিনতে পেরে বিবৃতি দিয়েছে। কোথায় যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠিক বলতে পারব না। আখতার আলি আমাকে বলেনি যে, দপ্তরি একজন জেল-ছাড়া কয়েদী।

মিঃ মান্নুকের আবার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, দপ্তরি ও ঘসিটার বিবৃতি

আমি লিখিনি, কেননা আমি জানতাম এস-আই আখতার আলি তার ডায়েরীতে তা টুকেছেন।

ডি-এস-পি জেরার উত্তরে বলেন, ৩০ এপ্রিল কিশোরীবাবুর বাড়ি তল্লাসীর খবর আমি রাখি। কিশোরীবাবু কোন বিবৃতি দিয়েছেন বলে আমি জানিনে। ৫ মে তারিখের আগে জামিরুল হোসেন তাঁকে একথা বলেছিল কিনা তাঁর স্মরণ নেই যে, কিশোরীবাবু আততায়ীদের সম্পর্কে কিছুই জ্ঞাত নন বলে জানিয়েছেন। গ্রেপ্তারের আগে আমি কিশোরীবাবুর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিনি। গ্রেপ্তারের পর ৫ তারিখে তা করেছি। আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, প্রকৃত আততায়ীর সংখ্যা দুইয়ের বেশি ছিল। আমি কিশোরীবাবুর বাড়ি তালাস করতে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করতে গেছলাম। আমার উপর সেই আদেশই ছিল। আমার উপরওলা কেউ সাক্ষীদের জবানবন্দী নেন নি। আমার অধস্তন কাউকে আমি কোন বিষয় লিখতে বলিনি। আখতার আলিকে সাধারণভাবে তদন্ত করবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ১১ কি ১২ তারিখে প্রথম আমি এস-আই আখতার আলির ডায়েরী দেখি। তখনই প্রথম জানলাম যে, দপ্তরি সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাকে আমার কাছে আনবার জন্য এস-আইকে বললাম। আজ সকালে আমি দপ্তরিকে হাজির করেছি। আমার মনে হয়, একবার কি দু'বার আমি তার ঠিকানা চেয়েছিলাম। আদালতকক্ষ ছাড়া তাকে এর আগে কখনও দেখিনি। তার জবানবন্দী হয়ে গেলে জানলাম সে জেলে ছিল। সে কোথায় থাকে সন্ধান নেবার জন্য হেড কনস্টেবলকে লাগানো হয়েছিল। সে আমাকে তার পূর্ব-পরিচয় দেয়। দপ্তরি যে খারাপ লোক সে খবর আমি জানতাম না। আমি শুনেছিলাম, সে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। আলাপ-আলোচনাকালে একজন পুলিসের কাছে আমি এ খবর পাই। সে তাকে একথা বলে। এ মামলার সকল সাক্ষী সম্পর্কেই আমি যখন সাধারণভাবে আলাপ করছিলাম তখন নিজেই সে দপ্তরির পূর্ব-পরিচয় দিল। আমি মাস পাঁচেক শহরে খুব ব্যস্ত ছিলাম। পোস্টাল স্ট্যাম্প বিক্রি করার উপর যে কমিশন-ব্যবস্থা ছিল তা রহিত হবার কথা আমি শুনেছিলাম, কিন্তু স্ট্যাম্প ভেণ্ডাররা যে ডাকটিকিট বিক্রি বন্ধ করেছে তা জানতাম না। মেহতা হাউসে আমি খেমানের বিবৃতি লিখে নি। আমি যখন কলকাতায় তখন খেমান হাজতে। খেমান ১৯এ খালাস পায়। আমি তাকে ছেড়ে দেবার জন্য সুপারিশ করি। একটা হত্যাকাণ্ডের সহায়ক বলে খেমানকে সন্দেহ করা

হয়েছিল। ইন্সপেক্টর আমিরুল হোসেন খেমানকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। কার হুকুমে তিনি খেমানকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তা আমি জানিনে।

কোর্ট ইন্সপেক্টর উপেন্দ্রনাথ (?) বললেন, আমি বাংলা গানটার (ইংরাজি) অনুবাদ করেছি। হাতে লেখা বাংলা গানটারও আমি অনুবাদ করেছি। যথার্থ অনুবাদ হয়েছে। আমি বাংলা ভালই জানি। আমি ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় ফেল করেছি। আমি যেখানে শিক্ষালাভ করেছি সেখানে বাংলা শেখায় না।

কিশোরীমোহন ব্যানার্জি

আমার বয়স ৪২। আমাব স্বর্গত পিতার নাম মহিমচন্দ্র ব্যানার্জি। আমার বাড়ি ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানা অন্তর্গত রাজদিয়ায়। হাল সাকিন মজঃফরপুর। আমি এখানে মেহ্তা এষ্টেটের হেড ক্লার্ক। আমি ইংরাজি ভাল বুঝিনে। আমাকে বাংলায় জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আমাব সুবিধে। আমি ক্ষুদিবামকে চিনিনে। আমি একজনকে জানতাম, তাব নাম দীনেশচন্দ্র রায়। কেন না, সে মার্চ মাসের শেষে ধর্মশালায় এসেছিল।

প্রঃ এই ফোটোগুলো চিনতে পারেন ?

উঃ না।

প্রঃ যে দীনেশচন্দ্র বায় ধর্মশালায় এসেছিলেন তাঁব সঙ্গে এই ফোটোব মিল আছে কি ?

উঃ না।

প্রঃ দীনেশ কদ্দিন ধর্মশালায় ছিলেন ?

উঃ এক সপ্তাহেরও বেশি কাল।

প্রঃ কবে ধর্মশালা ছেড়ে গেছেন ?

উঃ ১০ এপ্রিল।

প্রঃ তারপব তাঁকে দেখেছেন ?

উঃ না।

প্রঃ ধর্মশালায় থাকতে দীনেশেব সঙ্গে আপনাব কি সংস্রব ছিল ?

উঃ কিছুমাত্র না।

প্রঃ কি কবে নাম মনে রাখলেন তবে ?

উঃ ম্যানেজারের পিয়ন, রামধারী সিং আমাকে এসে বলে, দু'জন বাঙালি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সময়টা মার্চের শেষাশেষি হবে। আমি

ধর্মশালার ভেতরে আমার আফিসের পেছনে গেলাম। দীনেশকে দেখলাম, আর একজনকে দেখলাম, সে রামধাবী।

প্রঃ দীনেশের সঙ্গে আর যে ছিল সে কি বাঙালি? আপনি কি সুনিশ্চিত যে, দীনেশের সঙ্গে এই ছেলেটি (ক্ষুদিরাম) ছিল না?

উঃ আমি সুনিশ্চিত।

প্রঃ যে-ঘবে দীনেশ ছিল ধর্মশালাব সে ঘবটা আপনি দেখেছিলেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ সেটা কোথায়?

উঃ ধর্মশালার ভেতবে।

প্রঃ ডি-এস-পি ও ম্যাজিস্ট্রেট যে ঘরের তালা ভেঙে ঢুকেছিলেন সে ঘরটা চেনেন?

উঃ না।

প্রঃ ৩ মে আপনি কোথায় ছিলেন?

উঃ রোববার বলে আমি আমাব বাড়ি ছিলাম।

প্রঃ আপনাকে কি কেউ পবে খবর দিয়েছিল যে, ডি এস পি ও ম্যাজিস্ট্রেট একটি ঘরেব তালা ভেঙেছেন?

উঃ হাঁা, ধর্মশালাব একটা বাইরেব ঘর।

প্রঃ ধর্মশালায় যাঁবা থাকতে আসেন তাঁদেব কি আপনি ঘর দেখিয়ে দেন?

উঃ না।

প্রঃ আপনি দীনেশকে ঘব দেখালেন কেন?

উঃ কাবণ, দীনেশ এবং তার সঙ্গী আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, কলকাতা থেকে আসবার পথে তাদেব টাকা চুরি গেছে, তারা কখনও মজঃফরপুরে আসেনি। তাদের ইচ্ছে আছে বারাণসী যাবার। অবশ্য যদি কলকাতা থেকে টাকা পাঠায়। তারা বলল, আমবা অচেনা, কোথায় যাব, বলুন?

প্রঃ ১০ তারিখ এস-আই জামিরুল হোসেন আপনাব কাছে এসেছিলেন?

উঃ হাঁা।

প্রঃ তিনি কি দুজন বাঙালিব কথা আপনাকে জিজ্ঞেস কবেছিলেন?

উঃ তিনি দু'জন বাঙালির কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি জিজ্ঞেস কবেছিলেন আমার এখানে কোন বিদেশী লোক এসেছে কি না, আমি বলেছিলাম কোন বিদেশী আমাব এখানে আসেনি।

প্রঃ ডি এস পি ও ম্যাজিস্ট্রেট ৫ তারিখে আপনার বাড়ি এসেছিলেন ?

উঃ হ্যাঁ, এসেছিলেন।

প্রঃ তিনি কি আপনার কাছে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামোল্লেখ করেছিলেন ?

উঃ না।

প্রঃ আপনি কি শুনেছিলেন, মোকামেয় দীনেশচন্দ্র রায় নামে একটা লোক আত্মহত্যা করেছে ?

উঃ একটা লোক আত্মহত্যা কবেছে শুনেছি, সে যে দীনেশচন্দ্র রায় তা শুনিনি।

প্রঃ এই মামলা সম্পর্কে কখন আপনি দীনেশচন্দ্র রায়ের নাম শুনলেন ?

উঃ ৫ মে, সেদিন একজন এস-আই, তার নাম আমি জানিনে, দেখলে চিনতে পারব, এক্কা কবে একজনকে আদালতে এনেছিলেন এবং কথায় কথায় দীনেশচন্দ্র রায়েব নামোল্লেখ কবেন।

প্রঃ দীনেশ চন্দ্র বায় সম্পর্কে আপনি যা জানতেন তাঁকে আপনি বললেন ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ দেখুন তো, এই বসিদটা আপনাব বাড়ি পাওয়া গেছে ?

উঃ আমার বাড়িতে পাওয়া যায়নি। আমি নিজেই আমাব অফিসেব বাক্স থেকে ওটা ডি-এস-পিব হাতে দি।

প্রঃ এই কাগজগুলো আপনাব বাড়িতে পাওয়া গেছে ?

উঃ আমার বাড়িতে পাওয়া যেতে পাবে, কিন্তু আমি জ্ঞাত নই।

প্রঃ কুপনেব হাতে লেখা আপনাব ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ দীনেশেব টাকা আপনি নিলেন কেন ?

উঃ মাচের শেষে সে যখন এসেছিল, বলেছিল, ট্রেনে তার টাকা খোয়া গেছে, কলকাতা থেকে আপনাব প্রযত্নে কিছু টাকা আনতে পাবি ? আমি রাজি হই। মনিঅর্ডাব আসে। পিয়ন আমাব কাছেই নিয়ে আসে, বলে, আমাব প্রযত্নে দীনেশের নামে মনিঅর্ডাব এসেছে এবং জিজ্ঞেস করে, দীনেশ কোথায় ? আমি বলি, দীনেশ ধর্মশালায়। পিয়ন বলে, তার তাড়া আছে, সে আমাকে টাকাটা নিতে বলে, আমি নি এবং সই কবে দি।

প্রঃ আপনি দীনেশের কাছ থেকে কোন রসিদ নিয়েছেন ?

উঃ আমি টাকাটা দীনেশকে দিয়ে দি।

প্রঃ ইব্রাহিম ও ঘসিটার কথাগুলো মিথ্যে ?

উঃ হ্যাঁ, সর্বতোভাবে মিথ্যে।

প্রঃ আপনার কিছু বলবার আছে ?

উঃ ভাবছি। আমি লিখিত বিবৃতি দেব।

ক্ষুদিরামের দুটি বিবৃতি

(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরাম প্রথম বিবৃতিতে বলেছেন :

"মিঃ কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য আমি কলকাতা থেকে পাঁচ ছ'দিন আগে মজঃফরপুরে এসেছি। আমি ধর্মশালায় যাই। আমার সঙ্গে আর একজন আসেন, নাম—দীনেশচন্দ্র রায়। তিনি আমাকে বললেন তাঁর বাড়ী বাঁকিপুর। তাঁর সঙ্গে আমার হাওড়া স্টেশনে দেখা। এর আগে তাঁকে কখনও দেখিনি। আমরা এক সঙ্গে এলাম। তিনিও একই উদ্দেশ্যে এসেছেন। আমি আমার নিজের উদ্যোগেই এসেছি। নানা কাগজে নানারকম পড়ে আমার মনে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল এবং এই দৃঢ় পণ করি। এই সব কাগজ হল 'সন্ধ্যা' 'হিতবাদী', 'যুগান্তর' ও আরও অনেক। ইংরাজ সরকার যে জুলুম চালাচ্ছে, কাগজগুলো সে সম্পর্কে লিখছিল। কিংসফোর্ডের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা হত। কিন্তু আমি যে তাঁকে হত্যার জন্য কৃতনিশ্চয় হলাম, তার কারণ তিনি অনেককে জেল দিয়েছেন। এসব কথা আমরা আলাপ করি। কিন্তু কেউ তাঁর উত্তেজনার কারণ কিনা একথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি। কেননা, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ট্রেনে। এমনি আলাপ জমালাম। কথায় কথায় তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বললেন, আমি বললাম আমার। ট্রেনে আরও সব যাত্রী ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলিনি। মজঃফরপুরে আমরা যখন ধর্মশালায় পৌঁছোলাম তখন সেখানে আমরা চার পাঁচদিন কিংসফোর্ডকে মারবার সুযোগ নিয়ে পরামর্শ করলাম। দু'তিনদিন বাইরে গিয়ে তার বাড়িটা দেখে এলাম। সন্ধ্যায় যখন তিনি বেরোতেন তখন আমরা তাঁকে দেখতাম। সকালবেলা কখনও তাঁকে দেখিনি। তবে একদিন কাছারী গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি। আমার ইচ্ছা ছিল রিভলভার দিয়ে তাকে গুলি করবার। আমার কাছে দুটো রিভলভার ছিল। দীনেশের কাছে একটা রিভলভার ও একটা বোমা ছিল। সে ওগুলি তৈরি করেই এনেছিল। ধর্মশালায় তৈরি করেনি। ধর্মশালায় বসে সে কিছু করেছে। আমি বাইরে

গেছলাম, ফিরে দেখি, সে বোমাটা খুলে আবার ঠিক করছিল। দীনেশ আমাকে বলল, সে এসব বোমা তৈরি করতে জানে। কিন্তু বলল না কোত্থেকে সে এটা এনেছে। এই বোমাটি ছিল টিনের, ছিল গোল, আর, এই এত বড় (যা দেখালেন তার ব্যাসার্দ্ধ তিন চার ইঞ্চি)। বোমাটা আমাদেব কাপড়-চোপড়েব সঙ্গেই রেখেছিলাম। ধর্মশালায় একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগে ছিল। দু'তিন দিন দীনেশেব সঙ্গে একটা টিনে কবে বোমাটা নিয়ে বেরিয়েছি। দীনেশ ও আমি দু'তিনদিন সন্ধ্যায় বেরিয়েছি এবং জজ বাড়ির সামনে ময়দানে ঘুরেছি। তিনবাব তাঁকে (কিংসফোর্ডকে) দেখেছি। কিন্তু সুবিধেমত পাইনি। তাঁকে গাড়িতেও দেখেছি। শেষের রাত্রিটায় একটা সুযোগ পাওয়া গেল, আমি বোমাটা ছুঁড়ে দিলাম। দীনেশ ও আমি ময়দানের গাছের নীচে গেছলাম। দেখলাম ক্লাব থেকে একটা গাড়ি বেবোচ্ছে। আমি ভাবলাম, আমি কিংসফোর্ডের গাড়িটা চিনেছি : তাই বোমাটা ছুঁড়েছিলাম। আমি এখন জেনেছি আমি ভুল কবেছি। যে কনস্টেবল আমাকে ধরেছে তার কাছে জেনেছি। আমি একটাই বোমা ফেলেছি। বাস্তায় আমি গাড়িটার কাছে দৌড়ে গেছলাম এবং বোমা গাড়িব ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম জজ ওর ভেতবে আছেন। আমি পবিষ্কাব দেখতে পাইনি গাড়িতে ক'জন ছিল। ঘোর অন্ধকাব রাত্রি। তখন আমায় গায়ে এই ডোরাকাটা কোটটা ছিল। দীনেশের গায়ে প্রথমে ছিল একটা সিল্কের কুর্তা। সে সেটা খুলে ফেলে এবং আমাকে দেয়। কেননা ওতে সুবিধে হচ্ছিল না। এরপব সে একটা ভেস্ট আব চাদর গায়ে দেয। আমাদেব পায়ে জুতো ছিল, কিন্তু খুলে ফেললাম, বোমা ফেলবাব আগে গাছেব নীচে জুতো বাখলাম। বোমাটা ফেলবার জন্য আমি ছুটে সামনে গেলাম। দীনেশ কি অবস্থায় ছিল আমি দেখতে পাইনি। দীনেশেব একটা বিভলভাব ছিল, সেটা তার হাতে ছিল কিনা দেখিনি। সে গুলি ছুঁড়েছে কিনা বলতে পারব না। বোমায় আমি একটুও চোট খাই নি। দীনেশের কোন চোট লেগেছিল কিনা বলতে পাবব না। ধর্মশালা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে কিছুক্ষণ ছুটলাম। তারপর আমবা পৃথক হ'য়ে গেলাম। আমি লাইন ধবে এগোলাম। তাবপব সমস্তিপুব রোড ধবে। ধর্মশালায় পৃথক হবার পর দীনেশ সোজা পথ ধরল।

আমরা যখন ধর্মশালার দিকে ছুটে আসছিলাম, একজন কনস্টেবল আমাদেব ডেকেছিল, আমরা কানে তুলিনি। চুপি চুপি দৌড়োতে লাগলাম।

ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা যখন জজ বাড়ির সামনে অপেক্ষা

করছিলাম তখন দু'টি লোক আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল আমরা কোথায় থাকি। আমি বলেছিলাম, আমরা কিশোরীবাবুর ওখানে থাকি। আমরা তাঁর নাম জানতাম, কেননা তিনিই ছিলেন ধর্মশালার ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। আমি ঐ লোক দু'টিকে বলেছিলাম, আমবা একটি ছেলের জন্য অপেক্ষা করছি। তারপর আমরা উঠে খানিকটা পায়চারি করলাম, জজের কাছারী ও পুকুর ঘুরে একটা গাছের নীচে এলাম। গাড়িটা আসা পর্যন্ত তখন থেকে সেখানেই ছিলাম। যখন লোক দুটির সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমাব বাঁ হাতে বোমা-পাত্রটা ছিল। আমার হাতটা ঝুলছিল। পাত্রটা টিনের, গাছেব নীচোয় যাবাব আগে টিনটা ছুঁড়ে ফেললাম। বোমাটা যদিও দীনেশের, ছুঁড়েছিলাম আমিই, কেননা আমারই "বেশী ইচ্ছা" ছিল এই কাজে। আমি যখন পালাই তখন একটা ধুতি ধর্মশালায় ফেলে আসি। দীনেশ কিছু ফেলে এসেছিল কিনা জানিনে। দীনেশ আমার বয়সী। গোলপানা মুখ ও আমার চাইতে শক্ত-সমর্থ। আমার মতই উঁচু হবে, তার ভ্রূ জোড়া আলাদা। তার মাথার চুল আমার মতই কোঁকড়ানো, কালো। সে আমাকে বলেছিলো তার এক ভাই রেলে কাজ করে বাঁকিপুরে।

আমি খবরেব কাগজ পডা ছাডাও বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রমুখের বক্তৃতা শুনেছি। এসব বক্তৃতা হ'ত বীডন স্কোয়ার ও কলেজ স্কোয়ারে। তাঁরাই আমাকে একাজে অনুপ্রাণিত করেছেন। কে একজন সন্ন্যাসীও বীডন স্কোয়াবে বক্তৃতা দিতেন। দারুণ বক্তৃতা। আমি আমার মামা সতীশচন্দ্র দত্তের কাছে থাকতাম। তিনি আমাব দূরাত্মীয়। তিনি কর্পোবেশন ষ্ট্রীটে থাকেন, নম্বরটাও ৪ কি ৫ হবে। তিনি স্কুলের মাষ্টার। স্কুলটাও কর্পোবেশন ষ্ট্রীটে।

এই যে ২৩টি ছোট ও ১৪টি বড কার্তুজ—এ আমার। আমি এগুলো কর্ণওয়ালিশ ও বৌবাজারের বাজারে রাত্রে কিনেছি। আমার কোন লাইসেন্স নেই। অমূল্যরতন দাস নামে একটি ছেলে আমাকে বিভলভার যোগাড করে দেয়। একটার দাম ২৫ টাকা, আর একটার ১৫ টাকা। মাস দুই আগে। এই ঘডিটা আমার। রেলওয়ে টাইমটেবিলের এই অংশ বিশেষ, এই মোমবাতি, দেশলাই, টাকা—সব আমার, তিনটে দশ টাকার নোট, একটা টাকা, একটা দু আনি, আর কিছু খুচরো। মোট ৩১ টাকা সাত আনা তিন পাই। হ্যাঁ, এইটেতে বোমা ছিল, এই জুতো জোড়া আমার, ঐ জোড়া দীনেশের। চাদরটা

দীনেশের ; সে মাঝে মাঝে ওটা মাথায় জড়াতো। খানিকটা ছিঁড়ে টিনে-রাখা বোমাটা জড়ানো হয়েছিল। দু'তিনবার ছিঁড়তে হয়েছিল।

আমি বছর খানেক আগে মেদিনীপুর কলেজ ছেড়ে দিই।

বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মার্থ্ডের কাছে ক্ষুদিরাম ২৩ মে আর একটি বিবৃতি দেন। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। বিশেষ করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখের পটভূমিকায় ক্ষুদিরামের এই বিবৃতি বিশ্লিষ্ট কবাব প্রয়োজনেই দরকার। বারে বারে সন্দেহ হয়, অভিজ্ঞতাব অভাবে অথবা ইচ্ছে কবে শুধু নিজেকে জড়াতে গিয়ে এবং দীনেশকে সম্পূর্ণ আড়াল দিতে গিয়ে সত্য মিথ্যাব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। স্পষ্টতই হাওড়া স্টেশনে বা ট্রেনে তাঁদের সাক্ষাৎ, এমনকি দুই অপবিচিতেব একই উদ্দেশ্যে মিলন, গোপীনাথ দত্ত লেনে হেমচন্দ্র দাসের সামনে দুইয়ের 'বৈপ্লবিক পবিচয়' ক্ষুদিবামের বিবৃতিতে মুছে গেছে, মুছে গেছে এক অমূল্যবতন দাসেব মাবফৎ ২৫ টাকা ১৫ টাকায় দুটি বিভলভাব যোগাড, কর্ণওযালিশ ষ্ট্রীট ও বৌবাজাবে গুলি কেনাব কাহিনীতে বাবীন্দ্রকুমাব ঘোষেব দেওয়া বিভলভাব দুটি এবং অন্যান্য প্রাথমিক কাহিনী। সত্য আছে এই যে, বোমাটা দীনেশেব, মানে, প্রফুল্ল চাকীব কিন্তু 'বেশি ইচ্ছা'বশতঃ তিনিই ছুঁডেছেন এবং বারবাবই বলেছেন, বোমা একটাই। প্রফুল্ল তাঁব কাছে আগাগোডাই দীনেশ চন্দ্র বায়।

(খ) দ্বিতীয় বিবৃতিতে বলেছেন, এই যে দেহ পডে আছে, এ দীনেশ চন্দ্র রাযেব। সাধাবণ আকৃতি থেকে তাকে চিনি, কোন বিশেষ চিহ্ন থেকে নয। এই পাঞ্জাবীটা কাব বলতে পাবব না। (নতুন সার্ট, রক্তমাখা, দেখানো হলে বললেন) এসব কাব জানিনে। এই বেনিয়ানটাও নয়। (জুতো জোড়া নতুন, বেনিযানটা নোংবা, মনে হয না নতুন)। এই পিস্তলটাও আমি চিনিনে। (একটা ব্রাউনিং পিস্তল ক্ষুদিবামকে দেখানো হয়েছিল) দীনেশ বলেছিল তার একটা পিস্তল আছে। এ চাদবটা আমি চিনি, ঐ টুকবোটাও, মনে হচ্ছে, এ দুটো একটা গোটা চাদবেবই টুকবো। আমি যখন প্রথম দেখি, তখন পুবোটাই ছিল। এই কাপডেব টুকবোটাও আমি দেখেছি। দীনেশ এটা পবত। কিন্তু এ কাপড়টা আমি চিনিনে, বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। আর, যে কাপড় শবেব ওপর রয়েছে তাও আমি দেখিনি। ধুতিটা নতুন মনে হচ্ছে। দীনেশ বাঁকিপুবে থাকত। আমি সত্য কথাই বলছি। সে নিজে আমাকে একথা বলেছে। এর সত্যাসত্য যাচাই করবাব আমাব কোন উপায় ছিলনা। সে তাব ভাইয়ের

-সঙ্গে থাকত। সে শিক্ষিত কিনা আমি জানিনে তার ভাইয়ের নাম আমি জানিনে।

প্রঃ ১ মে আপনি কি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এক বিবৃতি দিয়েছেন ?

উঃ হ্যাঁ। [ঐ বিবৃতি পড়ে শোনানো হলে তিনি বললেন, ঠিক আছে]।

স্বেচ্ছায় বিবৃতিতে কি বলতে হয় দীনেশ আমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছে। বিবৃতি দেবার জন্য আমার ওপর কোন চাপ দেওয়া হয়নি। [তাঁকে দীনেশের ফোটোগ্রাফ দেখানো হলে তিনি বললেন] আমি চিনতে পারছি। তাঁর পুরো নাম দীনেশ চন্দ্র রায়। ঐ জুতো আমার, আর ঐ জুতো দীনেশের। জুতোগুলো গাছতলায় ছিল। বোমা ছোঁড়বার ১০।১৫ মিনিট আগে ওখানে রেখেছিলাম। (ক্যানভাস গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা দেখানো হলে) ঘটনাস্থলে যাবার আগে ওটা ধর্মশালায় ফেলে এসেছিলাম। এই টিনে আমরা বোমাটা নিয়ে যাই। ব্যাগে তুলোর ওপর বোমাটা রাখা হয়েছিল। এই টিনটা আমরা ময়দানে ফেলে দিয়েছি। এই কাপড়ের টুকরোয় বোমাটা জড়ানো ছিল। ঠিক মনে নেই, সম্ভবতঃ এই কাপড়ের টুকরোই টিনে পড়ে ছিল। চাদরটা চিনি, রিভলভার দুটো, কার্তুজগুলো, টাকার খুতি, মোমবাতি, কোট, টাইম টেবিল চিনতে পারছি। আমাকে গ্রেপ্তারের সময় আমার কাছে ওগুলো পাওয়া যায়। রেল স্টেশনে আমি ১ মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটা বিবৃতি দিই।

আমাকে বাংলায় পড়ে শোনানো হয়। আমি স্বেচ্ছায় সে বিবৃতি দিয়েছি। আমার ওপর কোনরকম চাপ দেওয়া হয়নি। আমার মনে হয়েছে উডম্যান ম্যাজিস্ট্রেট। আমি সুনিশ্চিত নই। রেলস্টেশনে প্রথম আমি পিস্তলটা দেখি। তখন আমি মিঃ উডম্যানের কাছে বিবৃতি দিচ্ছিলাম। এটা যে দীনেশের তা আমি চিনতে পারি। কনেষ্টেবলের বিবৃতি সর্বতোভাবে সত্য নয়। তারা বলেছে যে, যখন তারা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পায় তখন তারা জাজেস কোর্ট রোডে ছিল, বস্তুতঃ আমি তাদের দেখেছিলাম ব্রাজের ওপর বসে থাকতে। (ঠিক কোথায় কনষ্টেবলরা বসে ছিল ক্ষুদিরাম ম্যাপে একটা চিহ্ন দিয়ে তা দেখান) একজন কনষ্টেবল বলেছে, কোটটা আমার সার্টের নীচে ছিল, আসলে ছিল আমার বাহুর উপর। ছোট রিভলভারটা ছিল আমার পকেটে, কেড়ে নেওয়া হয়নি। আমি পকেট থেকে ওটা বের করিনি। বাকি কথাগুলো ঠিকই বলেছে।

তাঁর বিবৃতির কোন্ অংশ দীনেশের শিখিয়ে দেওয়া জিজ্ঞাসা করা হলে

ক্ষুদিরাম বললেন, আমাদের হাওড়া ষ্টেশনে দেখা হবার কথাটা। কলকাতা ছেড়ে মজঃফরপুর রওনা হবার পাঁচ-ছ দিন আগে যুগান্তর অফিসে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়; আমি সেখানে মেদিনীপুরের যুগান্তর বিক্রি সংক্রান্ত টাকা-পয়সার হিসেব নিকেশ করতে এসেছিলাম। "যুগান্তর"-এর নামে মামলা হওয়ায় মেদিনীপুরে 'যুগান্তর' পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছল। তাই অফিসে খোঁজ নিতে এসেছিলাম। "যুগান্তরে" যাবার দু'তিন দিন পর আমি একদিন খাচ্ছিলাম, এমন সময় দীনেশ আসে। আমাকে অপরিচিত দেখে জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে আসা হচ্ছে। সে আমার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল, কেননা, এর আগে আমার বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের হয়েছিল। কিছুক্ষণ আলাপের পর দীনেশ বলল, আমি যদি একটা কাজ করি তো আমাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। সে আমাকে গুপ্তসমিতি দেখাবে। প্রথমে আমি গররাজি হই, কিন্তু সে আমাকে উৎসাহ দেয়। সে আব কিছু বলে না, আমাকে হাওডায় দেখা কবতে বলে। প্রতিশ্রুতিমত আমি হাওডায় আসি। এখানে সে আমাকে কিংসফোর্ডকে মাববাব কথা খুলে বলে। অনেক বোঝাবুঝিব পর আমি বাজি হই। পবদিন আবাব বেলা পাঁচটায় হাওডা স্টেশনেই দেখা করবার কথা দিয়ে আসি। কোথায় রিভলভাব পেয়েছি একথা কাউকে বলতে আমায় মানা কবে দেয। এখানে সে আমাকে একটা রিভলভাব দেয় এবং বলে দেয় আমি যেন বলি অমূল্যরতন দাস নামে এক ব্যক্তির কাছে সে ওটা পেয়েছে। দীনেশ যে আমাকে বোমা ছুঁড়তে উৎসাহিত করেছে একথা ভাঙতেও দীনেশ আমাকে মানা করে দেয়। তবে যেন একথা বলি যে, আমি 'যুগান্তর' পড়ে ও জনসভার বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। 'এটা সত্যি নয়'। বিবৃতির বাকিটা ঠিক আছে। একথাও সত্যি নয় যে, আমি বিভলবার দিয়ে কিংসফোর্ডকে গুলি করতেও প্রস্তুত ছিলাম। দীনেশ আমাকে একথা বলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমার আর কিছু বলবার নেই। ঘটনার দিনসহ আমি ধর্মশালায় পাঁচদিন ছিলাম। দীনেশ আমাব সঙ্গে ছিল। আমি কিশোরীবাবুকে আদৌ জানিনে, দেখিওনি। আমি দীনেশের কাছে তাঁর নাম শুনেছি। আমাব সঙ্গে কোন আলাপ হয়নি। এ স্বেচ্ছায় সত্যকথন। আমি জানি আপনি এক জন ম্যাজিস্ট্রেট।

ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীপক্ষের উকিলকে বললেন, তিনি এখনও স্থিব কবতে পারেননি কিশোরীবাবুকে এ মামলায় সংশ্লিষ্ট করা হবে কি না।

সোমবার রায় দেওয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

প্রাক-সোপর্দ তদন্তকালে কিশোরীবাবুর পক্ষে উকিল ছিলেন ; ক্ষুদিরামের পক্ষে কোন উকিল ছিলেন না। কিন্তু ক্ষুদিরামের এই শেষ বিবৃতিতে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শের আঁচ পাওয়া যায়। নিহত সঙ্গীর ওপর দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে স্বীয় দায়িত্ব কিছু লঘু হয়, তখন প্রমাণের দায়িত্ব পড়ে ফরিয়াদী-পক্ষের। আদালতে-দেওয়া শেষ বিবৃতিই সাক্ষ্য হিসেবে গ্রাহ্য। আগেকার বিবৃতি অবস্থা বিচারে গ্রাহ্য। মোট কথা, ক্ষুদিরামের এই শেষ বিবৃতি আগেকার বিবৃতির তুলনায় অনেক পরিণত বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। প্রথমাবধি এই জাতীয় বিবৃতি দিলে ক্ষুদিরামের অপরাধ সাব্যস্ত করা কঠিন ছিল, সন্দেহের অবকাশ থেকে যেতই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি সত্ত্বেও মামলা দাঁড় করানো অত সহজ হত না। তবে নিজেকে জড়ানোর কথাও আছে অনেক। ফরিয়াদী-পক্ষে সেই ছিল সুবিধে।

(২০)

ক্ষুদিরাম ও কিশোরীমোহন দায়রা সোপর্দ

২৫ মে মজঃফরপুর থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩০২।১১৪ ধারাবলে ক্ষুদিরামকে দায়রা সোপর্দ করলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীবাবুর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ ব্যক্ত করলেন :—আমি বার্থুড, এই ব'লে তোমায় অভিযুক্ত করছি, তুমি ১৯০৮-এর ৩০ এপ্রিল ও ৫ মে নাগাদ মজঃফরপুরে, তুমি জানতে অথবা জানতে বলে বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে, দীনেশ চন্দ্র রায় ও ক্ষুদিরাম বসু অথবা এই নামে তাঁদের পরিচয় দিয়েছে এমন দুজন বাঙালি হত্যাপরাধ করেছে, এদের একজনকে অথবা উভয়কেই আড়াল দেবার জন্য তুমি ইন্সপেক্টর মহম্মদ জামির আলি হোসেন ও ডেপুটি এস-পি বাচ্চুলালকে মিথ্যে খবর দিয়েছ, বলেছ, এমন কোন লোক বা লোকেরা তোমার কাছে আসেনি, তুমি এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কথা কিছু জান না, এমন কোন লোক বা লোকেদের সঙ্গে তোমার কোন রকম কারবারই হয়নি। এই অস্বীকৃতি দ্বারা তুমি ভাঃ দঃ বিধির ২০১ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছ, এই অপরাধের বিচার দায়রা আদালতের আওতায় পড়ে; তাই এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, ঐ আদালতে উক্ত অভিযোগে তোমার বিচার হোক।

কিশোরীবাবু জানালেন, তিনি সাফাই সাক্ষী ডাকবেন কিন্তু এখনই তাঁদের নাম প্রকাশ করতে চান না, দায়রা বিচারের মুখে তিনি তাঁদের ডাকবেন। মামলা দায়রা সোপর্দ হওয়ায় জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হ'ল। জামিনের আবেদন দায়রা আদালতে পেশ করতে হবে।

এরপর গোবিন্দবাবু, কিশোরীবাবুর অপবাধ জামিনযোগ্য এই যুক্তিতে দায়রা জজ কিংসফোর্ডের কাছে কিশোরীবাবুব জামিনেব আবেদন দাখিল করেন। জজ ৫০০০ টাকাব দুটি জিম্মাদাবিতে এবং একই পরিমাণ ব্যক্তিগত মুচলেকায় কিশোবীবাবুকে মুক্তির আদেশ দেন। বাবু সুবেন্দ্রনাথ সেন ও দুজন স্থানীয় উকিল জিম্মাদাব দাঁড়ান এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীমোহনকে জামিনে মুক্তিব আদেশ দেন। আদেশ জারিব প্র কোর্ট সাব ইন্সপেক্টবের সঙ্গে মিঃ মানুক উপস্থিত হন।

অমৃতবাজাব পত্রিকাব মন্তব্য: আগাগোড়াই ক্ষুদিবামের পক্ষসমর্থনে কোন উকিল ছিলেন না, এবং একবাব শুনানীকালে মিঃ কেনেডির কোচম্যানেব জেরাব সময় এমন একটা কথা বলে ফেলেছিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে সতর্ক কবে দেন, ঐ কথায় ক্ষুদিবাম নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, পুলিশেব বিবৃতি থেকে তাঁর বিবৃতিব দু'এক জায়গায় পার্থক্য ঘটেছিল। একমাত্র উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পুলিশ বলেছিল, ওয়েইনি স্টেশনে ধবা পড়লে তিনি পকেট থেকে রিভলভাব বেব কবেননি। তিনি অবশ্য তাঁব চুড়ান্ত জবানবন্দীতে তাঁর স্বীকাবোক্তির একটি কথা সংশোধন করে নেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, কোন কোন পত্রিকার লেখাব ও বক্তার প্রচারকার্য তাঁব মগজে কিংসফোর্ডকে মাববাব ভাবনা এনে দেয়। চূড়ান্ত জবানবন্দীতে তিনি বলেছেন, দীনেশই তাঁকে একাজ করতে শিখিয়েছেন। সুতরাং য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলোব এই যে কথা যে, এসব ভাবতীয় সংবাদপত্রেব লেখালেখি এবং বিশেষ এক ধবণেব সাহিত্য প্রচাবের পবিণতি, সেকথার কোন ভিত্তি নেই। ক্ষুদিবামেব বিবৃতি থেকে এই উপসংহারই এসে পড়ে যে, পবলোকগত দীনেশই ছিলেন এই অভিযানেব মূল গায়েন এবং ক্ষুদিবাম তাঁবই প্রভাবাধীন ছিলেন। কিশোবীবাবু সম্পর্কে ক্ষুদিবাম বলেছেন, তিনি তাঁকে আদৌ চেনেন না, তাঁব সঙ্গে কোনবকমই আলাপ পবিচয় হয়নি। তিনি তাঁর নাম বলেছিলেন এজন্য যে, তিনি শুনেছিলেন ধর্মশালাব ভার তাঁর ওপব। ক্ষুদিরাম এও বলেছেন যে, মিঃ কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের জন্য কেউ তাঁকে প্রবোচনা দেয়নি বা পাঠায়নি। তিনি স্বয়ং এই ভয়ঙ্কর কাজে এগিয়েছেন।

আরও জিজ্ঞাসাবাদে যদি একথা প্রকাশ পায় যে, দীনেশই তাঁকে মজঃফরপুরে এনেছেন তাতেও বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না। এদিকে কিশোরীবাবুও বলেছেন, তিনি ক্ষুদিরামকে আদৌ চেনেন না, এবং তাঁর ধর্মশালায় থাকার ব্যাপারের সঙ্গেও তাঁর কোন সংস্রব নেই। পুলিস যে দেখাতে চাইছে তিনি ক্ষুদিরামের মতলব জ্ঞাত ছিলেন—এ নিতান্তই কল্পনা। তিনি যে দায়রা সোপর্দ হবেন, তা একরকম ধরাধার্য ছিল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজ উচ্চতর আদালতের জন্য রেখেছেন। তাঁর পক্ষে জামিনের আবেদন করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন, ওটা এখন দায়রা জজের ব্যাপার। সুতরাং আবেদনটা জজ কিংসফোর্ডের কাছে করতে হয়। কিংসফোর্ড আবেদন মঞ্জুর করেন ৫০০০ টাকার দুটি জিম্মাদারি ও ১৯,০০০ টাকা ব্যক্তিগত মুচলেকায়। স্থানীয় দু'জন উকিল জিম্মাদার দাঁড়ালে কিশোরীবাবু দায়রা শুনানী সাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পান।

ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে কেউ নেই এই দুঃসংবাদ অন্ততঃ একজনকে শেষ পর্যন্ত বিচলিত করেছিল। পত্রিকা তাকে 'বি পি' নামে পরিচিত করলেন :

'বি পি' একজন আইনজীবী। পত্রিকাকে লিখলেন, তিনি দায়রা আদালতে ক্ষুদিরাম বসুর পক্ষসমর্থনের জন্য মজঃফরপুরে যেতে রাজি আছেন। স্থানীয় কোন ভদ্রলোকের যদি এমনতর ভাবনা এসে থাকে তবে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। "প্রিন্টার"-এর প্রযত্নে কোন চিঠি এলে তিনি সানন্দে সাড়া দেবেন। আমরা কিন্তু, হোক বিপথচালিত, এই হতভাগ্য তরুণের পক্ষসমর্থনের ব্যাপার নিয়ে এমন লুকোচুরির কোন সঙ্গত কারণ দেখছিনে। সভ্য ইংরেজ সরকারের এ অভিপ্রায় বা অভিলাষ হতে পারে না যে, অপরাধের গুরুত্ব যতই হোক কোন মানুষ আইনগত সাহায্যের অভাবে দুর্ভোগ পোহাবে। আইন ও বিচার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই এত ক্ষমতা রাখে যে, আসামীর পক্ষসমর্থন না হয় এমন হীন উপায় অবলম্বন তার প্রয়োজন করে না। স্বভাবতঃই যদি কোন আইনজীবী বন্দীর পক্ষসমর্থনে দাঁড়ান কোন দোষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, কেননা, এই-ই তার কাছে প্রত্যাশিত। আমরা তাই আশা করব, দায়রা বিচারকালে ক্ষুদিরাম যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট আইনগত সাহায্য পাবেন এবং ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার গৌরবময় ঐতিহ্য অনুসারে জজও ক্ষুদিরামের পক্ষসমর্থনের ব্যবস্থা করে দেবেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষেরই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হবে দেখা যেন ক্ষুদিরামের পক্ষসমর্থনে আইনজ্ঞের অভাব না ঘটে, অন্যথায় জজ ও পাব্লিক প্রসিকিউটারকেই বহুলাংশে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইংলণ্ডে বন্দীর পক্ষ-

সমর্থনে কৌঁসুলি নিয়োগে বাধ্য—হোক না তাব বিরুদ্ধে জঘন্যতম অভিযোগ, এবং সে ব্যয়ও সরকার বহন করেন। আমরা ভেবে পাইনে কেন এই রীতি এখানেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবে না।

ঐ একই তারিখে মজঃফরপুরে (২৫ মে) উত্তর বিহারের দক্ষতম ফৌজদারি উকিল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বায় কিশোবীবাবুব পক্ষসমর্থনে সওয়াল করতে গিয়ে বললেন, আইনে বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা বলে কিছু কথা নেই, আমাদের আইনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। বন্দীকে ১১৮ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এটি প্রমাণ-সাপেক্ষ যে, কাবও হত্যাব মতলব আছে বন্দী তা অবগত ছিলেন। ফরিয়াদীপক্ষ এটি প্রমাণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষুদিরাম ও দীনেশকে ঘর ভাড়া দিয়ে বন্দী নিছক কর্তব্যই পালন করেছেন, ঘব ভাড়ার টাকা তিনি পেয়েছেন। যদি তিনি নিজেব বাড়িতেও ছেলেদেব বাখতেন তাতেও তিনি দায়ী হতেন না—যদি এটা প্রমাণিত না হয় যে, দীনেশ ও তাব সঙ্গীব অভিপ্রায় তিনি জানতেন।

দীনেশের নামে মনি অর্ডারেব যে বসিদ কুপন পাওয়া গেছে তাও ফরিয়াদী-পক্ষের মামলা আদৌ প্রমাণিত কবে না। হেড ক্লার্কেব সহজ সংস্কাববশে তিনি সতর্কতার সঙ্গে এতটুকু দলিলপত্রও রক্ষা করে গেছেন। এই টাকা নেওয়াব জন্য পাছে কখনও তাঁকে জবাবদিহি কবতে হয় তাবই জন্য তিনি কুপনটি বেখে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে গোটা সাক্ষ্যই সাজানো।

কিশোবীবাবুকে বন্দী কববাব প্রকৃত কাবণটা হচ্ছে এই :—দু'জন হিন্দু কনস্টেবল ক্ষুদিরামকে ধরতে সমর্থ হয়েছে, তাবা এবং আপনি-মোড়ল বাঙালি নন্দলাল টাকায় ও বাহাদুরিতে কাববাবেব সিংহভাগ লাভ কবেছে। সুতবাং, আশ্চর্য কি, ইন্সপেক্টব আখতার আলি সাক্ষ্য বানানোয় তৎপব হয়ে উঠবেন ? এবং এই বা আশ্চর্য কি যে, পুলিস অফিসারেবা হাতে হাতে আততায়ীদেব ফোটো নিয়ে বাস্তায় রাস্তায় চেঁচাতে শুরু কববেন অনুগত নাগরিকদেব উদ্দেশে —কেউ চেনেন এদের ? ফরিয়াদীপক্ষে এ ব্যাপাবে মুখ্য সাক্ষী কে ?—না, সর্বব্যাপী একাওয়ালা, কারামুক্ত এক দাগী, এল, সাক্ষী দিল, সে দীনেশ ও কিশোরীবাবুকে দেখেছে—হ্যাঁ, একবার।

সম্রাটেব কৌঁসুলি কিশোবীবাবুব বাড়িতে-পাওয়া স্বদেশী গান ও পাণ্ডুলিপি নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি কবেছেন। সাক্ষ্য হিসেবে এব কি কোন মূল্য আছে ? কিশোরীবাবুর হাতের লেখা প্রমাণেবও কোন চেষ্টা হয়নি। বন্দীর বাড়িতে

তো আরও লোকজন আছে। তাঁব ভাইয়েব ছেলেমেয়েদেবও হতে পাবে। পরদোষে কাউকে সাজা দিতে আইন রাজি নয়।

সম্রাটের কৌঁসুলির এই সওয়াল মোটেই জোরালো নয় যে, প্রাক্‌সোপর্দ তদন্তকাবী ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল দেখবেন আপাতঃদৃষ্টিতে অপরাধ প্রতিপন্ন হয়েছে কি না, আপাতঃদৃষ্টি কথাটাব বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। আইনমতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বন্দীপক্ষেব সাক্ষ্য থেকেও সুনিশ্চিত হতে হবে আদৌ সোপর্দ কবা উচিত কিনা। সোপর্দ কববাব মত মামলা মোটে দাঁড়ায়ই নি। বন্দীকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

কিশোরীমোহন ব্যানার্জি দাযবা সোপর্দ হলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটেব রায়ে বলা হ'ল। গত ৩০ এপ্রিল বোমা বিস্ফোরণের জন্য ক্ষুদিরামকে অভিযুক্ত কবা হয়েছে। এই বন্দীকে তাঁরই সঙ্গে পূর্বোক্ত ধারামতে দায়বা সোপর্দ করা হল। তাঁব বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি ইচ্ছে কবেই ক্ষুদিবাম বসু ও দীনেশচন্দ্র বায়ের মিঃ ডি এইচ কিংসফোর্ডকে হত্যাব মতলব গোপন করেছেন—তাঁদের সে সুযোগ কবে দেবাব ইচ্ছায় এবং এই মতলবে যে, এই ভাবেই তিনি তাঁদের ঐ অপরাধ অনুষ্ঠানে সুবিধে কবে দেবেন।

বন্দীব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কি ?—না, ঘটনাব বাত্রে প্রহরারত দুজন কনস্টেবল দেখতে পায় দুটি তরুণ ক্লাবেব কাছে ঘোরাফেরা করছে। কনস্টেবলদের কাছে তরুণ দুটি বলেছে তাবা কিশোরীবাবুব ওখানে আছে। সেই রাত্রেই ইন্সপেক্টর মহম্মদ জামিরুল হোসেন বন্দীর বাড়ি যান এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন এরকম কাউকে তিনি চেনেন কিনা, তিনি বলেন চেনেন না। তিনি বলেছেন, কোন ভিন্ দেশী লোক তাঁব বাড়িতে ওঠেনি বা এমন কোন ভিন্‌দেশী সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেনও না। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম বসু ৩ মে ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিসকে ধর্মশালার সেই ঘরখানি দেখিয়ে দেন যে-ঘরে তিনি ও দীনেশ ছিলেন। ঐ ঘবের দরজা ভেঙে ঢোকা হয় এবং যেসব জিনিস পাওয়া যায় তা তালিকাবদ্ধ করা হয়। যেসব জিনিস পাওয়া যায় তার মধ্যে ছিল একটা ব্যাগ, ব্যাগে কিছু কটন উল, বোমা নিয়ে যাবার জন্য ওটা ব্যবহার করা হয়েছিল। ৫মে ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেন এবং ডি এস-পি আবার বন্দীর বাড়ি আসেন। তাঁরা ক্ষুদিবাম ও দীনেশচন্দ্র রায়ের কথা বললে তিনি বলেন, তিনি তাঁদের কখনও দেখেনও নি। গ্রেপ্তারের পব কিন্তু তিনি ক্ষুদিরামকে দেখেছেন। পুলিস অফিসারের কাছে তার এইসব বিবৃতি প্রাসঙ্গিক, কেননা, কিশোরীর বাড়ি যখন

তল্লাসী হয় তখনও তিনি এই মামলায় বন্দী হন নি। তারপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তল্লাসীলব্ধ কাগজপত্রসহ তাঁকে থানায় আনা হয়। থানার কাগজপত্র-গুলো বাছাই করা হয়। তাতে পাওয়া গেল, ৯ এপ্রিল তারিখে কিশোরীকে-দেওয়া দীনেশ চন্দ্র রায়ের কুড়ি টাকার একখানি রসিদ, দীনেশ চন্দ্র রায়ের পক্ষে বন্দীর সই-করা একটা মনিঅর্ডার কুপন, দীনেশচন্দ্র রায় ও দুর্গাদাস সেনের ঠিকানা লেখা একটি ছাপা বাংলা গানের দুখানি কাগজ।

সাক্ষীদের মধ্যে রামধারী মিশির, মেহতা ওয়ার্ডস এস্টেটের অফিস-পিয়ন। বন্দী কিশোরীমোহন ঐ এস্টেটেরই হেড ক্লার্ক। সে বলেছে, মাসখানেক আগে দুটি বাঙালি, বয়স ১৯।২০ হবে, ধর্মশালায় তার কাছে আসে এবং কিশোরীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। পরে কিশোরীবাবু তাদের ধর্মশালায় একটি ঘরে নিয়ে যান। যে বাঙালি দুটির কথা সে বলল, তাদের কাউকেই, ফোটোগ্রাফ দেখে দীনেশ বা ক্ষুদিরাম বলে সনাক্ত করতে পারল না। আর একজন সাক্ষী ইব্রাহিম দপ্তরি। এর সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করলেন, আমি মনে করি, কোন আদালতই এই সাক্ষীর বিবৃতি গ্রাহ্য করবেন না। এর আগে সে সাজা পেয়েছে। সে বলেছে, সে দীনেশকে কয়েকটি বাবুর সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছে। সেই বাবুদের মধ্যে ফরিয়াদী সাক্ষীদের অন্যতম কেশববাবুও ছিলেন। এই কেশববাবু কিন্তু দীনেশ চন্দ্র রায়কে কখনও দেখেছেন বলে বলেন নি। সে কেন কিশোরী-মোহনের বাড়ি গেছল সে সম্পর্কেও সে এক অসম্ভব গল্প ফেঁদেছে। দপ্তরি সুবাদে তার কিছু বকেয়া পাওনা ছিল, তাই সে বন্দীর বাড়ি গেছল। দু বছর আগের কথা। তাই আদায় করতে যায়। আরও এই অসম্ভব গল্প সে বলে যে, সে স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের কাছে ডাকটিকিট কিনতে গেছল। অথচ কমিশন প্রথা বাতিল হবার পর থেকে স্ট্যাম্প ভেণ্ডার তা বিক্রী করে না। আরও এক সাক্ষী এক্কা চালক ঘাসিটা। যেন হঠাৎ পাওয়া সাক্ষী। যদি সত্যিই হত্যাকারীদের অভিসন্ধি তাঁর জানা ছিল তবে এ অসম্ভব যে তাঁকে চার পাঁচবার হত্যাকারীদের সঙ্গে দেখা গেছে।

তাহলে থাকল আর দুজন সাক্ষী—পিয়ন রামধারী ও ভৃত্য খেমান। তারা যা বলেছে বন্দী মোটামুটি তা মেনে নিয়েছেন। কেবল মানেন নি খেমানের একথা যে, ঐ দুই বাঙালি হচ্ছে দীনেশ ও ক্ষুদিরাম। রামধারী তা বলেনি। কিছু দলিলও আছে। এটা পরিষ্কার যে, ক্ষুদিরাম বসু ও তার সঙ্গী ধর্মশালায় ছিলেন এবং ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে তিনি ছিলেন সে ধর্মশালার ম্যানেজার।

আমার মনে হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বন্দী জানতেন যে, (হত্যাকারীরা) সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং বন্দী দীনেশচন্দ্রের হয়ে (মনি অর্ডারের) টাকা নিয়েছিলেন এবং রসিদের ও কুপনের তারিখ থেকে বোঝা যাচ্ছে দীনেশ মজঃফরপুরে ছিলেন কিন্তু বন্দী (কিশোরীমোহন) চান নি যে, তিনি (দীনেশ) পিয়নের দৃষ্টিগোচরে আসেন। বন্দীর বাসস্থানে যে গান পাওয়া গেছে তার অনুবাদ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বন্দী চরমপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমার মতে, বন্দীর বিরুদ্ধে ১১৮ ধারা মোতাবেক অভিযোগ দাঁড় করাবার মতো এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট নয়। তথাপি সাক্ষ্য থেকে আমার মনে হচ্ছে, ৩০ এপ্রিল ও ৫ মে দু'দিনই, তিনি ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেনের কাছে ও ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস বাচ্চু নারায়ণের কাছে দীনেশ ও ক্ষুদিরাম সম্পর্কে কিছু জানেন না এমনতর বলেছেন। এ যদি করে থাকেন তবে তিনি নিশ্চিতই মিথ্যাচরণ করেছেন। এই থেকেই অনুমেয় যে, তিনি একজন অথবা দু'জন অপরাধীকেই আড়াল দিতে চেয়েছিলেন। অতএব আমি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারামতে বন্দী কিশোরীমোহন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করলাম এবং যেহেতু বন্দী (সাফাই) সাক্ষীদের নাম প্রকাশ করছেন না এজন্য আমি তাঁকে দায়রা সোপর্দ করলাম।

(২১)

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে—যেখান থেকে ক্ষুদিরাম দায়রা সোপর্দ হয়েছেন সেখানে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে কোন আইনজীবী পাওয়া যায়নি। দায়রা আদালতে স্থানীয় এক সহৃদয় উকিল এলেন ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করবেন বলে। ৮ জুন সোমবার। জজ সাধুবাদের সঙ্গে সেই উকিলকে গ্রহণ করলেন।

যে ন'জন এসেসরকে সমন দিয়ে আনা হয়েছিল তাঁদের একজন বাবু নাথুরাম প্রসাদ। দেখা গেল, তিনি ইংরেজী জানেন না। দর্শকদের মধ্য থেকে একজন পরিবর্ত খোঁজ ক'রে ব্যর্থ হতে হ'ল।

সুতরাং শুনানী এগোতে পারল না এবং ঘণ্টাকালের জন্য মুলতুবি রাখা হল —যদি একজন এসেসর পাওয়া যায়। ঘণ্টা দুই পর দু'জন বিহারী ভদ্রলোককে খুঁজে আনা হল, কিন্তু তাঁরা আসন গ্রহণ করার পর তাঁরাও খারিজ হয়ে গেলেন

এই কারণে যে, তাঁদের ওপর আনুষ্ঠানিক সমন জাবি হয়নি। সুতরাং, এবার শুনানী পরদিন (৯ জুন) সকাল সাতটা অবধি মুলতুবি রাখা হ'ল। আদালত আদেশ দিলেন ইতিমধ্যে যেন এই দুই খাবিজ ভদ্রলোকের নামে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমন জারি হয়, তাঁদের নাম—পুরুষোত্তম প্রসাদ শর্মা ও দুর্গাদাস গুপ্তি।

ক্ষুদিরামের হাবভাবে কোন পবিবর্তন লক্ষণীয় হয়নি।

সংবাদপত্রেব প্রতিনিধিগণ তাঁদেব অসুবিধার কথা (জজ) মিঃ কার্ণডাফ (Carnduff)-এব গোচবে আনলে তিনি ডায়াসে তাঁদেব স্থান করে দেবাব আদেশ দিলেন। তাঁরা ছিলেন মোট তিন জন। বংপুব থেকে এক টেলিগ্রাম এল মজঃফরপুবের এক উকিলের কাছে। বংপুরেব আবও কয়েকজন উকিল ক্ষুদিবামের পক্ষ সমর্থনের জন্য মজঃফরপুব বওনা হয়ে গেছেন।

সবকারপক্ষীয় কৌঁসুলি (কাউন্সেল ফব দ্য ক্রাউন) মিঃ মানুক (Manuk) জানালেন, কিশোবীমোহনেব জামিনের আবেদনে বিরোধিতা কববার কোন নির্দেশ তিনি পাননি।

অতিবিক্ত দায়রা জজ মিঃ কার্ণডাফ ৭ জুন পুলিশ প্রহরায় বাঁকিপুর থেকে এসেছেন। তিনি সকাল সাতটার একটু আগে তাঁর বিচারাসনে বসেছিলেন। আদালত কক্ষ ও প্রাঙ্গণে সশস্ত্র পুলিসেব সমাবেশ। মিঃ মানুক পাটনাব সবকারী অভিযোক্তা (পাব্লিক প্রসিকিউটার) বাবু বিনোদবিহাবী মজুমদাবকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, সম্রাটের পক্ষে দাঁড়াবেন।

আদালত প্রথম মন্তব্য কবলেন, কিশোরীমোহনেব বিচার পৃথক হওয়া উচিত। মিঃ মানুক রাজি হলে জজ কিশোবীমোহনকে পরশু দিন পৃথক বিচাবকালে উপস্থিত থাকবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁকে আগেকার জামিনেই মুক্তি দেওয়া হ'ল। কিশোরীবাবুব পক্ষে হাজির হয়েছিলেন বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় ও আব সবাই।

তারপব জজ ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ভাঃ দঃ বিধির ৩০২ ধারার অভিযোগটা পড়ালেন এবং বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলেন: "বন্দি, আপনি কি দোষ স্বীকাব করছেন ?"

বন্দী ক্ষুদিবাম বললেন, "হ্যাঁ, আমি দোষ স্বীকার করছি।"

সুতরাং, ৩০২।১১৪ ধারার অভিযোগ পাঠ করা অবান্তর হয়ে গেল। জজ বললেন, যদিও বন্দী দোষ স্বীকার করছেন তথাপি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় নিয়মিত বিচারের রীতি পালনই সঙ্গত হবে।

আদালত তখন জানতে চাইলেন কেউ ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন কিনা। স্থানীয় উকিল বাবু কালিদাস বসু বললেন, জজ যদি অনুমোদন করেন তবে তিনি ক্ষুদিবামের পক্ষে দাঁডাতে চান।

পত্রিকাব নিজস্ব সংবাদদাতা মজঃফবপুব থেকে ৯ জুন জানালেন, পাটনার ব্যাবিষ্টাব মিঃ মান্নুক, পাটনার পাবলিক প্রসিকিউটার বিনোদ বিহারী মজুমদার 'ক্রাউন' এব পক্ষে এবং স্থানীয় উকিল বাবু কালিদাস বসু, বঙপুবের বাবু কুলকমল সেন ও নগেন্দ্রলাল লাহিডা ক্ষুদিবামের পক্ষে দাঁডালেন। আশা কবা যাচ্ছে বঙপুবেব বাবু সতীশ চক্রবর্তী আজ দুপুবেব ট্রেনে এসে পডবেন। অর্থাৎ সওয়ালেব সময় তিনি হাজিব হ'য়ে যাবেন। এসেসর ছিলেন নাথুনি প্রসাদ ও জানকী প্রসাদ।

মিঃ মান্নক মামলাব উদ্বোধন কবলেন এবং সংক্ষেপে ঘটনার ইতিবৃত্ত বাখলেন, নিম্নতব আদালতেব পুনরুক্তি। ইংরেজীতে বললেন। এসেসররা একেবাবেই ইংবেজী জানেন না। বন্দীপক্ষও কোন আপত্তি করলেন না।

মিঃ মান্নক বললেন, পাবিপার্শ্বিক (পবোক্ষ) সাক্ষ্য খুবই প্রবল এবং ফরিয়াদী-পক্ষ বন্দীব স্বীকাবোক্তিব আদৌ আশ্রয় না নিয়েই অপবাধ প্রতিপন্নে সমর্থ হবেন।

বাবু বিনোদবিহারী মজুমদাব আদালতকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কেবল ৩০২ ধারার অথবা ৩০২।১১৪ ধাবার অভিযোগ বাংলায় বলে দেবেন? জজ বললেন, কেবল ৩০২ ধাবা বুঝিয়ে দিলেই হবে। বিনোদবাবুকে জজ বাংলায় মামলাব তথ্যগুলোও বুঝিয়ে দিতে বলেন। বিনোদবাবু তাই করলেন।

মিঃ আর্মস্ট্রং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যা বলেছিলেন তাই বললেন। আদালত যেমন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ কবছিলেন বিনোদবাবু তাই এসেসরদের নিজ ভাষায় (হিন্দি?) বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। 'ছোট হাজরি'র জন্য আদালতেব কাজ ১৫ মিনিটের জন্য মুলতুবি রইল। তারপর আবার আদালত বসলে আর্মস্ট্রংয়ের জেরা সুরু হ'ল। তিনি বললেন, হাঁ। তিনি জানতেন মিঃ কিংসফোর্ডের বিপদের কথা এবং তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিস্ফোরণের পাঁচ মিনিট পর ক্লাব ছেড়ে আসাব সময় অথবা রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে যাবাব সময় তিনি কোন হল্লা শোনেন নি। রাস্তায় লোক চলাচল স্বাভাবিক ছিল। সূচীভেদ্য অন্ধকার, মাটিতে পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হবার নয়। ফিয়াজুদ্দিন তাঁকে বলেছে, সে একজনকে "চারখানা" কোট আর একজনকে শাদা কুর্তায় দেখেছে। সে এই সিল্ক কুর্তা

সম্বন্ধে কিছু বলে নি। দীনেশের আর কোন নাম আছে কিনা সেই সম্পর্কে তিনি বিশেষ কোন খোঁজ নেন নি। তিনি এ বিষয়ে কিছু শুনেছিলেন কিন্তু এ নিয়ে তদন্ত করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। জুতোগুলি ইংলিশ ধরণের স্বদেশে প্রস্তুত কিনা বলতে পাববেন না। কোথাকার তাও বলতে পাববেন না। ক্ষুদিবাম যখন ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে বিবৃতি দেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদিরাম তাঁকে বলেছিলেন যে, দীনেশ বাঁকিপুবেব লোক। এই বিবৃতি সম্পর্কে বাঁকিপুরেব পুলিস মুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট খোঁজ নিয়েছিলেন। কিন্তু এর সপক্ষে কোন তথ্য পান নি। ক্ষুদিরাম যে দুটি রিভলভার কলকাতায় কিনেছেন বলে বলেছিলেন তিনি তাদেব নম্বব দুটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বড় রিভলভাব সংক্রান্ত তথ্য যোগাড়ে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। এটিব সর্বশেষ ব্যবহার হয়েছিল সতেব বছর আগে। বাণ্ডিলটাব কত ওজন ছিল তিনি বোধ হয় বলতে পারবেন না। শবটি যখন মজঃফরপুবে আনা হয় তখন একটা ধুতি ছিল। আব কিছু নয়। ঘটনাব পব তিনি ধর্মশালায় দু একজনকে জিগগেস করেছেন তাবা দুটি ছেলেকে দেখেছে কিনা। তখন তিনি যে ঘবে ওরা থাকতেন সে-ঘরটা দেখেন নি। তাঁকে বলা হবেছিল যে, দুটি মানুষকে ধর্মশালার দিকে ছুটে যেতে দেখা গেছে। ধর্মশালাব ঘরে একটা কম্বল ছিল।

মজঃফবপুরেব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উডম্যান কালিদাস বাবুব জেবাব উত্তরে বলেন, বন্দী প্রথমে যে বিবৃতি দেয় তা দীনেশকে আড়াল দেবাব জন্য, পরে যে নিজেকে দোষী বলে তা আত্মগবিমা জাহিবের জন্য।

তিনি বলেন, ক্ষুদিবাম যখন বিবৃতি দেন তখন তিনি যে ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষুদিবামকে তা বলেছিলেন বলে তাঁর মনে পড়ে না। কারণ ক্ষুদিবাম জানতেন। তিনি তাঁকে কাছাবিতে নিয়ে যান। বর্ণনাব আকাবে তিনি ঐ বিবৃতি নথিবদ্ধ করেন। পুলিশ ইন্সপেক্টব বাংলা জানতেন, তিনি মাঝে মাঝে তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন বন্দী ম্যাজিস্ট্রেটেব বাংলা বুঝতে পারেন নি।

ক্ষুদিরামেব দ্বিতীয় দিনেব দায়বা বিচার বসল ১০ জুন। কিশোরীবাবু আদালতে হাজির হলে সেই জামিনই পেলেন। ফৌজদারী কার্যবিধিব ৩৬১ ধারামতে আদালত ক্ষুদিরামকে জিগগেস করলেন: যেসব সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা আপনি বুঝেছেন ? ইংবেজী সাক্ষ্য বোঝেন ?

উত্তব: আমি ঠিক বুঝি না।

আদালত তখন আদেশ দিলেন সব সাক্ষ্য হিন্দীতে বুঝিয়ে দিতে হবে।

পেস্কারকে জিগগেস করতে বলা হল ক্ষুদিরাম গতকালের হিন্দী অনুবাদ বুঝেছেন কি না। ক্ষুদিরাম বললেন, বুঝেছি।

৫নং সাক্ষী মিঃ বব উইলসন জেবার উত্তরে বলেন, আমি যে দ্বিতীয় শব্দটা শুনেছিলাম তা প্রথমটাব মত জোবে নয়। আমাব মতে দুটো শব্দ হয়েছিল। দ্বিতীয়টা প্রথমটাব প্রতিধ্বনি বলে মনে কবিনে। এটা তত জোর নয়। আমি কানে খাটো নই।

ফবিয়াদীপক্ষে পাল্টা জিজ্ঞাসা কবলেন মিঃ মান্নুক এবং সাক্ষী জবাব দিলেন, দ্বিতীয় শব্দটা প্রতিকম্পনের চাইতেও স্পষ্টতব ও তীক্ষ্ণতর, হতে পারে রিভলভাব বা পিস্তলেব শব্দ।

৬নং সাক্ষী, ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস মিঃ বাচ্চু নাবায়ণ, বাবু কালিদাস বসুর জেবাব উত্তরে বলেন, কনস্টেবল ইয়াকুব ও ফিয়াজুদ্দিনেব কাছে দু'জন নবাগতেব বর্ণনা শুনেছি, তহশীলদাব খানেব কাছ থেকে নয়। ইয়াকুব বেল স্টেশনেব কাছে ৩০ তাবিখের মাঝ বাতে খবব আমাকে দিয়েছিল। ফিয়াজুদ্দিন ঘটনাস্থলে আমাকে খবর দেয়। তখন মিঃ উডম্যান তার জবানবন্দী নিচ্ছিলেন। বাত নটা সাড়ে নটা হবে। আমি সেখানে পৌছোবাব পরে পবেই। আমি তদন্তকালে সর্বক্ষণ থাকিনি। আমি ২রা কলকাতা রওনা হয়ে যাই। আমি একদিন কলকাতা ছিলাম। আমি দীনেশ সম্পর্কে খোঁজ নি।

আদালত : আপনি বুঝি শুনেছিলেন?

হ্যাঁ, তিনি কোথায় থাকতেন শুনেছিলাম, তাঁর আসল নাম প্রফুল্ল চাকী।

আদালত : এও আপনি শুনেছেন?

হ্যাঁ।

বাবু কালিদাস : দীনেশ কলকাতায় কোথায় থাকতেন খোঁজ নিয়েছিলেন?

উঃ মানিকতলায়।

আদালত : যাচাই করেছিলেন?

উঃ হ্যাঁ, যাচাই কবেছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও বিপিন চন্দ্র পাল কলকাতায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি গীস্পতি কাব্যতীর্থের কথা জানিনে। আমি ক্ষুদিরামের বাড়ির খবর নিয়েছিলাম। আমি ভাল করেই জেনে নিয়েছি ক্ষুদিরামের বাড়ি মেদিনীপুর। আমি কলকাতায় বন্দীর কোন "মামু"র সঙ্গে দেখা করি নি। আমি অমূল্য রতন সম্পর্কেও কোন খোঁজ নিই নি। আমি বন্দুকের দোকানগুলোয় যাই নি। কলকাতা থেকে ফিরে আট দশ দিন পর

আমি খেমানের জবানবন্দী নি। ঐ দিনই একই সময়ে পিয়নের জবানবন্দীও নি কলকাতা থেকে ফেবার দু'দিন পর জ্ঞানেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করি।

আবার মিঃ মান্নুকের জিজ্ঞাসায় তিনি বলেন, আমি অপরাধ ও রেল বিভাগীয় ডি আই জি মিঃ প্লাউডেনকে কাগজপত্র দেখাবাব জন্য কলকাতা যাই। আমি তখন চৌকিদার ও পিয়নেব কাছ থেকে কিশোরীব খববাখবব নিচ্ছিলাম।

এবপব এলেন সশস্ত্র প্রহরাধীনে মিঃ কিংসফোর্ড সাক্ষ্য দিতে। নতুন জবানবন্দী হিসেবে তিনি বলেন, তিনি একবাব রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে "নবশক্তি"বও বিচাব কবেন। দেশীয় সংবাদপত্রে তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনাব লক্ষ্য হযেছিলেন। বিচারেব পর আক্রমণ বেশি করে ব্যক্তিগত হয়ে পড়ে। অভিযোগেব ও অন্যান্য কাগজ পড়েই আমি এ কথা বলছি। আমার কলকাতা থেকে বদলিব পব তা ক্ষান্ত হয়। আমাব নিবাপত্তার জন্য ২০ তারিখ নাগাদ লেখা কলকাতা পুলিস কমিশনাব মিঃ হ্যালিডেব চিঠি আমি দেখেছি। আমাকে বক্ষা কববাব জন্যে পুলিস কি ব্যবস্থা নিয়েছিল তা আমি তখন লক্ষ্য করিনি।

কালিদাস বসুর জেবার উত্তবে বলেন, কলকাতার ছেলেদের (আমার প্রতি) কি মনোভাব ছিল তা আমি জানি নে। দু'বাব আমি আদালত থেকে বেবিয়ে আসবাব সময় বাস্তায় জনতার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছি। কিন্তু জনতাব মধ্যে ছেলেদের সংখ্যানুপাত কত তা বলতে পাবব না। আমি বাঙলার অন্যান্য জেলায়ও ছিলাম। ববিশালে ছিলাম। সেখানে কেউ আমাকে অসম্মান দেখিয়েছে বলতে পাবব না। আমি কখনও মেদিনীপুব বদলি হই নি।

ঘটনাব দিন কেনেডিব গাড়ি চালিয়েছিল কোচম্যান কালিরাম: তাব সাক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যা বলেছিল তাব কিছু সংশোধন করে বলল, আমি একজনের গায়ে শাদা "কাপড়া" আব একজনেব গাযে কালা "কাপড়া" দেখেছি। দেখলাম, দক্ষিণে গাছেব নীচ থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এল। তারা ছুটে গাড়িটাব দিকে এল। সইস হৈ হৈ কবে উঠল। দেখলাম, একটি লোক কি গোল মত জিনিস গাড়িব ভেতবে যেখানে আওবত লোক বসেছিলেন সেই দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি একজনেব মুখ "ভাকুভি" (সর্বতোভাবে) দেখলাম, সে-ই বোমাটা ছুঁড়েছিল, আর একজনকে আমি ভাল দেখিনি। লোকটি ঠিক ঢেঙ্গাও নয়, বেঁটেও নয়, দুবলা মত, সতেব আঠারো বছর উমর হবে। আমি বলতে পাবি, ডকে যে আদমী আছে এ সেই।

প্রঃ বলতে পাব বন্দীই সেই লোক কিনা ?

উঃ খেয়াল আতা কি এইসানি আদমি থা, এহি থা।

জেরার উত্তরে বলল : মিঃ উডম্যান সর্বপ্রথম আমার জবানবন্দী নেন। এর পর জয়েণ্ট সাহেব। আমি এর আগে বলিনি বন্দীই সেই লোক। তবে বলেছি, এইসা আদমি। দ্বিতীয় লোকটি যেন কি একটা গোলমত ছুঁড়েছিল। আগুনের মত কি যেন লাগল আমার পেছনে। গোল জিনিসটা এই এত বড একটা তরমুজের মত। আর একটা ছিল এই এত বড মুঠিভর। আমি প্রথমে একজনের কথা বলেছিলাম ; জয়েণ্ট সাহেবকে দ্বিতীয় জনের কথাও বলেছিলাম, কালেক্টরকে বলেছি 'দোসরা রোজ'। আমার নিজের জখমের কথা কোন ম্যাজিস্ট্রেটকেই বলিনি। আমি প্রথমে তা ডি এস পি বাচ্চু নারায়ণকে দেখাই, তিনি তা ডাক্তারবাবুকে দেখান। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি বলে আমি 'কালাকাপড়ার' কথা বলিনি।

দ্বিতীয়বারের জবানবন্দীতে বলে, ভীতি ও বিহ্বলতার জন্য আমি আমার জখম দেখাইনি। (সাক্ষী একটা অস্পষ্ট কালো দাগ দেখাল)।

৮নং সাক্ষী সঙ্গৎ সইস জেরার উত্তরে বলল, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলাম, ঘটনার রাত্রে যাকে আমি দেখেছিলাম সে 'দুলা পাতলা'। হাসপাতালে আবার আমার জবানবন্দী নেওয়া হয়। আমি কালেক্টরকে কামিজের কথা বলেছিলাম। আমি বলতে পারব না বন্দী এখন যা পরে আছে তা 'পাঞ্জাবী আস্তিন কোর্তা' কিনা। পাঞ্জাবী আস্তিন কোর্তা কাকে বলে তা আমি জানি। আমি কালেক্টরকে তার কথা বলিনি। আমি একজন 'ঘাসিয়ারার' নাম বলেছিলাম। আমি আর একজনের নাম জানিনে। দুজন ঘাসিয়ারা ছিল। আমাকে রাস্তার মাঝখান থেকে তুলে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয়বার জবানবন্দীতে বলে, যে ছুঁড়েছিল তার গায়ে কামিজ ছিল বলে মনে হয়েছিল তখন, সেটা পাঞ্জাবী কামিজ কিনা তা আমি খেয়াল করিনি। সাধারণ কামিজের স্লিভ (হাতা) থাকে, সার্টের কাফ থাকে, পাঞ্জাবী আস্তিনে তা থাকেনা। আর কোন পার্থক্য নেই। ঘটনার রাত্রে কামিজটার কাফ ছিল কিনা খেয়াল করিনি।

এই সময় মিঃ মান্নুক আদালতকে জানান যে, মেজর স্মলউডের কাছ থেকে এইমাত্র চিঠি পাওয়া গেল যে, তিনি আজ পৌনে বারোটায় এসে পৌছোচ্ছেন। জজ বললেন, তিনি পৌছোবামাত্র তাঁর জবানবন্দী নেবেন ; কিন্তু তাঁর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে কি ?

মিঃ মাহুক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, দরকার হবে।

৯নং সাক্ষী তহশীলদার খান (কনস্টেবল) জেরার উত্তরে বলে, আমি বাঙালিদের পকেট তালাস করিনি। ফিয়াজুদ্দিন থেকে আমি দুই কদম দূরে ছিলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ বিস্ফোরণ হয়েছিল। আমরা এক জায়গায় থেমে থাকিনি। কখনও ক্লাব গেটে কখনও ক্লাব প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি ঘুরে ফিরেছি। আমরা জজের প্রাঙ্গণে ঢুকেছি এবং ময়দানের কাছাকাছিও গেছি। আমি পূব থেকে র‍্যাকেট কোর্ট হয়ে ক্লাবের গেটে গেছি। বিস্ফোরণের আগে আমি এস পি'র গাড়িটা ক্লাব ছেড়ে যেতে দেখিনি। আমি ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে জজের গাড়ি বেরোতে দেখিনি। আমি যখন বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম তখন জজের গাড়ি ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসেনি। এর জন্য আমি অপেক্ষা করিনি। বিস্ফোরণের পর আমি আর্তনাদ তুলে ছুটতে থাকি। ক্লাব থেকে আর কেউ ছুটে এসেছিল কিনা আমি জানিনে। তাঁকে তাঁর গাড়ি বারান্দার নীচে দেখবার আগে জজ সাহেবকে আমি দেখিনি। বিস্ফোরণের পর গাড়ি থেকে আগুনের শিখা ওঠে। শাদা শিখা। গুলি ছুঁড়লে যেমন হল্কা বেরোয় তেমন। আমি সইসকে রাস্তার ধারে দেখলাম। ফিয়াজুদ্দিন আমার পাশেই ছিল।

দ্বিতীয়বারের জবানবন্দীতে বলে, আমরা শাদা পোষাকে ছিলাম। মিঃ কেনেডির গাড়ি বেরিয়ে আসবার ৫।১০ মিনিট পর আমরা ক্লাব প্রাঙ্গণের গেটে পৌছোলাম।

১০ নং সাক্ষী ফিয়াজুদ্দিন জেরার উত্তরে বলে, আমি ও তহশীলদার খান বরাবর একসঙ্গে ছিলাম। ক্লাবের গেট পর্যন্ত যাবার আগে আমরা রাস্তার উত্তরে র‍্যাকেট কোর্টের কাছে ছিলাম। বিস্ফোরণের আগে আমি জজের গাড়ি ক্লাব প্রাঙ্গণ ছেড়ে যেতে দেখিনি। আমি সে রাত্রে জজের গাড়ি মোটেই দেখি নি। আমি এর আগে কেনেডির গাড়ি দেখেছি। বিস্ফোরণের পর ওটা আমি ডাকবাংলোর কাছে দেখি।

আদালতের জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, আমি সে রাত্রে গাড়িটা আদৌ দেখিনি।

আদালত : তবে তুমি বললে কেন তহশীলদার খান দেখল ও আমায় বলল ?

সাক্ষী : আমি গাড়িটা ঐ অবস্থায়ই দেখি, পরদিন ওটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় ছিল। আমি গাড়িতে কোন আগুনের শিখা দেখিনি। শিখা জ্বলে ওঠে এবং আগুন ধরে যায়। আমি গোল পোষ্ট পর্যন্ত চলে আসি। তারপর আমি

জজ-কোঠির গেটে আসি। সইস তখন রাস্তার পাশে পড়ে ছিল। 'দেখো ভাই, বাপরে বাপ, দৌড়্তে যাও' বলে চীৎকার করতে করতে আমি ছুটে যাই।

১২ নং সাক্ষী জেরার উত্তরে বলল, দুটি লোক যখন ছুটে যাচ্ছিল তখন আমার মনে কোন সন্দেহ হয়নি।

১১ জুন ক্ষুদিরামের দায়রা বিচারের তৃতীয় দিন। মজঃফরপুর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হেড ক্লার্ক কেশবলাল চ্যাটার্জি জেরার উত্তরে বললেন, আমি বন্দীকে কালেক্টরের আদালতে ২রা সাড়ে সাতটায় দেখেছিলাম। ভগবতীচরণবাবুর মেয়ের বিয়ের কথা আমার মনে আছে, তারিখটা মনে নেই। এটা গুড্ ফ্রাইডের ছুটির সময়। আমি সেখানে "বরাত" দেখতে গেছলাম, বরযাত্রীরা ধর্মশালায় উঠেছিল। আমি সেখানে বন্দীকে দেখিনি। আমার বন্ধুর নাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি ২ তারিখে কাছারিতে ছিলেন কিনা জানিনে। আমি তাঁর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি, কেননা, তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আমার কি আলাপ হয়েছিল তার কিছুই কালেক্টরকে না বলায় বন্দীর ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে।

আদালতের জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমি সুনিশ্চিত। আমি যে তারিখে বন্দীকে কালেক্টর-আদালতে দেখি সেদিন তাঁর মাথার চুল ছিল আরও লম্বা। তাঁর চেহারায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। আমার প্রবল ধারণা, এই বন্দীই সেই মানুষ।

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মহতাব ধর্মশালার ভৃত্য খেমান কাহার নিজেকে চৌকিদার বলে পরিচয় দিয়েছিল। একথা সে দায়রা আদালতে অস্বীকার করল। চেপে ধরলে সে বলে, আমি চৌকিদার। কিশোরীবাবু আদেশ দেন বন্দী ও তাঁর সঙ্গীকে এক সঙ্গে থাকবার একটা ঘর ঠিক করে দিতে। আমি তাই করে দি। ভগবতীচরণের "বরাত" যখন পৌঁছে গেল আমাকে তখন কিছু-দিনের জন্য ধর্মশালা পরিষ্কার রাখার আদেশ দেওয়া হ'ল। অন্যান্য মুসাফিরকে চলে যেতে বলা হ'ল, কেবল থাকলেন পশ্চিম বারান্দায় এই দু'জন। আট-দশ দিন আমি তাঁদের দেখিনি, কেননা, "বরাত"-এর জন্য দরজা বন্ধ ছিল। আট দশ দিন পর আমি বন্দীকে দেখলাম পশ্চিম বারান্দার অদূরে রান্না করছেন। যেদিন বোমা ফাটে সেই রাত্রেই আটটার সময় আমি দু'জন আউরতের মৃত্যু খবর পাই। ঐ দু'জন যখন ধর্মশালায় ছিলেন আমি তখন মাঝে মাঝে তাঁদের দেখেছি। বন্দীর তালা-দেওয়া ঘর কি ক'রে ভাঙা হ'ল আমি বলতে পারব না।

জেরার উত্তরে বলল, "বরাত" থাকতেই তখন ধর্মশালায় পুলিস এসেছিল। ব্যাগটা নিশ্চয়ই বন্দী ও তাঁর সঙ্গীর কাছে ছিল যখন তাঁরা পশ্চিম বারান্দায় যান। কিন্তু আমি সেটা দেখিনি। কালেক্টর খোলার আগে ঘরে বন্দীর জিনিসপত্র আমি দেখিনি। আমি বারান্দাতেও এসব কিছু দেখিনি। আমি বরাতের সময় একজন চৌকিদার ছিলাম কিন্তু আমি ঝাঁট দিই নি। ঐ সময় দিনরাত্রি গেট বন্ধ থাকত। বরাত-এর লোকেরা সদর গেট দিয়ে যাতায়াত করত," ঐ গেটটা সর্বক্ষণ খোলা থাকত।

ফরিয়াদীপক্ষ থেকে আবার জবানবন্দী নেওয়া হলে সে বলে, সদর ফটকই হচ্ছে উত্তরের গেট। পশ্চিমে যে আর একটি গেট, "বরাত"-এর লোকেদের জিনিসপত্রের নিরাপত্তার জন্য সেটি বন্ধ থাকত। যখন বরাত সেখানে ছিল তখন আমি ধর্মশালার ভেতরে যেতাম। আমি সেখানে থাকতাম। চৌকিদারের ডিউটি দিতে নয়।

ধর্মশালায় চাপরাসী রামধারী বলল, চার বছর আগে কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ আসবার সময় থেকে আমি এই কাজে আছি। (এর আগে সে বলেছিল ১১ বছর)। যখন ধর্মশালায় আসেন তখন বন্দীদের সঙ্গে কোন তল্পিতল্পা দেখিনি। বন্দী তাঁদেরই একজন কিনা বলতে পারব না। এই রকমই বয়স হবে। মুসাফিরদের সম্পর্কে আমার কিছু করবার ছিল না।

জেরার উত্তরে বলল, আমার অফিস ধর্মশালায়।

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবল ফতে সিং বলল, পিস্তলটা তাঁর কোমর থেকে পড়ে গেছল। তাঁর কোটটা ছিল একটা সার্টে জড়ানো। সার্টটা ধুতিতে গোঁজা ছিল। ওটা মাটিতে পড়ে নি। কোট পকেটে কি পাওয়া গেছল আমার মনে নেই। এই দেশলাই ও মোমবাতি তাঁর সার্টের পকেটে ছিল। আমি ঠিক বলতে পারব না, ঘড়ি ও চেন পাওয়া গেছল কিনা। টাকার খুঁতিটা ধুতিতে গোঁজা ছিল। কতকগুলো কার্তুজ কোট পকেটে ছিল। ছোট পিস্তলটা তাঁর কোমর থেকে টেনে বের করা হয়েছিল। যতটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম, আর একটা তাঁর পাশ থেকে পড়েছিল। যখন তিনি খাচ্ছিলেন তখন আমি কোটটা কোথায় ছিল দেখেছিলাম। লুকোনো ছিল। তখন কোনো পিস্তল ঝুলতে দেখিনি। তিনি যখন জল খাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁর কোট দেখতে চেষ্টা করিনি। দেশলাই আর মোমবাতি ছাড়া সার্টের পকেটে কিছু পাওয়া যায়নি।

আবার ফরিয়াদীপক্ষের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে, তাঁর সঙ্গে কোন ম্যাপ বা বই পাওয়া যায়নি। একটা টাইম টেবিল ছিল। আমি কোন নক্সা লক্ষ্য করিনি।

শিউপ্রসাদ মিশির আর একজন সশস্ত্র বাহিনীর কনস্টেবল। জেরায় উত্তরে বলল, ধুতির খুঁটে কিছু ছিল কিনা আমার মনে নেই। ঘড়ি ও চেন কোন এক পকেটে ছিল, সার্টের পকেট না কোটের পকেট বলতে পারব না। কার্তুজগুলো পকেটে ছিল। ছোট কার্তুজগুলো ছিল কুর্তার পকেটে। কোটটা লুকোনো ছিল, খানিকটা দেখা যাচ্ছিল।

ফরিয়াদী পক্ষের আবার জিজ্ঞাসাবাদে বলল, দুরকমের কার্তুজ ছিল। কার্তুজগুলো দেখানো হ'লে বলল, এখন দেখছি তিন রকম। কোন্ কার্তুজ কোন্ জায়গায় পাওয়া গেছল মনে করতে পারছিনে।

রংপুরের উকিল, বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী আদালতের কাছে এই সময় বন্দীর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলবার অনুমতি চাইলেন, টিফিনের মুলতুবি কালে সেই অনুমতি পাওয়া গেল।

ক্ষুদিরাম ও উকিলের সংলাপ

সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত ক্ষুদিরামের সঙ্গে যে আলাপ হ'ল পুলিস তা কান পেতে শুনল, ইন্সপেক্টর ভূপেন ব্যানার্জী সব কথাই টুকে নিলেন।

ক্ষুদিরাম বললেন, আমি মেদিনীপুর শহরের অধিবাসী। বাপ মা নেই, ভাই নেই, কাকা, মামা কেউ নেই। এক দিদি আছেন, তাঁর অনেক ছেলেপুলে, বড়টি আমার সমবয়সী। মেদিনীপুরে, জজের হেডক্লার্ক, বাবু অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে দিদির বিয়ে হয়। ওরাই আমার একমাত্র আত্মীয়। অবিনাশচন্দ্র বসুও আমার আত্মীয় কিন্তু আমার সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

আমি সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিলাম। আমি দু'তিন বছর আগে পড়া ছেড়ে দিয়েছি। তখন থেকে আমি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি, সেই থেকে আমার জামাইবাবু (ভগ্নিপতি) অমৃতলাল রায় আমাকে ত্যাগ করেন। আমার মা নেই, আমার বাবা দশ এগারো বছর আগে মারা গেছেন। আমার সৎমা ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই সুরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের কাছে থাকতেন। আমি তাঁর ঠিকানা জানিনে, কি করেন তাও জানিনে।

প্রঃ তুমি কি কাউকে দেখতে চাও?

উঃ হ্যাঁ, আমি একবার মেদিনীপুর দেখতে চাই, আমার দিদি ও তার ছেলেপুলেদের।

প্রঃ তোমার মনে কোন কষ্ট আছে ?

উঃ না, কোনরকমই না।

প্রঃ আত্মীয়স্বজনকে কোন কথা জানাতে চাও কি ? অথবা তাদের কেউ এসে তোমায় সাহায্য করুক এমন ইচ্ছে করে কি ?

উঃ না, আমার কোন ইচ্ছাই তাদের জানাবার নেই। তাঁরা যদি ইচ্ছে করেন আসতে পারেন।

প্রঃ জেলে তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হয় ?

উঃ মোটামুটি ভাল। খাবারটা (ভাতটা ?) বড় মোটা, আমার ঠিক সহ্য হয় না। শরীরটা খারাপ করে দিয়েছে। নচেৎ, আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করা হয় না। আমাকে একটা নিঃসঙ্গ সেলে আটকে রাখে, সেখানেই দিন-রাত্রি থাকতে হয়। একবার মাত্র স্নান করার সময় বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়। একা থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সংবাদপত্র বা অন্য কিছু পড়তে দেওয়া হয় না। এগুলো পেতে খুবই ইচ্ছে করে।

প্রঃ কোন রকম ভয় করে তোমার ?

এ প্রশ্ন শুনে ক্ষুদিরাম একটু হাসলেন, বললেন, ভয় করবে কেন ?

প্রঃ গীতা পড়েছ ?

উঃ হ্যাঁ, পড়েছি।

প্রঃ তুমি জান, আমরা রঙপুর থেকে তোমার পক্ষসমর্থনে এসেছি ? কিন্তু তুমি তো এর আগেই দোষ স্বীকার করেছ।

ক্ষুদিরাম হেসে জবাব দিলেন : কেন করব না ?

উকিলেরা তখন তাঁকে ভগবানের নাম স্মরণ করতে বললেন। ক্ষুদিরাম আশ্চর্য সংযম ও স্থৈর্যের পরিচয় দিলেন প্রত্যেকটি কথা বলবার সময়। মনে হল তিনি একান্তই নিস্পৃহ, তাঁর মুখে চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই।

সাব-ইন্সপেক্টর চতুর্বেদী শর্মা জেরার উত্তরে বললেন, দীনেশের ফতুয়াটা সম্ভবতঃ পুরানো ছিল। ধুতিটা শাদা ও নতুন। আমি কখনও সমস্তিপুর যাইনি।

সিংভূমের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি জবানবন্দীতে বলল, মজঃফরপুর থেকে সিংভূম রওনা হবার আগেই আমি দীনেশকে ধরতে পারলে পুরস্কার দেবার ঘোষণা শুনেছিলাম। পয়লা তারিখে আমি দীনেশকে হত্যাকাণ্ডের

কথা বলি। তাঁকে বেশ কৌতূহলী মনে হল। আমি স্বদেশী ও ভলাণ্টিয়ার আন্দোলনের কথা তুললাম। যে পিস্তল দিয়ে দীনেশ আত্মহনন করেন সেটা দশ ঘরা ছিল। আমি ঘর গুণে দেখিনি। পিস্তলটার ম্যাগাজিনে কয়েকটি তাজা কার্তুজ ছিল।

জেরার উত্তরে বলে, সমস্তিপুরে জুতো ও কাপড়ের দোকান আছে। দীনেশের দেহে কত টাকা পাওয়া গেছল তা আমার স্মরণ নেই। আমি দীনেশের সঙ্গে গোলাগুলি সম্পর্কেও আলাপ করেছি। তিনি জার্মান গোলাগুলির কথা বলেন। দীনেশ নদীর জল খেতে সমরিয়াঘাটে গেছলেন। তিনি স্নান করেন নি।

ক্ষুদিরামের চতুর্থ দিনের দায়রা বিচার (১২ জুন) আরম্ভের আগে হিজ হাইনেস লেঃ গবর্ণর এক বিশেষ হুকুমনামায় কালেক্টর মিঃ উডম্যান ও এস-পি মিঃ আর্মষ্ট্রংকে তাঁদের তৎপরতার সঙ্গে ক্ষুদিরাম ও দীনেশকে ধরে ফেলবার জন্য যে ধন্যবাদ জানান তা পড়া হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি নন্দলাল ব্যানার্জি, কনস্টেবল শিউশঙ্কর ও ফতেসিং এবং মজঃফরপুরের জুনিয়র কোর্ট ইন্সপেক্টরেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

পোস্টম্যান যোগেশ্বর তেওয়ারী জেরার উত্তরে বলে, বাবু ভগবতীচরণের "বরাত" ধর্মশালায় চারদিন ছিল। আমি এই কদিন সেখানে চিঠি বিলি করেছি। কখনও পশ্চিম গেট দিয়ে কখনও উত্তর গেট দিয়ে ভেতরে ধর্মশালা গেছি। "বরাত"-এর ব্যবস্থা দেখবার জন্য কিছু পুলিসকে দেখেছিলাম। ও জায়গার আশেপাশে অনেক গাড়ি ছিল। কিন্তু বলতে পারব না কারা "বরাত"-এর পর এসেছিল। আমি ধর্মশালায় ৯ এপ্রিল দীনেশ চন্দ্র রায়ের মনি অর্ডার দিয়েছি। দীনেশের নামে ঐ একটাই মনি অর্ডার আমি এনেছিলাম। সেটা "বরাত"-এর আগে না পরে তা মনে করতে পারছিনে। তাঁর নামে কোন চিঠি ডেলিভারি দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। দিয়ে থাকতেও পারি। আর যদি তা কিশোরী-বাবুর কেয়ারে (প্রযত্নে) এসে থাকে তবে তা অফিসেই গেছে।

"বরাত"-এর জন্য আমি দু'চারজন পুলিসকে পাহারায় থাকতে দেখেছি। আমি ধর্মশালার উঠোনে দেখেছি—কোন ঘরেও নয়, বারান্দায়ও নয়।

মজঃফরপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বোল্যাণ্ড চন্দ্র বলেন, তিনি জেলে এক-জোড়া জুতো ক্ষুদিরাম বসুর পায়ে মিলিয়ে দেখতে যান, ক্ষুদিরাম যেচে বলেন ও জুতো তাঁর। জেরার উত্তরে বলেন, জুতো জোড়া ল্যাটিমার এণ্ড ক্রাকের তৈরি কিনা বলতে পারব না। আমি ল্যাটিমার এণ্ড ক্রাকের তৈরি বুট ও

জুতো দেখেছি। জুতোর বৈশিষ্ট্য আমি বলতে পারব না। আমি শুধু অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এই জুতো অতি সুবিদিত। আমি একবার ল্যাটিমার এণ্ড ক্রীকের জুতো দেখেছিলাম। আমার ভাই পরেছিল, তাতে প্রস্তুতকারকের নাম ছাপা ছিল। এখানকার জুতোয় সেরকম কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিনে। (বন্দী সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় বললেন : "এ আমার।")

কর্ণেল গ্রেঞ্জারের সাক্ষ্য দাখিল ও এসেসরদের তা পড়ে শোনাবার সময় আদালত প্রেস রিপোর্টারদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন এ প্রকাশ না করেন।

এরপর ক্ষুদিরাম প্রাক্-সোপর্দ তদন্তের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্থুডের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা এসেসরদের উদ্দেশে পড়ে শোনানো হল। যখন এই বিবৃতিটি দাখিল করা হয় তখন জজ মন্তব্য করেন, বিবৃতিতে প্রশ্নোত্তর বড় দীর্ঘ এবং বন্দীকে যেন জেরায় ফেলা হয়েছিল। "I do not think", জজ মন্তব্য করলেন, "I can take it in". জজ এখানে কার্যবিধির ৩৪২ ধারাটি পড়ে বললেন, "The statement of the accused should not be used to fill up the gap in the evidence of prosecution".

মিঃ মান্নুক : ম্যাজিষ্ট্রেট লিখেছেন, আমার বাধা দেবার কোন অধিকার ছিল না।

জজ : হ্যাঁ, দেখছি। (ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৪২, ২৮৭ ধারা পড়লেন) "Yes, I shall let it in, but the weight to be given to this statement, is a matter of discretion with me".

ফরিয়াদীপক্ষের মামলা শেষ হল। আদালত ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন : কোন সাক্ষী আছে ?

ক্ষুদিরাম জবাব দিলেন : না।

আদালত মান্নুক ও কালিদাস বসুকে বললেন : আপনারা সওয়ালে কত সময় নেবেন ? তাঁরা বললেন, এক ঘণ্টার মত। জজ ও এসেসরগণ তখন বাইরে এসে মিঃ কেনেডির বিধ্বস্ত গাড়িটা দেখলেন।

(২২)

এই পটভূমিকায় বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টায় তৃতীয় শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ব পরিচয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলতে একখানি : ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রের 'শহীদ ক্ষুদিরাম'। মহাপাত্র মশাইর আর একখানি ইংরেজী বই :

Boy Revolutionary of India. বাংলা বইখানির প্রকাশকাল স্বাধীনোত্তর ১৯৪৮, ১১ আগষ্ট। ফাঁসীর ঠিক ৪০ বছর পর। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে "বৈপ্লবিক যুগের আদিপর্বের অগ্নিসাধক ও বোমাশিল্পী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো মহাশয়ের করকমলে"। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ কালিদাস নাগ, লিখেছেন, "বহু পরিশ্রমে রচনা করেছেন· ক্ষুদিরামের নিজ ভগ্নী ও অন্য আত্মীয় বন্ধুদের কাছে গিয়ে কাহিনীগুলি সংগ্রহ করেছেন।" ১৯৪৭, ১১ আগস্ট প্রকাশিত ইংরেজী বইখানি সম্পর্কে লেখক স্বয়ং বলেছেন, "তাড়াতাড়ি লিখিত।" ভুলভ্রান্তির জন্য প্রকাশকের তাগিদকে দায়ী করেছেন। লেখার তারিখ আগষ্ট ১৯৪৭। মেদিনীপুরের উকিল, এম-এ বি এল। প্রকাশকের বন্ধু। তৃতীয় একখানি বইয়ের নাম "শহীদ-যুগল," তাতে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর জীবনী আছে। লেখক নোয়াখালার মানুষ, খুব খেটে লিখেছেন।

যে-কোন জীবনী সম্পর্কে বলা যায়, সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা সংশ্লিষ্ট জীবনের বাল্য-কৈশোর তারুণ্যকে বাড়িয়ে তোলে, প্রখ্যাতির আতস-কাঁচে বাল্য-কৈশোর তারুণ্যের সূত্রগুলো ফুটে ওঠে। ক্ষুদিরামের জীবনের ব্যাপ্তি বিংশ বর্ষও স্পর্শ করেনি, ঈশানবাবুর হিসাবে কিঞ্চিন্ন্যূন ১৯ বছর; জন্ম ১৮৮৯, ৩ ডিসেম্বর, ফাঁসী ১৯০৮, ১১ আগষ্ট। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু। মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া, তিন কন্যা তিন পুত্রের মধ্যে ক্ষুদিরাম কনিষ্ঠ। ক্ষুদিরামের আগে দুই পুত্রের, একটি সূতিকাগৃহে, একটি পাঁচ-ছয় বছরে মারা যায়। লক্ষ্মীপ্রিয়া কালীমন্দিরে 'হত্যা' দিয়ে ক্ষুদিরামকে লাভ করেন, দৈববাণী হয়, অল্প বয়সে অমরত্ব লাভ করবেন (পৃঃ ১-৩)। ক্ষুদিরামের সংমা ছিলেন সুশীলাসুন্দরী (পৃঃ ৪)। স্থানীয় সংস্কার—আঁতুড় ঘরে সন্তান বিক্রি করলে সন্তান দীর্ঘজীবন লাভ করে। জ্যেষ্ঠা কন্যা অপরূপার কাছে খুদের বিনিময়ে বিক্রি, তাই থেকে ক্ষুদিরাম। [বানান হওয়া উচিত ছিল খুদিরাম. প্রচলিত বানান ক্ষুদিরাম, আমি তাই রেখেছি]। ক্ষুদিরামকে খুদের বিনিময়ে হয়তো বাল্যে রক্ষা করা গেল কিন্তু মা মারা গেলেন যখন তার বয়স মাত্র ছয় (বঙ্গাব্দ ১৩০২)। চার মাস পর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠ কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষুদিরামের ভার নেন জ্ঞাতিভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র বসু। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর বসতবাটিও দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছল। মহাপাত্র মশাই ক্ষুদিরামের বড়দিদি অপরূপার কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন, ক্ষুদিরাম (গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের) পাঠশালায় অতি দুর্দান্ত ছাত্র ছিলেন, লেখাপড়ায় বিশেষ অনুরাগ ছিল না। নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল গাছে

ওঠা, পুকুরে ডুব দেওয়া, পাখীর বাসায় ঢিল ছোঁড়া ইত্যাদি। পাড়াপড়শীরা এসে নানা অভিযোগ করতেন। কালীমাতার স্বপ্নলব্ধা বলে অপরূপা ভাইকে কিছু বলতেন না। অপরূপার স্বামী অমৃতলাল রায় তমলুকে বদলি হন (পৃঃ ১৫)। আনন্দপুরে অবিনাশবাবুর শ্বশুরগৃহে অবস্থানকালে ক্ষুদিরাম লাঞ্ছিত বোধ করে সে আশ্রয় ত্যাগ করেন ও পিত্রালয়ের নিকট কৃত্তিবাস বসুর গৃহে আসেন। কৃত্তিবাসের স্ত্রী ক্ষুদিরামের ধর্মমাতা হন। সেখানে আটদিন বাসের পর তমলুক অমৃতলাল-আলয়ে আসেন। সেখানে হ্যামিল্টন উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তমশ্রেণীতে ভর্তি হন। রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব, হাতে উল্কি আর বি বি (পৃঃ ১৮)। [কোন সময়ে বা মামলায় এই আর বি বি (বা রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রসঙ্গটি ওঠে নি, এ এক বিস্ময়।]

ক্ষুদিরাম মার্বেল খেলায় ওস্তাদ ছিলেন। একদিন মার্বেল খেলার সময় এক ফেরিওয়ালার সঙ্গে খাবার নিয়ে ক্ষুদিরামের এক সঙ্গীর কথা কাটাকাটি হলে ফেরিওয়ালা গালমন্দ দেয়, ক্ষুদিরাম লাথি মেরে ফেরিওয়ালার ঝুড়ি ফেলে দেয়। ফেরিওয়ালা হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করলে হেডমাস্টার ক্ষুদিরামকে ডেকে পাঠান। ক্ষুদিরাম হেডমাস্টারকে বলেন, ফেরিওলা অশালীন কথা বলেছে। হেডমাস্টার ক্ষুদিরামের সৎসাহস লক্ষ্য করে সতর্ক করে ছেড়ে দেন (Boy Revolutionary of India, Mahapatra. p. 10)।

ঈশানবাবু এমনি অনেক শোনা কথা তাঁর বাংলা ইংরেজী বইয়ে দিয়েছেন। একবার তমলুকে কলেরা মহামারী দেখা দেয়। এক রাত্রে চার পাচটি কলেরা রোগীকে পোড়াতে হয়, বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে তাঁর কি সাহস আছে গভীর রাতে শ্মশানের অমুক গাছের অমুক পাতা ছিঁড়ে আনার ? ক্ষুদিরাম সে সাহস প্রতিপন্ন করেন। মন্মথনাথ বসু নামে এক ব্যক্তি বলেছেন, ক্ষুদিরাম উঁচু গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছেন (ইংরেজী বইয়ে অবশ্য আহত হবার কথা আছে)। জীবন্ত সাপ ধরে খেলা করে ছেড়ে দেবার গল্পও কেউ কেউ করেছেন।

ঈশানবাবু লিখেছেন, অমৃতবাবু মেদিনীপুর বদলি হয়ে এলে ক্ষুদিরাম সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন (১৯০৪)। অতি প্রখ্যাত রাজনারায়ণ বসু (অরবিন্দ বারীন্দ্রের দাদামশাই) সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রাজনারায়ণের অন্যতম ভ্রাতা অভয়চরণ বসুর পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে গুপ্তসমিতির কল্পনা জাগে (পৃঃ ২৭)। কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে ক্ষুদিরামের মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, স্বামী

বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। সংবাদপত্র পড়েন। বন্ধুবান্ধব মহলে এ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত থাকেন। (ইতিমধ্যে স্যাব হার্বার্ট রিজলির বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৫ সালের ৫ অক্টোবর মেদিনীপুর শহবে বেলী হলে প্রতিবাদ সভা এবং বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী পণ্য ও আমোদ-আহ্লাদ বর্জনেব শপথ নেওয়া হয়)। ক্ষুদিবাম এইসব উদ্যোগ আয়োজনে থাকেন, চাঁদা তোলেন, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদেব আপ্যায়ন করেন। স্কুলের লেখাপডার প্রতি আগ্রহ হ্রাস পায়। বিলাতী চিনি, লবণ ও কাপডেব দোকানে পিকেটিং কবেন (পৃঃ ৪০-৪৩)। "এই আন্দোলনই ক্ষুদিবামের জীবনেব মোড ফিবাইয়া দিল। ১৯০৫ সালের শেষ ভাগ হইতে প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত, ১৯০৬ সাল হইতে একেবারেই অনুপস্থিত থাকিতে লাগিলেন।" এসব কারণে ক্ষুদিবাম সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সর্বত্রই ক্ষুদিবামেব ডাক, বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ, বিলাতী চিনি, লবণের গাডি লুট বা মালবোঝাই নৌকা নিমজ্জনে স্বেচ্ছাসেবকদলে তাঁব জোডা নেই। খাওয়া দাওয়া অনিযমিত, মাঝে মাঝে বাড়িতে অনুপস্থিত। বালিশ, বিছানার নীচে, জামার পকেটে স্বদেশী কথাব কাটিং। সেবাকাযে, বন্যাত্রাণে দারুণ অনুরাগ (পৃঃ ৪৫)। ভগ্নাপতি ও দিদির উপদেশ পবিহাবের জন্য গৃহত্যাগ। পত্র—(১) "সংসাবী নয়, তাঁহাব জীবন কোন মহত্তব কার্যে ব্যয়িত হইবে। (২) ভগ্নীপতি সরকারি চাকুবে, তাহাকে বিপন্ন করা সমীচীন নয় (পৃঃ ৪৬)।" মাসাধিক পরে গৃহ প্রত্যাবর্তন।

মহাপাত্র মশাই অমৃতবাবু সম্পর্কে ভুল ধারণা ভেঙে দিতে লিখেছেন: "অমায়িক প্রকৃতিব মানুষ, রূঢ় কর্কশভাষায় অভ্যস্ত নন। ক্ষুদিরামের প্রতি স্নেহ ও মধুব ব্যবহার। ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলাজজ (ক্ষুদিবামকে) তাডিযে দিতে অন্যথায় কর্মচ্যুত কববার ভয় দেখিযেছিলেন। কিন্তু অমৃতবাবু তাডান নি। জবানবন্দীতে বিপবীত কথা বলার কাবণ যেন অমৃতবাবু / দিদির উপব কোন অত্যাচার না হয় (পৃঃ ৫৪)।

১৯০৫ সালেব শেসভাগে ক্ষুদিরামেব সঙ্গে হেমচন্দ্র কানুনগোর প্রথম পরিচয় হয়, হঠাৎ কানুনগোর বাইক আটকে সাহেব মারবেন বলে রিভলভাব চান। কানুনগো বাহ্যিক বিরক্তি প্রকাশ করেন (পৃঃ ৫৫)। মেদিনীপুবের পুরাতন জেলে কৃষি প্রদর্শনী হয় ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়াবি মাস নাগাদ। সেখানে মেদিনীপুবের গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে ইস্তাহার বিলিব ভার পড়ে ক্ষুদিরামের

উপর। মেদিনীপুর বোমার মামলা ও সরকারি বিবরণীতে এটি 'বন্দেমাতরম্' পুস্তিকা বলা হয়েছে। আলিপুরে বোমা মামলার এডভোকেট বি কে বসুও তাই বলেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র বলেছেন ওটা "সোনার বাংলা" (পৃঃ ৫৬)। পুস্তিকাখানির ইংরেজী অনুবাদ বেরোয় "পাযোনিয়ারে।" অত্যাচারী পুলিস ও শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর মনে দারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ওরই বাংলা অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ হাজারখানেক ছাপান, বিতরণের ভার পড়ে ক্ষুদিরামের উপর। ভাষা ও ভাব বিদ্রোহিতায় পূর্ণ (পৃঃ ৫৭)। প্রস্তাবিত সভার দিন ক্ষুদিরাম নিশ্চিন্ত মনে "সোনার বাংলা" বিলি করিতেছিলেন। কলেজিয়েট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক ক্ষুদিরামকে এই রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা বিতরণে নিষেধ করেন (পৃঃ ৫৮)। ক্ষুদিরাম কর্ণপাত না করায় তিনি পুলিসকে ধরার জন্য বলেন। কনস্টেবল রামলাল উপাধ্যায় ওগুলো ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে ক্ষুদিরাম তার নাকে-মুখে ঘুসি মারেন। সত্যেন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে আপাতত মুক্ত হন, পরে সন্ধান চলে (পৃঃ ৫৯)। সত্যেনের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনের কৈফিয়ৎ তলব (পৃঃ ৬০)। আলিগঞ্জের তাঁতশালায় পুলিস ইন্সপেক্টার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করেন। ক্ষুদিরাম স্বেচ্ছায় ধরা দেন। "বহুপ্রকার প্রলোভন, শাস্তি ও নির্যাতনের ভয় দেখাইয়াও পুলিস তাহার নিকট হইতে কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। একই উত্তর—আমি কিছুই জানি না" (পৃঃ ৬১)।

১৯০৬, এপ্রিল, ক্ষুদিরাম অভিযুক্ত ও দায়রা সোপর্দ হন। তরুণ বয়সের অজুহাতে, প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীপ্রমাণাভাবে, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সরকারপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকেও সাক্ষী মেনেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য ক্ষুদিরামের অনুকূলে যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উক্তি করার জন্য তাঁর চাকরী যায় (পৃঃ ৬১-৬২)। দায়রা জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে-তাঁকে পুস্তিকা বিতরণের ভার দিয়েছিল সে আদালতে আছে কিনা। ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, নেই (পৃঃ ৬২)।

ঈশান মহাপাত্র লিখেছেন, মুক্তিলাভের পর ক্ষুদিরামকে বহু পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে কে বি দত্তের ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, মিছিলে স্বদেশী সঙ্গীত হয়, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া হয়। সে সময় অরবিন্দ মেদিনীপুরে ছিলেন। ক্ষুদিরামের মিছিল তাঁর সমীপবর্তী হলে তিনি ক্ষুদিরামকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন।

মহাপাত্র মশাইর মতে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলা বাঙলাদেশের বিপ্লবী-দলের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা। মুক্তিলাভের পর ক্ষুদিরামের বীরত্বকাহিনী ছড়িয়ে

পড়ল। নানা জায়গায় নিমন্ত্রণলাভ। গুপ্ত সমিতির সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল (পৃঃ ৬৪)। (সাক্ষী) রামচরণের উত্তমমধ্যম লাভ হল (পৃঃ ৬৫)। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা'র এজেন্ট, ক্ষুদিরাম অন্যতম বিতরণকারী। কদাচিৎ ভগ্নীগৃহে আসিতেন। ক্ষুদিরাম স্কন্ধে দেশী কাপড় লইয়া বিক্রি করিতেন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গেয়ে সভা পরিচালনা, স্বাস্থ্য-চর্চা ও লাঠি-খেলা শেখানো হ'ত (পৃঃ ৬৭)। মহাপাত্র মশাই ক্ষুদিরামের "প্রচণ্ড বেগে লাঠি ঘোরানোর দক্ষতা" উল্লেখ করেন।

ঈশানবাবু ক্ষুদিরামের ভগ্নীপতি অমৃতবাবুর সপক্ষে ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় যে-কথা বলেছেন তার সঙ্গে ৬৯ পৃষ্ঠার কথাগুলোর সামঞ্জস্য নেই। কথাগুলো এই : ভগ্নীগৃহে ক্বচিৎ আসেন, অমৃতবাবুকে এড়িয়ে চলেন। "পুলিস তাহার উপর কড়া নজর রাখিল। অমৃতবাবুও ক্ষুদিরাম-সঙ্গ পরিহার করেন, পুলিস কর্মচারী, ম্যাজিস্ট্রেটের তাড়নায় অমৃতবাবু অস্থির। ভগ্নীর শ্বশুরবাড়ি হাটগাছিয়ায় ডাক লুট, অমৃতবাবুর কাছে ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি, পত্র লিখে গৃহত্যাগ, রণপায়ে মেদিনীপুর শহর আগমন। ডাক লুট ব্যাপারে মঙ্গলা দলইর আট মাস সশ্রম কারাদণ্ড। অতঃপর ভগ্নীগৃহ একেবারে বন্ধ, তাঁতশালা নয়তো ছাত্রভাণ্ডার অথবা সত্যেন্দ্র-গৃহে (৭০-৭১ পৃঃ)।

মহাপাত্র মশাই মেদিনীপুর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ক্ষুদিরামের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। এখানে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থীদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ-ক্ষুদিরাম প্রমুখের বিরোধ ঘটে। এঁরা চেয়েছিলেন স্বরাজ এবং তা আবেদন-নিবেদনের পথে নয়। স্বেচ্ছাসেবকগণের হাতে লাঠি ও বুকে বন্দেমাতরম্ ব্যাজ নিয়েও বিরোধ। শেষ পর্যন্ত নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের দুটি পৃথক সম্মেলন হয়। অতিথি আপ্যায়নের ভার ছিল ক্ষুদিরামের উপর (পৃঃ ৭৩-৭৪)।

ক্ষুদিরামের বিশিষ্ট সহকর্মীদের মধ্যে যোগজীবন ও সত্যেন্দ্রনাথ অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত, যোগজীবন মুক্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দু'মাস কারাদণ্ডিত (পৃঃ ৭৬)। পরে মানিকতলা বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে আলিপুর জেলে হত্যার দায়ে কানাইলাল দত্তের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মহাপাত্র মশাই ক্ষুদিরামের প্রচারকার্যের বিবরণও দিয়েছেন—কাঁথি তমলুক, উড়িশা। সঙ্গী ক্ষীরোদনাথ ভুঞা। পরিব্রাজকের বেশে, দেশী মোটা ধুতি, গায়ে মোটা জামা, মাথায় পাগড়ী, নগ্নপদ, হাতে চিকণ বাঁশের লাঠি, পৃষ্ঠে শয্যার বোঝা, কিছু বই, গীতা, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, স্বদেশী সঙ্গীত। পদব্রজে

যামনা গ্রাম। লাঠি-ছোরা খেলা শিক্ষাদান। দিনের বেলা প্রচারকার্য, সন্ধ্যায় ব্যায়ামচর্চা, রাত্রে গুপ্ত পরামর্শ।

লেখক দিগম্বর নন্দের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ নন্দের বয়ানে (১৯৪৭, ২৯ সেপ্টেম্বর) লিখেছেন: ক্ষুদিরাম বাবুর একখানি ডায়েরি থাকিত ইহা জানি তবে তাহা এখানে রাখিয়া যান নাই। খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁহাকে যাঁহাকে ক্ষুদিরাম পছন্দ করিতেন তাঁহাদের লইয়া গিয়া বাঁকুড়া জেলার ছেঁদা পাথর মৌজার জঙ্গলে বন্দুক শিক্ষা দিতেন (পৃ: ৭৮-৮৩)। ঈশানবাবু লিখেছেন: ছেঁদাপাথর জঙ্গল যখন দিগম্বর বাবুদের সম্পত্তি ছিল তখন দিগম্বর বাবুর অনুমতি লইয়া পাহাড় ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে একটি গুপ্ত অস্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছিল এবং তথায় বন্দুক, রিভলভার প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। সেখানে পুলিসের, সর্বসাধারণের গতিবিধির সুবিধা ছিল না।" লেখক "ক্ষুদিরামের অন্যতম বিপ্লবী সহকর্মী—কাঁথি আদালতের অন্যতম উকিল শরৎচন্দ্র পট্টনায়কের" বয়ানে লিখেছেন (১৯৪৭, ১ আগষ্ট): "ছেঁদাপাথর নামক স্থানে নন্দবাবুদের কাছারির সম্মুখে একটি কূপের মধ্যে রিভলভার তলোয়ারাদি লুকাইয়া মাটি চাপা দেওয়া হইয়াছিল। ক্ষুদিরাম তথায় গিয়া বন্দুকাদি পরিচালনার নেতৃত্ব করিতেন। বিদ্রোহ আন্দোলনের সময় আমি [মানে পট্টনায়ক] তথায় গিয়া ঐ কূপের মাটি তুলিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরের নেতা ছিলেন। আমি ক্ষুদিরাম ও যোগজীবনের সহিত একত্রে ব্যায়ামচর্চা করিয়াছি। লাঠি তলোয়ার, কুস্তিতে ক্ষুদিরাম শ্রেষ্ঠ ছিল। মধ্যে মধ্যে বন্দুক ও রিভলভার ইত্যাদির ব্যবহার গোপনে শহরের পশ্চিমে গোপ অঞ্চলে শিক্ষা করা হইত এবং ক্ষুদিরাম প্রায়ই সঙ্গে থাকিত। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আদেশ অনুসারে কাজ করিত" (পৃ: ৮৪-৮৬)। ঈশানবাবু ক্ষুদিরামের "হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা" দেবার দক্ষতার সংবাদ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: বাগেন্দাবাজারে এক বৃহৎ স্বদেশী-সভায় ক্ষুদিরাম ঐ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমিতির জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন (পৃ: ৮৭)। লেখক ক্ষুদিরামের আরও বহু কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (পৃ: ৯০-৯২, ৯৪-৯৫)।

ক্ষুদিরামের গৌরবময় জীবন-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র দক্ষতার সঙ্গে যে এক বিপ্লবীর জীবনালেখ্য এঁকেছেন তা নিঃসন্দেহে ইংরেজী এই প্রবচনটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, উষাকালেই সারাটা দিনের প্রকৃতি প্রতিফলিত

হয় (Morning shows the day)—যদিও কালবৈশাখীর দেশে এই প্রবচনটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নয়। গ্রীষ্মপিপাসু শীতের দেশ ইংলণ্ডে এ প্রযোজ্য হতে পারে। বয়সকালে কে কেমন হবে তা বলা শক্ত হলেও যে-কোন সফল জীবনের মূলে তার সন্ধান করা হয়, নিপুণ অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে তা ধরাও পড়ে।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ধরা পড়ার সময় ক্ষুদিরাম ঐ সব নৈপুণ্যের পরিচয় দেবার কোন অবকাশ পান নি। নিয়মিত ব্যায়ামে সুগঠিত দেহ, কুস্তির কৌশল, রিভলভার-চালনার দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পেলেন না। দুটি রিভলভার ও অতিরিক্ত কার্তুজ থাকতেও বড়ই অসহায়ের মতো বেড়াজালে পড়ে গেলেন।

(২৩)

মজঃফরপুর, জুন ১৩ (অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা):— এসেসরদের জন্য মিঃ মান্নুক হিন্দীতে সওয়াল করলেন এবং ইংরেজীতে একটি রূপরেখা দিলেন। তিনি অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ধারাটি ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন, অপরাধীরা কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে অন্য কাউকে মেরে ফেলেছে এতে অপরাধ কিছুমাত্র লঘু হয় না। বন্দীর অপরাধ প্রমাণে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য অতি প্রবল। কৌঁসুলি মিঃ মান্নুকের মতে দুটি বোমা ছিল। একটি বড় একটি ছোট, জড়াবার তুলোর ওপর যে দাগ আছে তা থেকেই এটি অনুমেয়। কৌঁসুলির মতে দীনেশের এক হাতে একটি ছোট বোমা আর একটি রিভলভার ছিল, রিভলভারটি পাওয়া গেছে কিন্তু বোমাটি নেই। তাই থেকেই বোঝা যায়, ওটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিস্ফোরণ শব্দটি তারই, রিভলভারের নয়।

মিঃ মান্নুকের পর জজ ক্ষুদিরামের উদ্দেশে বলেন, "তোমারা সাফাই আভি বাবু কালিদাসকি মারফৎ হোগা।

বাবু কালিদাস বসু এসেসরদের এই বিষয়টির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, বন্দী অপরাধ স্বীকার করা সত্ত্বেও জজ বন্দীর আনুষ্ঠানিক বিচারকার্য চালিয়েছেন। এই থেকে এইটিই অনুমান করতে হয় যে, এসেসরগণ যেন সাক্ষ্যসাবুদ তুলমূল যাচাই করতে পারেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়রা জজের কাছে বন্দীর অপরাধ স্বীকারের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। বন্দীর বিবৃতিতে দেখা যায়, দীনেশ বাধাস্বরূপ মনে করায় সিল্কের কুর্তাটি বন্দীর হাতে দেন। বন্দী এও বলেছেন যে, তাঁর কাছে যে দুটি রিভলভার ছিল তা বেশ

ভারি। সুতরাং, এইটিই অনুমেয় যে, দীনেশ বোমা ছুঁড়েছে। দ্বিতীয়ত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দীর বিবৃতি দুটির মধ্যে এই কয়টি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষণীয়: (ক) কে বন্দীকে এই কাজে প্ররোচিত করেছে (খ) কোথায় তিনি রিভলভার দুটি ও কার্তুজগুলো পেয়েছেন (গ) দীনেশের ঠিকানা। কালিদাসবাবুর মতে, দীনেশকে আড়াল দেবার অভিপ্রায়ে বন্দী অসত্য স্বীকারোক্তি করেছেন, দুটি বিবৃতি তুলনা করে পড়লেই একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপর কালিদাসবাবু যেসব বিষয়ে ঐ বিবৃতি দুটি এবং ফরিয়াদী সাক্ষ্যসাবুদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা বৈপরীত্য ঘটেছে সেদিকে এসেসরগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: (১) ঘটনাকালে বন্দীর গায়ে ছিল ডোরাকাটা কোট, (২) বোমা একটাই ছিল, (৩) যখন তাঁরা (টহলদার) কনস্টেবলদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে যান তখন বোমাটা বন্দীর বাঁ হাতে ছিল।

টেলরের (Taylor) উদ্ধৃতি দিয়ে, কালিদাসবাবু বলেন, নানা উদ্দেশ্যে অসত্য স্বীকারোক্তি করা যেতে পারে, তিনি দীনেশ ও ক্ষুদিরামের উদ্দেশ্যের তুলনা করে বলেন, কিংসফোর্ডকে হত্যার অভিপ্রায় ক্ষুদিরাম অপেক্ষা প্রফুল্লরই প্রবলতর ছিল। দীনেশ বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে অধিকতর দক্ষ ছিলেন। পক্ষান্তরে, ক্ষুদিরামের দেহভারে ছিল দুটি রিভলভার ও সিল্কের কুর্তা ছাড়াও আরও অনেক ভারি বস্তু। দীনেশের ছিল কিন্তু পুরোনো একটি শাদা ভেস্ট ও একটি ব্রাউনিং পিস্তল। সুতরাং, এটা অসম্ভব যে, ক্ষুদিরাম বোমা ছুঁড়েছেন, দীনেশ নন।

ফরিয়াদী সাক্ষ্যসাবুদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ওঁরা তো কেবল পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন, তাতে অপরাধ নির্ণীত হয় না, প্রত্যক্ষ-ভাবে বন্দীর দোষ ওঁরা প্রতিপন্ন করতে পারেন নি। ঘটনার রাত্রে সাড়ে সাতটা থেকে ঘটনাকালের মধ্যে বন্দী কোথায় ছিলেন তা একেবারেই দেখাতে পারেন নি। ক্ষুদিরামের বিবৃতি অনুসারেও তিনি ডোরাকাটা কোট পরে ছিলেন। উকিল কালিদাস বসুর ধারণা, ক্ষুদিরাম ঘটনার আগে পর্যন্ত দীনেশের সঙ্গে থাকলেও সঙ্কটমুহূর্তে সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে যান। সুতরাং, তিনি সন্দেহের অবকাশ পেতে পারেন। দণ্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে কালিদাসবাবু বন্দীর তারুণ্যের দিকে জজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, অপরের দ্বারা বিপথ-চালিত। উকিল বসু এই সম্পর্কে দুটি রুলিংয়ের উল্লেখ করেন।

কালিদাসবাবুর বলা শেষ হলে জজ এসেসরদের উদ্দেশে এই বলে মামলার

এক সংক্ষিপ্তসার রাখেন : এই মামলায় আপনাদের যে উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি ব্যক্তিগত মন্তব্য করতে চাই। আপনাদের আর জুরীর পার্থক্য এই যে, আপনারা শপথবদ্ধ নন। আপনারা কেবল পরামর্শ দিতে পারেন, জজ হিসেবে আমি তা গ্রহণ করতেও পারি, নাও পারি। যদিও এই পার্থক্য বর্তমান এবং জুরীর চাইতে আপনাদের দায়িত্বও কম, তথাপি সুনাগরিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মতো আপনাদের পবিত্র কর্তব্য হবে আমার কর্তব্য পালনে সাক্ষ্যসাবুদ সম্পর্কে সৎ, অকপট ও নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ করে আমাকে সাহায্য করা। সাক্ষ্যসাবুদ আপনাদের সামনেই আছে, কেবল তার উপরই নির্ভর করে বন্দী দোষী অথবা নির্দোষ স্থির করবেন। আপনাদের অভিমতের যথাযথ মূল্য থাকবেই এবং আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, তা নিশ্চয়ই তাচ্ছিল্য করা হবে না, পক্ষান্তরে, তা সশ্রদ্ধ বিবেচনাধীন হবে।

এরপর জজ এসেসরদের এ ক্ষেত্রে আইনের বিধানগুলোর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। যদি কোন লোক হত্যার উদ্দেশ্যেই কোন কিছু করে বসে তবে তা হত্যাপরাধ হবে। সেখানে এটা কোন অজুহাতও হবে না যে, সে নিহত ব্যক্তির বদলে আর কাউকে হত্যা করতে চেয়েছিল। যেন সে নিহত ব্যক্তিকেই মারতে চেয়েছিল এ দায় থেকে যায়। যেখানে একই উদ্দেশ্য সাধনে দুই ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম করে সেখানে প্রত্যেকেরই দায়ভাগ সমান হবে—যেন কেবল সে-ই ওটা করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, ক ও খ একই সঙ্গে একই ধরণের বন্দুক নিয়ে গ-কে হত্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, তারা যদি দুজনেই এক সঙ্গে বন্দুক চালিয়ে থাকে এবং যদি গ মারা যায়, কিন্তু যদি গ-র দেহে একটি মাত্র গুলি পাওয়া যায় তবে সাধারণ বুদ্ধিমতো আইনে (ভাঃ দঃ বিধির ৩৪১ ধারায়) এই ব্যবস্থা আছে যে, কে আসলে হন্তারক তা স্থির করা অসম্ভব হলেও, দু'জনই হত্যার জন্য দায়ী হবে। অর্থাৎ ঘটনাক্রমের মধ্যে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যটাই মূল কথা। প্রমাণিত তথ্য থেকেই তা আহরণ করতে হবে। আপনাদের সম্মুখে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, বন্দী যদি নিজেই বোমাটি ফেলে থাকে যার ফলে (আদালত প্রাঙ্গণে দেখানো) গাড়িটা বিধ্বস্ত হয়েছে, সইস আহত হয়েছে এবং দুটি মহিলার মৃত্যু ঘটেছে—তবে বন্দীর কি এই মৃত্যু ঘটানো ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? বন্দীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি বাদ দিলে তাঁর বিরুদ্ধে ঘটনা পরম্পরাগত সাক্ষ্য কিন্তু সুনিশ্চিত, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের মতোই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টতর যদি নাও হয় এবং এ ক্ষেত্রে আইন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দাবিও করে না।

উভয় এসেসরই ক্ষুদিরাম হত্যাপরাধ করেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এসেসর দু'জনের নাম—বাবু নাথুনীপ্রসাদ ও জানকীপ্রসাদ।

(২৪)

জজ তখন এই মর্মে তাঁর রায় দেন : ৩০ এপ্রিল রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ মিসেস ও মিস কেনেডি অন্ধকারে গাড়ি করে মজঃফরপুর স্টেশন ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। গাড়িটা যখন জজের বাড়ি ছাড়িয়ে গেছে তখন ঐ গাড়ির ভেতর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, বিস্ফোরণ হয়, গাড়িটা ভেঙে যায়, ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো সইসকে আঘাতে পঙ্গু করে, দুই মন্দভাগা মহিলা এমন ভয়াবহরকমে আহত হন যে, মিস কেনেডি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা যান এবং মিসেস কেনেডি ২ মে সকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ফরিয়াদে বলা হয়েছে, বোমার লক্ষ্য ছিলেন মজঃফরপুরের জেলা দায়রা জজ মিঃ কিংসফোর্ড, কিছুকাল আগে তিনি কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে এখানে বদলি হয়ে আসেন। সেখানে থাকতে তিনি দেশীয় সংবাদপত্রগুলোর বিরাগভাজন হন। স্থানীয় পুলিস খবর পেয়ে মিঃ কিংসফোর্ডের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন, ঘটনার রাত্রে দু'জন কনস্টেবল শাদা পোষাকে স্টেশন ক্লাব ও কিংসফোর্ডের বাসস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে ডিউটিতে ছিল এবং পাহারা দিচ্ছিল। এই কনস্টেবলরা দুটি বাঙালি তরুণকে ওখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে, তাদের মোকাবিলা করার প্রয়োজনও বোধ করে, ওদের তফাৎ যেতে বলে। কনস্টেবলরা বলে, বর্তমান বন্দীই ঐ দুজনের মধ্যে ছোট। অল্পক্ষণ পরেই এক বিস্ফোরণ হয়। ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোলে কনস্টেবলরা খবর দেয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাদের মুখে ঐ তরুণ দুটির চেহারার বর্ণনা শোনেন। তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ফলে, বন্দী ২৫ মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনের কাছে ওয়েইনিতে ধরা পড়ে। আরও একটি বাঙালি মর্মান্তিক ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মোকামে রেল স্টেশনে ধরা পড়ে, সে সেখানেই আত্মহত্যা করে।

বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে হত্যার, বিকল্পে হত্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার এবং হত্যাকার্যে সহায়তা করার। সাক্ষ্যসাবুদের সারাংশ এসেসরদের বলেছি এবং তা আমার স্মারকলিপিতে গ্রথিত করেছি। স্মারকলিপিটি এই রায়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমার

অনুরোধ, তাই করা হোক। তাহ'লে রইল বাকি আমার সিদ্ধান্ত ও তার সপক্ষে যুক্তি লিপিবদ্ধ করা। আমার মতে ঘটনাপরম্পরার পরিপার্শ্বগত সাক্ষ্যসাবুদ প্রভৃত এবং আমার মতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে এটি সংশয়াতীতরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বন্দী মিস ও মিসেস কেনেডির ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য দায়ী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তৎপরতার কল্যাণে এবং স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তাৎক্ষণিক ও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে আগাগোড়া যেরকম যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে পুলিসী তদন্ত চালিত হয়েছে তা সর্বতোভাবে অনিন্দনীয় ও তাতে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব, একমাত্র ঘটনাপরম্পরাগত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যেই বন্দীকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতে আমার কোন দ্বিধা নেই এবং উভয় এসেসরের সঙ্গে একমত হয়ে আমি তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি, একথা বলা সঙ্গত যে, মিঃ উডম্যানের কাছে বন্দীর স্বীকারোক্তি এবং (দায়রায়) অভিযুক্ত হবার পরও বন্দীর অপরাধ স্বীকার আন্তরিক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, এ বিষয়েও সংশয়ের কোন কারণ দেখিনে। আমি একথাও বলতে পারি যে, আমার মতে কোচম্যান সত্য কথাই বলেছে এবং বোমা-নিক্ষেপকারী বলে বন্দীকে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। তার সাক্ষ্য আরও ভাল করার প্রতি তার যে ঝোঁক দেখা গেছে সেটা খুব সজ্ঞান নয়, এবং তার মতো সাক্ষীর এই আচরণ দুর্বোধ্যও নয়। দণ্ড দেবার ব্যাপারে উকিল কালিদাস বসু আমার উদ্দেশে যে করুণা প্রদর্শনের আবেদন জানিয়েছেন তা আমি যথাযথ ভেবেছি. তিনি আমার প্রস্তাবমতো বন্দীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং আদালতের সাধুবাদ তার প্রাপ্য। কিন্তু লঘুদণ্ডের কোন যুক্তিই আমি পাচ্ছিনে and I need not, I think, prolong the prisoner's agony and suspense, if indeed he feels, I would fain hope him capable of feeling either by one word more. The sentence of the Court is that the prisoner Khudiram Bose be hanged by the neck. আদালতের দণ্ড—ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে মৃত্যু।

এই জজই তাঁর স্মারকলিপিতে লিখেছেন: **সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট যেভাবে বন্দীর জবানবন্দী নিয়েছেন তা অনেকটা চার্চের পাপীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসাবাদের মতো। বহু প্রশ্ন করেছেন—৫৫টি প্রশ্ন —কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর ক্ষেত্রেই যা কেবল করা যেত। এই মামলা পরিচালনা আগাগোড়া যেরকম প্রশংসালাভ করেছে**

সেক্ষেত্রে আমি সখেদে এই প্রতিকূল মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার উপর যদি জুরীদের বোঝাবার ভার থাকত তবে আমি তাঁদের বলতাম এইরকম জবানবন্দী বাদ দিয়ে যদি তাঁরা বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করতে অপারগ হন তবে তাঁরা বন্দীকে মুক্তি দেবার কথা বলবেন।

তাহলে বিবেচ্য প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই যে, এটা কি প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বন্দীই বোমাটা ছুঁড়েছেন এবং সেই বোমা ছোঁড়ার ফলেই মিসেস ও মিস কেনেডির মৃত্যু হয়েছে ? দ্বিতীয়ত, যদি তা না হয়, যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজে বোমাটা ছোঁড়েন নি, তাঁর সঙ্গী ছুঁড়েছেন তবে ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধারামতে বন্দী কি ঐ কৃতকর্মের জন্য দায়ী ? তৃতীয়ত, এটা কি পরিষ্কার যে, মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে বোমাটা ছোঁড়া হয়ে থাকতে পারে ? এই দুটি প্রশ্নের জবাব যদি ইতিবাচক হয় তবে বন্দী প্রথম-বর্ণিত অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন। যদি তা না হয় তবে বিকল্প দায় বিবেচনা করতে হবে এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে। চতুর্থত, এটি কি পরিষ্কার নয় যে, বন্দী যদি নিজে বোমা না ছুঁড়ে থাকেন তাঁর সঙ্গী যখন বোমা ছুঁড়েছিলেন তিনি তখন সেখানে সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি হয় (ক) সঙ্গীকে বোমা ছুঁড়তে প্ররোচিত করেছেন নতুবা (খ) কখন বোমাটা ছোঁড়া হবে তা নিয়ে সঙ্গীর সাথে শলা করেছেন নতুবা (গ) উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সঙ্গীর প্রস্তুতিতে বা অবৈধ দুষ্কার্যে সহায়তা করেছেন। (গ) প্রশ্ন সম্পর্কে একথা মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তি যদি জানে যে, কোন দুষ্কৃতি হতে যাচ্ছে তবে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে খবর পৌঁছে দিয়ে সে হত্যাকাণ্ড নিবারণ করতে আইনত বাধ্য। এই বিকল্পটি যদি আদৌ বিবেচ্য হয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নের জবাব যদি ইতিবাচক হয় তবে বন্দী বিকল্প অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে।

বস্তুত ক্ষুদিরামের এই বিকল্প অভিযোগেই মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। নিজে বোমা ছোঁড়ার জন্য নয়, একই উদ্দেশ্যে বোমা ছুঁড়তে সঙ্গীকে সহায়তা করা বা প্ররোচনা দেবার জন্যে (ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধারা)।

দণ্ডদানের পর জজ বন্দীকে বলেন, তিনি যদি হাইকোর্টে আপীল করতে চান তবে তিনি তা সাতদিনের মধ্যে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মারফৎ করবেন। তিনি বিনামূল্যে এক কপি রায় পাবেন।

বন্দী বললেন, এখানে উপস্থিত সকলের সামনে আমি কিছু বলতে চাই।

জজ : এখন আর সে সময় নেই। আমি শুনতে চাইনে।

বন্দী : যদি সুযোগ দেওয়া হয় তবে কিভাবে বোমা তৈরি হয়েছে তা বলতাম।

জজ বন্দীকে জেলে অপসারণের আদেশ দেন।

সংবাদদাতা প্রসঙ্গত আরও জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ ধরে মামলার শুনানী অসাধারণ স্থৈর্যের সঙ্গে শুনে আজ তাঁকে ক্লান্ত ও পাণ্ডুর মনে হচ্ছিল। দিনের পর দিন মামলা শুনেছেন নির্ভীক ও উদাসীনচিত্তে। অন্যান্য দিন তাঁকে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু আজ তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলেন, মাঝে মাঝে যেন একেবারেই নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। জজ যখন এসেসরদের ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন তখন একাধিকবার তাঁকে মৃদু মৃদু হাসতে দেখা গেছে। জজ যখন রিভলভার ছুটি উদ্ধারের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন যেন বেশ কৌতুক বোধ করছিলেন। জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন কিনা। ক্ষুদিরাম মাথা নেড়ে জানালেন বুঝেছেন, বলে মৃদু হাসলেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে দণ্ড মেনে নিলেন।

ক্ষুদিরামের উদ্দেশে দণ্ডাদেশের পর জজ কিশোরীমোহন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আনীত মামলা গ্রহণ করেন। অভিযোগ ছিল, তিনি অপরাধীদের আড়াল দেবার জন্য হত্যানুষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যে সংবাদ দিয়েছেন, এটি ভাঃ দঃ বিধির ২০১ ধারা অন্তর্গত। মিঃ মানুক সরকারপক্ষে এবং গোবিন্দ চন্দ্র রায় মশাই অভিযুক্তের পক্ষে দাঁড়ান। মিঃ মানুক আদালতকে উদ্দেশ ক'রে বলেন, তিনি এই মর্মে নির্দেশ পেয়েছেন যে, তিনি যেন মামলাটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আদালত এই অনুরোধ রক্ষায় কোন অন্তরায় না দেখায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৪ ধারা মতে কিশোরীমোহন ব্যানার্জিকে ছেড়ে দেন।

ইংলিশম্যান রিপোর্টারের কেরামতি : কিশোরীমোহনের মামলাটি উঠতেই ভকিল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় আদালতকে সম্বোধন করে বলেন, মামলাটা নেবার আগে "ইংলিশম্যান" প্রকাশিত একটি অনুচ্ছেদের প্রতি মাননীয় বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটি "ইংলিশম্যান" প্রতিনিধির টেলিগ্রাম, তাতে আমার মক্কেল সম্পর্কে এমন ভয়ানক কটাক্ষ আছে যা সুবিচারের অন্তরায় হতে পারে। আমার প্রার্থনা, বিচারক এর নিন্দা করবেন।

জজ বললেন, যখন কোন মামলা বিচারাধীন তখন এরকম লেখা অত্যন্ত অসঙ্গত, বলে তিনি একটি হুকুমনামা লিপিবদ্ধ করেন। জজ তারপর ভকিলকে বলেন, তিনি (ভকিল) কি তাঁকে (জজকে) আরও কিছু করতে বলেন ?

ভকিল: আপনার এরকম কঠোর মন্তব্য প্রকাশের পর আর কিছু অনাবশ্যক। জজ সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "ইংলিশ-ম্যানের" প্রতিনিধি কে ?

স্থানীয় টেলিগ্রাফ অফিসের মিঃ কার্টিস জবাব দিলেন, আমি "ইংলিশম্যানের" প্রতিনিধি। আমি সরকারি চাকুরে এবং এই প্রথম আমি প্রতিবেদকের কাজ করেছি। আমি এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ও অনুভূতি প্রকাশ করেছি।

বিচারকার্যে হাত দেবার আগে জজ নিম্নোক্ত হুকুমনামা লিপিবদ্ধ করেন: "ইংলিশম্যানে" প্রকাশিত একটি বিষয়ের প্রতি বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ওতে এমন কিছু মন্তব্য আছে যা তিনি তাঁর মক্কেলের প্রতি ক্ষতিকারক বলে মনে করেছেন। এটি ক্ষুদিরাম বসুর মামলা সংক্রান্ত; ৯ তারিখের "ইংলিশম্যানে" প্রকাশিত হয়েছে। আদালত স্বয়ং লেখাটি দেখেছেন এবং বলতে দ্বিধা নেই যে, এটি অন্যায় ও অসঙ্গত বলে নিন্দনীয় এবং এটি আদৌ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল না। ধরে নিচ্ছি ও আশা করছি, এটির প্রকাশ অবিবেচনাপ্রসূত এবং এর জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া অপ্রয়োজন।

(২৫)

পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লাহেরিয়াসরাই থেকে ১৪ জুন জানালেন, জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে ক্ষুদিরাম নাকি দায়রা জজের দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলের ইচ্ছা জানিয়েছেন। আজ সকালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দায়রা জজের রায় পেয়েছেন। মজঃফরপুর ছেড়ে আসবার সময় এ খবর পেলাম। মিঃ কার্ণডফ পুলিস প্রহরায় আজ বাঁকিপুর গেলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড নিয়ে নানা কথার মধ্যে লিখলেন: "আমাদের সবিনয় অভিমত, আইনের বিধানে যে বিকল্প (যাবজ্জীবন দীপান্তর) দণ্ড আছে তা দিলেই আইনের মর্যাদা রক্ষিত হত।… আমাদের স্বীকার করতে

বাধা নেই আমরা ববাবব মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী।" ২০ জুন একই মর্মে আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন: জনচিত্তের বীরপূজার অনেকখানি উষ্ণতাই হ্রাস পেয়ে যেত যদি কর্তৃপক্ষ কোন জনপ্রিয় নায়কের ক্ষেত্রে অকারণ অকৃপা প্রকাশ না করতেন। ··বিচারকালে ক্ষুদিরাম যে সহিষ্ণু আচরণ দেখিয়েছেন, অকুতোভয় নির্লিপ্ততাব পবিচয় দিয়েছেন, যখন জজ এসেসরদের অভিযোগের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন তখনও তাঁর স্মিত মুখ, তাঁর তারুণ্য, উচ্চভাবাপন্ন অভিব্যক্তি— সব-কিছু সাধারণেব চিত্তে একটা স্নেহের আসন সৃষ্টি কবেছিল। এমন একটি স্নেহভাজনেব ফাঁসীব দৃশ্য বহু ভাবতীয়েব হৃদয় স্পর্শ কবতে বাধ্য। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সবকাব একটু কৃপা প্রদর্শন কবলেই এটুকু এড়ানো যেত। বিশেষ ক'বে যাঁবা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী তাঁদেব কাছে এটি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত।

অমৃতবাজাব পত্রিকা ৭ জুলাই মজঃফরপুব বোমা বিস্ফোবণ সম্পর্কে লিখেছেন, হাইকোর্টে আজ ক্ষুদিরামেব আপীলেব শুনানীব দিন। বাবু নরেন্দ্র-কুমাব বসু ক্ষুদিবাম বসুব পক্ষে আবেদন করলেন, আজ যেন মামলাটা না ওঠে। তিনি বললেন, তাঁকে নথিপত্রগুলো দেখতে হবে।

বিচাবপতি ব্রেট: নথিপত্রগুলো কিছুকাল ধবেই তো এখানে আছে।

ভকিল: আমি সবে শুক্রবাব মামলাব বইটি পেয়েছি, আমি নথিপত্রগুলো দেখতে চাই। আমাব অনুবোধ আজ যেন বিচাবপতিগণ মামলাটা না তোলেন।

বিচাবপতি ব্রেট: বেশ, তবে আগামীকাল তুলব।

অপবাহ্ন চারটেয় বাবু নরেন্দ্রকুমাব বসু বিচারপতিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে বলেন, মামলাব নিদর্শনগুলো হাইকোর্টে নেই।

বিচারপতি ব্রেট: নিদর্শনগুলোর কি প্রয়োজন? সে তো অপবাধ স্বীকাবই করেছে।

ভকিল: বিচাব আবম্ভের আগে সে দোষ স্বীকার কবেছে কিন্তু কার্যত সে তা প্রত্যাহার কবে নিয়েছে।

বিচারপতি ব্রেট: না তো। কি নিদর্শন এবং কেন চান?

ভকিল: আমি বিশেষ ক'বে টিনেব কানেস্তারাটি চাই। আমি দেখাবো যে, এইসব জিনিস তাব পক্ষে বহন করা অসম্ভব। বিচাবপতি মহোদয়গণ এখনও তো সাক্ষ্য শোনেন নি, কোন অভিমত পোষণ করতে পারেন না। নিম্নতর আদালতে, বলতে গেলে, তার পক্ষ-সমর্থনই কিছু হয়নি। এখানে আমার মক্কেলের জন্য যথাসাধ্য করতে আমি বাধ্য।

বিচারপতি ব্রেট : আমরা কোন অভিমত পোষণ করছিনে।

বিচারপতি রিভস্ : আপনি কি ঘটনাক্রমে যেতে পারেন ?

ভকিল : জজ যদি অপরাধ স্বীকার গ্রহণ করতেন এবং তাতেই দোষ সাব্যস্ত করতেন আমি ঘটনায় যেতে পারতাম না। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরাধ-স্বীকৃতিতে তো আর দণ্ড হয়নি।

বিচারপতি ব্রেট : নিদর্শনগুলো পাঠানো হয়নি কেন ?

ভকিল : এসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রাব আমাকে বলেছেন, সচবাচব নিদর্শনগুলো চেয়ে পাঠাতে হয়।

বিচারপতি ব্রেট : আপনার কি কি নিদর্শন চাই ?

ভকিল : আমি সব নিদর্শনই চাই, বিশেষ করে টিন ও ব্যাগ।

বিচাবপতি ব্রেট : গাড়িটা চাই নে ?

ভকিল : ওটা তো নিদর্শন (exhibit) নয়।

বিচারপতি ব্রেট : বিভলভাব ও কার্তুজ কেন চাই ?

ভকিল : এসব জিনিস বহন কবা সম্ভব কি না দেখা।

বিচারপতি ব্রেট : আপনার মক্কেলেব জন্য আপনি এগুলো চাইতে পাবেন।

ভকিল, হ্যাঁ, মিলর্ড। আমি যদি জানতাম জিনিসগুলো এখানে নেই তবে আমি সকালেই সেজন্য আবেদন করতে পাবতাম। নিদর্শনগুলো (exhibits) নথিপত্রের (records) অঙ্গ।

তখন বিচাবপতিদ্বয় এই আদেশনামা লিপিবদ্ধ কবেন : সম্রাট বনাম ক্ষুদিরামেব মামলা সংক্রান্ত কিছু নিদর্শনের জন্য আবেদন কবায় বুধবাবেব আগেই যেন একজন বিশেষ বাহক মাবফৎ সব নিদর্শন এই আদালতে পাঠানো হয়।

৮ জুলাই (১৯০৮) বিচাবপতি ব্রেট ও বিচাবপতি বিভস্ আবার ক্ষুদিরামেব আপীল শুনতে লাগলেন। ক্ষুদিরামেব পক্ষে বাবু নবেন্দ্রকুমার বসু বললেন, এই মামলায়, বন্দী পক্ষ-সমর্থনে বিশেষ বকমেব নানা বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যে নির্মম ও অমানবিক প্রকৃতিব অপরাধ ঘটেছে তাতে বন্দীর পক্ষসমর্থন কঠিন হয়ে পড়েছে, কাবণ, সাধারণ লোক এই অবস্থায় বিচারের কথা ভুলে যেতে চায়। তার উপর আবাব বন্দী বলেছে, সে অপবাধী, কিন্তু এই অপরাধ-স্বীকৃতি গৃহীত হয়নি।

বিচারপতি ব্রেট : অপবাধ-স্বীকৃতি নথিভুক্ত আছে।

ভকিল (বসু) : কিন্তু গৃহীত হয়নি। জজ অপবাধ-স্বীকৃতি নথিভুক্ত কবতে

আইনত বাধ্য ছিলেন। যদি তিনি অপবাধ-স্বীকৃতি গ্রহণই কবতেন তবে তক্ষুণি দণ্ড দিতেন। যদিও বন্দী অপরাধ স্বীকার করেছে তবু বিচারপতিরূপে বিচাবকার্যেব যে-কোন স্তরে সেই অপবাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহার কবতে দেবার এক্তিয়াবও আপনাদের আছে। আপনাবা ভালরকমই জ্ঞাত আছেন যে, ইংলণ্ডে ফৌজদাবি মামলায় বন্দীকে সর্বদাই অপরাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহারে পবামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ইংলণ্ডে এটাও স্থিব হয়ে গেছে যে, দণ্ড দেবার আগে যে কোন সময়ে বন্দীব অপবাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হতে পাবে। ল' জার্নাল ১৭, ম্যাজিস্ট্রেটস কেসেস, পৃঃ ১৪৫ থেকে একটি মামলা উল্লেখ করে ভকিল বললেন, তাঁর নিবেদন এই যে, দায়রা জজ তাঁকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, তা হাইকোর্টের সমর্থন-সাপেক্ষ। এখানে সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত দণ্ড সম্পূর্ণ নয়। ততদিন পর্যন্ত বিচারপতিগণ বন্দীকে অপবাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহাব করতে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে দায়রা জজ অপবাধ-স্বীকৃতি নথিবদ্ধ কবেছেন কিন্তু তাবপব সাক্ষ্যসাবুদ নিয়েছেন এইটি দেখতে যে, এই অপবাধ-স্বীকৃতি থেকে স্বতন্ত্র এমন কোন প্রমাণ আছে কিনা যা থেকে বন্দীব অপবাধ প্রতিপন্ন কবা যায়। দায়রা জজ তাঁর রায়ে বলেছেন যে, অপবাধ স্বীকাব ও ম্যাজিস্ট্রেট-লিখিত বন্দীব স্বীকারোক্তি ছাড়াও পাবিপার্শ্বিক সাক্ষ্যসাবুদ বন্দীকে দণ্ডদানেব পক্ষে যথেষ্ট। দায়রা জজ অতি সংক্ষিপ্ত এক রায় লিখেছেন এবং এসেসরদেব জন্য বন্দীব বিরুদ্ধে সাক্ষ্যসাবুদেব যে সাবাংশ করে-ছিলেন তাবই সারাংশ স্মারকলিপিরূপে ঐ রায়ের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। এরূপ একটি সারাংশ গ্রথিত করা যে দায়বা জজের পক্ষে আবশ্যিক ছিল না একথা বিচাবপতিগণও বলেছেন।

বায়ে যে ঘটনাবলীব কথা বলা হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত হয়।

ক্ষুদিবাম বসুব আপীল-আবেদনেব মর্মকথা এই :

১ নং যুক্তি : আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছি তা দীনেশ-চন্দ্রকে বক্ষা কববাব জন্য, তিনিই আমাকে এরকম বলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

২ নং যুক্তি : আমি বলেছি যে, আমি বোমা ছুঁড়েছি, কিন্তু বস্তুত, কে বোমাটা ছুঁড়তে পারে তা বিবেচনার বিষয়। দুটি ভারি পিস্তল, একটা ডোরাকাটা কুর্তা, একটি ডোবাকাটা কাল কোট, একটি সিল্ক কুর্তা এবং বিবৃতিতে উল্লিখিত অতগুলো কার্তুজ—এত জিনিস আমার দেহে থাকতে আমি কি করে বোমা ছুঁডতে পাবি? কিন্তু দীনেশের দেহে ছিল মাত্র একটি বেনিয়ান বা ফ্রক ও একটি চাদব।

৩ নং যুক্তি : দীনেশচন্দ্র আমার চাইতে বলিষ্ঠতর এবং বয়সে বড। আমি আগেই বলেছি, কি করে পিস্তল ছুঁড়তে হয় আমি জানিনে, আমি কখনও গুলি ছুঁড়িনি। তা ছাড়া কি করে আমি এমন একটি ভয়ঙ্কর বোমা ছুঁড়তে পারি ? আমি আরও বলেছি, কিভাবে বোমা প্রস্তুত করতে হয়, দীনেশ জানত। সে আমাকে কিভাবে এ তৈরি কবতে হয় তার কিছুই বলেন নি।

৪নং যুক্তি : কবিযাদীপক্ষে বলা হয়েছে যে, বোমা ছিল দুটি। প্রথমে আমি বলেছিলাম যে, বোমাটা ঐ টিনে ছিল, কিন্তু অমন দুটি ভয়ানক বোমা ওর মধ্যে বাখা অসম্ভব। বিবৃতি দেবার সময় আমাকে বোমার আকাব জিজ্ঞাসা করায় আমি বলেছিলাম বোমাটা কত বড। আমি যে আকাব দেখিয়েছিলাম তা ঐ টিন ভরে যায়। তাহলে কি কবে সেখানে আব একটা বোমা বাখা যাবে ?

৫ নং যুক্তি : যে-ব্যাগেব মধ্যে বোমা ছিল তাব তুলোব উপব দু'টি চাপ-চিহ্ন। ধর্মশালাব যে-ঘবে আমরা থাকতাম যখন আমাকে সে-ঘবটা দেখাবাব জন্য নিয়ে গেছল তখন সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা কবা হযেছিল ব্যাগে দুটো দাগ কিসের ? আমি বলেছি, একটা টিন, একটা বোমা, দুটো জিনিস পৃথকভাবে আনা হয়েছিল, এজন্যই দুটো দাগ। আমাকে এ বিষয়ে আব কিছু বলাও হয়নি, কিছু জিজ্ঞাসাও কবা হয়নি।

৬ নং যুক্তি : দায়বা আদালতে আমাকে জিজ্ঞাসা কবা হযনি আমি আগে যে বিবৃতি দিয়েছি তা সত্য কিনা অথবা আমাব কিছু বলাব আছে কিনা ইত্যাদি।

৭ নং যুক্তি : দীনেশচন্দ্র আত্মহত্যা করেছে একমাত্র এই কাবণে যে সে একান্তই অপরাধী, কাবণ সে নিজেই বোমাটা ছুঁড়েছিল। তাব নিজেব উপব কোন আস্থা ছিল না। সে এই ভয়ে আত্মহত্যা কবেছে যে, যদি আমি বন্দী হই অথবা ইতিমধ্যে হয়ে থাকি আমি সব ফাঁস কবে দেব এবং তাব সমূহ সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই কারণে সে আত্মহত্যা করেছে।

সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং বন্দীব বিবৃতি পডবাব পব ভকিল বন্দীব পক্ষে ঐ সম্পর্কে মন্তব্য শুরু কবলেন। তিনি বললেন, বন্দী যে দুটি বিবতি দিয়েছেন তাব মধ্যে সোপর্দকাবী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতিটি নিম্নোক্ত যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য নয় : (১) ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীকে বলেন নি যে, বন্দী ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে বিবৃতি দিচ্ছেন। (২) বিবৃতিটি বর্ণনার আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোন প্রশ্ন ও কোন উত্তর লেখা হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট ২৬৪ ধাবার বিধান মান্য কবেন নি। (৩) বিবৃতি

ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, বাংলায় নয়। উডম্যানের সাক্ষ্যে এটি পরিষ্কার যে, বাংলায় বিবৃতি টুকে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেট যতক্ষণ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করছিলেন ততক্ষণ কোর্ট ইন্সপেক্টর ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন। বন্দীব স্বীকারোক্তি যেদিন লিপিবদ্ধ হয় সেদিন বন্দী তা সই কবেন নি।

ভকিল বলেন, অবশ্য ৫৩৩ ধারাবলে এইসব ত্রুটি স্খালন করা যেতে পাবে, কিন্তু বাবে বারে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যেখানে বিধানগুলো আদৌ মানা হয়নি সেখানে ৫৩৩ ধাবাবলে ত্রুটি স্খালন কবা যায় না। ভকিল প্রসঙ্গত ফুল বেঞ্চের একটি ও মাদ্রাজের একটি সিদ্ধান্তেব (আই এল আব ১৫, ক্যালকাটা ৫৯২ / ১৭ ক্যালকাটা ৩৬৩ এবং ৯ মাদ্রাজ ২২৪) উল্লেখ কবেন। মাদ্রাজের মামলায় বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে বিবৃতি বন্দীব মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ হয়নি সে ক্ষেত্রে ৫৩৩ ধাবাবলে ত্রুটি দূর করা যায় না।

বিচাবপতি ব্রেট মন্তব্য করেন: এমন তো হতে পাবে যে, বাংলায় বিবৃতি টুকে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

প্রত্যুত্তবে ভকিল বলেন, মোটেই তা নয। সেখানে বাংলা-জানা পুলিস অফিসাব ছিলেন, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবৃতি লিপিবদ্ধেব কাজে সাহায্য করতে পারতেন।

বিচারপতি রিভস: তিনি সারাক্ষণ সেখানে ছিলেন না।

ভকিল: মিঃ উডম্যান বলেছেন যে, বাঙালি পুলিস অফিসার এবং তিনি সাক্ষ্যগ্রহণে সাহায্য কবেছেন।

বিচাবপতি ব্রেট: নথিপত্রে কোথাও নেই যে, ইন্সপেক্টব ব্যানার্জি সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন।

ভকিল: বিচারকার্যের যে-কোন পর্যায়ে ইন্সপেক্টবের জবানবন্দী নেবাব প্রভূত ক্ষমতা আপনাদের আছে। ইন্সপেক্টব এখানেই আছেন। ভকিল আবও বলেন, বিবৃতি বাংলায় পড়ে শোনানো হয়, ইংরেজীতে লেখা হয়।

বিচারপতি ব্রেট: আপনার ধারণা, যদিও নথিপত্রে এমন কথা কোথাও নেই যে, যে-সময় বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয় সে-সময় বাঙালি অফিসার উপস্থিত ছিলেন এবং যেহেতু বিবৃতি বাংলায় লিপিবদ্ধ হয়নি এজন্য এটি ত্রুটিপূর্ণ ?

ভকিল: হ্যাঁ।

এরপর ভকিল যে-কথাটির উপর জোর দেন তা হচ্ছে, বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার সময় মিঃ উডম্যান বন্দীকে বলতে ভুলে গেছলেন যে, তিনি একজন

ম্যাজিস্ট্রেট, আইন মোতাবেক একথা তাঁব বলা উচিত ছিল। তা'ছাড়া, প্রথম যে প্রশ্নটি তাঁর করা উচিত ছিল তা হ'ল এই : বিবৃতি স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন কি না।

বিচাবপতি রিভস : প্রশ্নটি তিনি করেছেন বিবৃতি লিপিবদ্ধ কবার পর। বিচারপতি মন্তব্য কবেন, সংশ্লিষ্ট ধারায় কথাগুলো আছে "এ কবা হয়েছে" (It is made), "এ কবা হবে" (it would be made) নয়। দশটি মামলাব মধ্যে নয়টিতে ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীকে জিজ্ঞাসা কবেন, সে কোন বিবৃতি দিতে চায় কিনা এবং বিবৃতি দেবার পর জিজ্ঞাসা কবেন, সে বিবৃতি স্বেচ্ছায় দিল কি না।

ভকিল বলেন, মাদ্রাজেব মামলাব বিচারপতিগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অপবাধ-স্বীকৃতি স্বেচ্ছায় হচ্ছে, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই কেবল ম্যাজিস্ট্রেট তা লিপিবদ্ধ কবতে পাবেন।

বিচারপতি বিভস : মিঃ উডম্যান তখন জানতেন যে, বন্দী স্বীকারোক্তি করতে যাচ্ছেন।

ভকিল : সংশ্লিষ্ট ধাবায আছে "যখনই কোন আসামী (accused) ইত্যাদি"—

বিচাবপতি বিভস : সে তখনও আসামী হয়নি।

ভকিল : যে কাগজে স্বীকাবোক্তি লিপিবদ্ধ হয তার শিরোনামা ছিল "আসামীব (বন্দীর) জবানবন্দী" ("Examination of the accused")।

বিচাবপতি ব্রেট : তাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই আপত্তি নিম্ন আদালতে তোলা উচিত ছিল, আজকে বিচাবেব এই পর্যায়ে এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয।

ভকিল : নিম্ন আদালতে কার্যত তার পক্ষসমর্থনই হয়নি। বর্ণনাব ধবণে বিবৃতি লিখনে যে ত্রুটি বর্তমান তা স্খালন করে নেওয়া কর্তব্য, অন্যান্য ত্রুটি দূব কবা যাবে না। মুখ্য ত্রুটি হচ্ছে বন্দীব স্বাক্ষব বিবৃতিদানেব দিন নেওযা হয়নি। এটি আইন মোতাবেক হয়নি এবং এ ত্রুটি দূব করা যায় না।

বিচাবপতি বিভস : স্বাক্ষবের উদ্দেশ্য বিবৃতিব সত্যতা দেখানো। এক্ষেত্রে বন্দী ববাবব তাব বিবৃতি যথার্থ লেখা হয়েছে বলে স্বীকাব কবে এসেছে।

বিচাবপতি ব্রেট : ইন্সপেক্টর কি কবে বিবৃতি লিপিবদ্ধ কবেছেন ? সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পষ্ট বলা আছে, স্বীকাবোক্তি কোন পুলিস অফিসার লিপিবদ্ধ কববেন না।

ভকিল বলেন, সংশ্লিষ্ট ধারামতে পুলিস অফিসার হিসেবে কোন পুলিস

অফিসারের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা নিষেধ; কিন্তু কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কেরানীর মতো স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করায় নিষেধ নেই।

বিচারপতি রিভস: কোন্ ধারায় আছে স্বাক্ষর সেদিনই (স্বীকারোক্তির দিন) নিতে হবে? আমরা আপনার আপত্তি নোট করলাম।

উকিল এর পর বললেন, জজ সাক্ষ্য-নির্ভর কোন সিদ্ধান্তে আসেন নি।

বিচারপতি রিভস: তিনি সব সাক্ষ্যই সন্নিবেশ করেছেন। তিনি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যই বিশ্বাস করেছেন।

উকিল: এরকম একটি মামলায় প্রতিটি সাক্ষ্যের অংশে তাঁর সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত ছিল, সবার শেষে নয়। জজ যেখানে অপরাধ স্বীকৃতি গ্রহণ করেন নি সেখানে আইন মোতাবেক তাঁর বিচার করা কর্তব্য ছিল। তিনি ৩৪২ ধারামতে বন্দীর জবানবন্দী নেন নি।

বিচারপতি ব্রেট: হ্যাঁ আমরা নোট করে নিলাম, ৩৪২ ধারামতে বন্দীর জবানবন্দী নেওয়া হয়নি।

তারপর উকিল বলেন, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যসাবুদ অন্যনিরপেক্ষভাবে অপরাধ সাব্যস্ত করতে পারে না। স্বীকারোক্তি (confession) ও অপরাধ-স্বীকৃতি (admission of guilt) বাদ দিলে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। এই পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যই বা কি ধরণের? দুটি বালককে জজবাড়ির কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। একজনের গায়ে একটি শাদা সার্ট, আর একজনের গায়ে একটা আঁট কোট। যে কনস্টেবলকে ওখানে মোতায়েন করা হয়েছিল সে বলেছে, যে-লোকটি বোমা ছুঁড়েছে তার গায়ে ছিল আঁট কোট, কিন্তু সাক্ষ্যে পাওয়া যাচ্ছে, যে বোমা ছুঁড়েছে তার গায়ে ছিল সার্ট। বিচারপতিগণ যদি কনস্টেবলের বন্দীকে সনাক্তকরণ বাদ দেন তবে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বন্দীর বিরুদ্ধে যায় না। বন্দী অত্যন্ত কাপুরুষোচিত অপরাধ করেছে এবং পুলিস অফিসারদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কনস্টেবল দুটি বাঙালি ছেলেকে ঘটনার এক ঘণ্টা আগে জজবাড়ির কাছে দেখেছে এবং পরদিনই এক বাঙালি তরুণ ধৃত হয়। এটি মোটেই আশ্চর্য নয় কনস্টেবল তাকেই এই অমানুষিক অপরাধের নায়ক বলে সনাক্ত করবে। তারা একটা বর্ণনা দিয়েছিল এ কথা সত্যি, কিন্তু অমন বর্ণনা বহু বালকের ক্ষেত্রেই খাটে। তারপর, বন্দীর জুতো জোড়া ওখানে পাওয়া গেছে বলেই সে বোমা ছুঁড়েছে এ প্রমাণিত হয় না। সে ময়দানে আনাগোনা করত এ সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। অতএব তাঁর

বক্তব্য এই যে, যদি তাকে সেখানে দেখাও গিয়ে থাকে, জুতো পাওয়া গিয়ে থাকে, সে খালি পায়ে ধৃত হয়ে থাকে তথাপি তার অপরাধ প্রমাণিত হয় না। আসল কথা হচ্ছে, যে-বোমা ফেলেছিল বন্দী তার সঙ্গী ছিল এবং শেষ মুহূর্তে সে ঘাবড়ে যায় ও পলায়নের পথ ধরে। ভকিল বলেন, এটি শারীরিক বিচারেও অসম্ভব যে, বন্দীর মতো একটি দুর্বল ছেলে অন্ধকার অজানা দেশে দুটি রিভলভার, ৩২টি কার্তুজ ও একটি বোঝা নিয়ে ২৫ মাইল হেঁটে গেছে।

স্বীকারোক্তি ও অপরাধ-স্বীকৃতি সম্পর্কে ভকিল বলেন, বিচারপতিগণ অবগত আছেন, এমন বহু মামলা আছে যেখানে নিরীহ মানুষেরা স্বীকারোক্তি করেছে। ফরিয়াদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, এই বালকটি ইচ্ছে করে এই ভয়াবহ অপরাধ সংঘটনের সামর্থ্য রাখে।

ভকিল বলেন, বন্দীর স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, যদি নিতান্ত গ্রহণ করাও হয়, এর উপর নির্ভর করা যায় না। এই অল্পবয়স্ক বালকটিকে মারাত্মক এক অপরাধে গ্রেপ্তার করে পুলিস অফিসার-পরিবেষ্টিত ডি-এস-পি ও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যখন হাজির করা হল, তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং পরিণতির কথা না ভেবেই কিছু কথা বলে ফেলেছে। বিবৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কমসেকম ন'টি মিথ্যা উক্তি তাতে স্থান পেয়েছে।— ঘটনার পাঁচ-ছয়দিন আগে সে সেখানে (মজঃফরপুরে) গেছে, একথা সত্যি নয়। একথা মিথ্যে যে, সে হাওড়াতে দীনেশের সঙ্গে মিলেছে এবং বোমাটি গ্লাড-স্টোন ব্যাগ করে আনা হয়েছে। এটা সত্য নয় যে, তার একটা ডোরাকাটা কোট ও হাতে একটা বোমা ছিল। মিঃ উইলসন ছাড়া আর কেউ দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনেনি, বন্দীর হাতে কনস্টেবলও কিছু দেখেনি। একথা মিথ্যে যে, সে বাজারে কার্তুজগুলো কিনেছে এবং সে কলকাতায় মামাবাড়ি থাকত। এমন বিবৃতি গ্রহণযোগ্য নয়।

ভকিল তারপর 'কুইন্স বেঞ্চের' অংশবিশেষ পড়ে মন্তব্য করেন যে, পারি-পার্শ্বিক সাক্ষ্য অপরাধ-স্বীকৃতি দিয়ে সমর্থনীয় নয়। প্রসঙ্গত তিনি কুইন বনাম টমসন (কুইন্স বেঞ্চ ২, পৃঃ ১২) উল্লেখ করে বলেন যে, স্বীকারোক্তি ইতিবাচক-রূপে সত্য প্রতিপন্ন করতে হবে। উল্লিখিত মামলায় দেখানো হয়েছে যে, কোন ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি সত্য নয়।* ভকিল নিবেদন করেন, (ক্ষুদিরামের) স্বীকারোক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহৃত হোক।

* মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড়ে লাটের ট্রেন বোমায় উড়িয়ে দেবার চেষ্টা। "দক্ষ

বিচারপতি ব্রেট মন্তব্য করেন, তাঁরা নথিপত্র দেখে মামলার উপসংহারে আসবেন, দেখবেন স্বীকারোক্তি ছাড়াও যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে কিনা।

এরপর ভকিল বলেন, বোমা নিক্ষেপের সময় সে আদৌ ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। ঘটনার এক ঘণ্টা আগে তাকে দেখা গেছে। এ থেকে এই উপসংহার হয় না যে, সে অপরাধ অনুষ্ঠানের সময়েও উপস্থিত ছিল।

বিচারপতি ব্রেট মন্তব্য করেন, অপরাধ সংঘটনকালে উপস্থিত থাকার কথা সে তো হাইকোর্টে অস্বীকার করেনি যে, কে বোমা নিক্ষেপ করেছে তা বিবেচনা করতে হবে ?

তদুত্তরে ভকিল নিবেদন করেন, বস্তুত সে স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেছে। বিচারপতিগণ তার আপীলের আবেদন সত্ত্বেও যে-কোন সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করতে পারেন।

জুলাই ১০, শুক্রবার : ভকিল বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু বিচারপতিগণকে বললেন, সেদিন (বুধবার) তিনি বলতে ভুলে গেছলেন দুটি ব্রিটিশ মামলার কথা। সেখানে আছে, অপরাধ-স্বীকৃতি সত্ত্বেও বন্দী বেকসুর মুক্তি পেয়েছে (কিংস বেঞ্চ ১৯০২, পৃঃ ৩৩৮ ও ৩৩৯)। অবশ্য, ঐ দুটি মামলা ও বর্তমান মামলাটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ওগুলো ছিল ষড়যন্ত্র মামলা এবং এক ষড়যন্ত্রকারী অপরাধ স্বীকার করেছিল। অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা অপরাধ স্বীকার করেনি এবং তাদের যথারীতি বিচারের পর তারা ছাড়া পায়। যে ষড়যন্ত্রকারী নিজে অপরাধী বলে স্বীকার করেছিল 'কোর্ট অব ক্রাউন রিজার্ভ' এই যুক্তিতে তাকে ছেড়ে দেন যে, যেহেতু জুরী সকল ষড়যন্ত্রকারীকেই মুক্তি দিয়েছেন সেই হেতু যে অপরাধ স্বীকার করেছে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে না— অভিযোগ সকলের বিরুদ্ধে ছিল একই।

ভকিল (১৯০২ কিংস বেঞ্চ, পৃঃ ৩৩৯) মামলাটি পড়তে যাচ্ছিলেন, বিচারপতি ব্রেট বললেন, অনাবশ্যক। কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী ঐ রায় থেকে আপনি যে-কথাটা তুলতে চাইছেন তা ৩৪৭ পৃষ্ঠায় আছে। সেখানে এই কথাটা তোলা

গোয়েন্দা" আবিষ্কার করে এক কুলি গাড়ি। রাজসাক্ষীও পাওয়া যায়। ধৃতদের দণ্ড হয়। দণ্ড হাইকোর্টেও সমর্থিত হয়। বন্দীরা দণ্ডভোগ করতে থাকে। অকস্মাৎ বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি —ও কাজটা তাঁদেরই, কুলিদের নয়। গোয়েন্দার কারসাজিতে রাজসাক্ষীর আবির্ভাবও হয়. দায়রা এবং হাইকোর্টের বিচারকগণ ? তারাও মেনে নেন, ফলে চরম অবিচার ঘটল নিরীহ নিরপরাধ কুলিদের দুর্ভাগা জীবনে।

হয়েছে যে, আপীলকারীকে অপরাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহারে অনুমতি দিতে আদালত পারেন কিনা, আদালত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পারেন রায়ের আগে, পরে নয়। ঐ মামলার ঘটনাবলীও এ মামলা থেকে সর্বতোভাবে পৃথক।

ভকিল: বিচারপতি রিভস গতকাল জানতে চেয়েছিলেন, স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার এমন কোন মামলা আছে কিনা যেখানে স্বীকারোক্তি অগ্রাহ্য হয়েছে। আমি তেমন একটি মাত্র মামলা খুঁজে পেয়েছি এবং ৮ ক্যালকাটা উইকলি নোটস, পৃঃ ২২এ আছে। তা হচ্ছে, বিচারপতি রামপিনি ও বিচারপতি হ্যাণ্ডলের সিদ্ধান্ত। হত্যার মামলা। বিচারপতিগণ ২ ক্যালকাটা উইকলি নোটস, ১০২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মামলার সিদ্ধান্তবলে ম্যাজিস্ট্রেটের লিপিবদ্ধ বন্দীর কোন কোন বিবৃতি অগ্রাহ্য করেন।

বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু স্বীকারোক্তিতে তাঁর আপত্তিগুলো উল্লেখ করে বলেন, আমার আপত্তি যে, (১) আমি যেসব যুক্তি দেখিয়েছি সেসব যুক্তিতে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, (২) স্বীকারোক্তি যেখানে গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে দোষ সাব্যস্ত করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য নেই, (৩) যদি বিচারপতিগণ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্যও মনে করেন, নিম্ন আদালতে জজ ৩৪২ ধারা মতে বন্দীর বিবৃতি না নেওয়ায় এবং যথার্থ বিবৃতি না নেওয়ায় বিচারকার্যে চ্যুতি ঘটেছে, (৪) যাই কেন হোক না, মামলাটির পুনর্বিচার হওয়া উচিত।

ভকিল অতঃপর দণ্ড লাঘবের প্রশ্নটি তোলেন। বিচারপতিগণ যদি বন্দীকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন, সেক্ষেত্রে আমার কেবল এই বক্তব্য, আমি কখনও কোনপ্রকারে অপরাধের প্রকৃতিকে সামান্য করে দেখাতে চাই নি। কিন্তু আমি সশ্রদ্ধ এই অনুরোধ জানাতে চাই যে, বিচারপতিগণ যেন মৃত্যুদণ্ড সমর্থনের আগে বন্দীর অল্প বয়স ও বিচারকালে তার আচরণের কথা স্মরণে রাখেন। এই বালকটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে এটি পরিষ্কার যে, সে অন্য কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে ক্রীড়নক-মাত্র। সে যে যথেষ্ট দৃঢ় মনোবলের অথবা দৃঢ় চরিত্রের বালক নয় তা তার বিবৃতিতে এবং বিচারকালে তার আচরণেই প্রকাশ পেয়েছে। আমি ইতিপূর্বে বলেওছি, আমি অপরাধের গুরুত্ব কোনরকমে লঘু করে দেখাতে চাইনে। কিন্তু বিচারপতিগণ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় তবে তা একমাত্র তারই নিজস্ব বিবৃতির উপর নির্ভর করে করতে হবে। যে-বিবৃতির উপর নির্ভর করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হচ্ছে তা এমন এক বন্দীর বিবৃতি

যার অনুভবশক্তি স্পষ্টতই—মাননীয় জজের মতেই—যথেষ্ট পরিণত নয়। কাজটা তার নিছক অপবাধপ্রবণ ভ্রান্তির পাগলামি। অতএব বিচারপতিগণ, আমাব আত্যন্তিক প্রত্যাশা, মৃত্যুদণ্ড সমর্থন কবার আগে সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখবেন। বিচারপতিগণের কাছে এই প্রশ্নটিই রাখতে চেষ্টা করেছি যে, উল্লিখিত পারিপার্শ্বিক পবিস্থিতিতে বিবেকসম্মতভাবে মৃত্যুদণ্ড ছাডা কি কোন বিকল্পই নেই?

বিচারপতি তখন ক্রাউনপক্ষেব (সোজাসুজি, সরকারপক্ষের) ডেপুটি লিগাল রিমেমব্রেন্সার মিঃ অব (Mr. Orr)-কে সম্বোধন কবে বলেন, আপনার যদি কিছু বলার না থাকে তবে আপনাকে আমবা ডাকতে চাইনে। মিঃ অব বলেন, ৩৪২ ধাবামতে দায়রা আদালতে বন্দীব জবানবন্দী নেওয়া হয়নি বলে যে আপত্তি উঠেছে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। প্রথা এই যে, দায়রা আদালতে সোপর্দ করাব আগে ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীব জবানবন্দী নেবেন এবং ঐ জবানবন্দী ১৮৯৮ আইনের ২৮৮ ধারামতে পেশ করতে হবে। ১৮৯৯ আইনে এর পদ্ধতি পুরোপুরি বিন্যস্ত আছে। আমার বক্তব্য, দায়বা জজ নির্ভুল ও সঠিকভাবে সে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। ২৮৬ ধারায় বলা আছে, পূর্বে যথারীতি লিপিবদ্ধ জবানবন্দী, অর্থাৎ বন্দীব জবানবন্দী, এবং ৩৪২ ধাবামতে সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহীত জবানবন্দী অভিযোক্তা (প্রসিকিউটার) পেশ করবেন এবং সাক্ষ্য-হিসেবে পঠিত হবে। তা করা হয়েছে। তারপর ২৮৯ ধারায় বলা আছে, বন্দীব জবানবন্দী নেওয়া শেষ হলে বন্দীকে জিজ্ঞাসা কবা হবে—সে সাক্ষ্য দাখিল করতে চায় কিনা। যে ক্ষেত্রে ৩৪২ ধারামতে ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দী নিয়েছেন সেক্ষেত্রে আবার দায়রা আদালতে জবানবন্দী নেওয়া প্রথা নয়।

বিচারপতি রিভস: ২৮৯ ধারামতে বন্দীর জবানবন্দী নেওয়া-না-নেওয়া আদালতের ইচ্ছাধীন।

মিঃ অর: ঠিক তাই। এরপর আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দায়রা আদালতে গ্রহণ-যোগ্যতার আপত্তি সম্পর্কে বলব। ১৬৪ ও ৩৮৪ ধারা দুটির বিধানগুলো মানা হয়নি মেনে নিলেও স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের পঞ্চম আইনের ৫৩৩ ধাবাবলে সে ক্রটি স্খালনযোগ্য। কিন্তু উকিলবাবু যে যুক্তিগুলো দিয়েছেন সেগুলো যথার্থ নয়। তিনি বলেছেন, স্বীকাবোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, কারণ, স্বীকারোক্তির শুরুতেই সে কথা লেখা নেই। কিন্তু স্বীকারোক্তিব শেষে ৭৯ পৃষ্ঠায় বন্দীকে প্রশ্ন

করা হয়, "তুমি সবটা বিবৃতিই কি স্বেচ্ছায় বললে ?" উত্তর হয়েছিল, "আমি যা কিছু বলেছি তা সত্য, তার সবটাই স্বেচ্ছায় বলেছি।"

মিঃ অর বলেন, দণ্ডের প্রশ্নে ক্রাউনের সৌজন্য ও প্রথা এই যে, ওটি সর্বতোভাবে আদালতের এক্তিয়ারে ছেড়ে দেওয়া। সুতরাং, আমি দণ্ডের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলব না, সর্বতোভাবে ওটি আপনাদের ব্যাপার।

বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু : বন্দীর জবানবন্দী সম্বন্ধে মিঃ অর যা বললেন সে বিষয়ে আমি একটু বলতে পারি ?

বিচারপতি ব্রেট : হ্যাঁ।

বাবু নরেন্দ্রকুমার : ২৩৯ ধারার প্রথম অনুচ্ছেদটি এই : "ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দী এবং আসামীদের কারও জবানবন্দী শেষ হলে আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে কোন সাক্ষ্য পেশ করতে চায় কিনা।" পক্ষান্তরে মিঃ অর বলেছেন যে, ওটা বিচারকের ইচ্ছাধীন। আমার নিবেদন এই যে, ৩৪২ ধারা অবশ্য পালনীয়। সাক্ষ্যসাবুদে যদি এমন কোন পরিস্থিতি দেখা যায় যা বাহ্যত বন্দীর বিপক্ষে যাচ্ছে তবে জজ অবশ্য বন্দীর জবানবন্দী নেবেন। আমি সেদিন বলেছিলাম অনিয়ম যদি কেবল বন্দীর জবানবন্দী প্রশ্ন ও উত্তরে না নেওয়ায় ঘটে তবে সে ত্রুটি ৫৩৩ ধারাবলে স্খালন করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি এমনিতর ঘটে থাকে তবে ৫৩৩ তা স্খালন করতে পারে না। বন্দীর মাতৃভাষায় বিবৃতি না নেবার যে ত্রুটি এবং জবানবন্দীর দিন বন্দীর স্বাক্ষর না নিয়ে পরদিন নেবার যে ত্রুটি তা ঐ ধারায় কাটে না।

বিচারপতি ব্রেট : আমরা আমাদের রায়ের কথা ভাবব এবং সোমবারের মধ্যেই তা দেব।

অমৃতবাজার পত্রিকার ১৪ জুলাই মঙ্গলবার "ক্ষুদিরামের আপীল খারিজ : মৃত্যুদণ্ড বহাল" এই শিরোনামায় বিচারপতিদ্বয়ের রায়টি বেরোয়। বিচারপতি ব্রেট রায়টি পড়েন। ১৯০৮ এর ৩০ এপ্রিল বিস্ফোরণে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডির মৃত্যু ঘটানোর দায়ে ভারতীয় ৩০২ ধারামতে অভিযুক্ত হয়ে অথবা বিকল্পে দীনেশচন্দ্র রায় কিংবা কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে এই কাজে প্ররোচিত ও সহায়তা করার দায়ে বিচারের জন্য ক্ষুদিরাম বসুকে মজঃফরপুরের দায়রা জজের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ক্ষুদিরাম হত্যাপরাধ স্বীকার করেন। দায়রা জজ এই অপরাধ-স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু সাক্ষ্যসাবুদ দেখে শুনে বিচার করা স্থির করেন। তিনি ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য এক উকিলকে অনুরোধ

করেন। দুই এসেসরের সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। দুই এসেসরই একমত হয়ে আপীলকারী (ক্ষুদিরাম)কে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজ তাঁদের অভিমতসহ ক্ষুদিরামকে অভিযোগমতো দোষী সাব্যস্ত ও ভাঃ দঃ বিধির ধারামতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই দণ্ড সমর্থনের জন্য ৩৭৪ কার্যবিধিমতে এই আদালতে (হাইকোর্টে) এসেছে এবং সেই সঙ্গে এসেছে ক্ষুদিরামের পক্ষ থেকে একটি আপীলও।

ফরিয়াদীপক্ষের মামলাটি ছিল এই: ১৯০৮ এর ৩০ এপ্রিলে রাত্রি সাড়ে আটটায় মিসেস ও মিস কেনেডি একটি এক-ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে মজঃফরপুরের স্টেশন ক্লাব থেকে বাড়ি-মুখো রওনা হন। **জেলা জজ মিঃ কিংসফোর্ড তখন যে ধরণের গাড়ি ব্যবহার করতেন এই গাড়িটাও সে-ধরণের ছিল।** বাড়ি যাবার জন্য মহিলাদের ক্লাব-চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তায় ডান দিকে বা পশ্চিম দিকে ঘুরতে হয় ও কিংসফোর্ডের গৃহ-প্রাঙ্গণের সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। গাড়িটা যখন কিংসফোর্ড গৃহপ্রাঙ্গণের পূবগেটের কাছে পৌছোলো দুটি লোক বিপরীত দিক অর্থাৎ রাস্তার দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে এল, ঐখানে তারা গাছের নীচে লুকিয়ে ছিল, **একজন একটি বোমা ছুঁড়ল অথবা দু'জনই দুটি বোমা ছুঁড়ল।** নিদারুণ বিস্ফোরণ ঘটে, এমন যে, ঘোড়াটা গাড়িশুদ্ধ ছুট দেয়। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর কিংসফোর্ডের বাড়ি অবধি পিছিয়ে আনা হয়। তখন দেখা যায়, গাড়ির কাঠামোটা বিধ্বস্ত হয়েছে এবং মহিলারা ভীষণ আহত হয়েছেন। সইস গাড়ির পেছনে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে অচেতন ও আহতাবস্থায় পূব গেটের কাছ থেকে ধরে তুলতে হয়। **ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আহত মিস কেনেডি মারা যান, মিসেস কেনেডি পরদিন অবধি (২ মে) বেঁচে থাকেন,** তারপর ঐ আঘাতের কারণেই মারা যান। সইস বিচারকালেও আরোগ্যলাভ করেনি। যে মেডিকাল অফিসার মহিলাদের মৃত্যুর আগে ও পরে এবং সইসকে পরীক্ষা করেন তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে-আঘাতে দু'জন মহিলার মৃত্যু ঘটেছে এবং সইস আহত হয়েছে তার কারণ বোমা-বিস্ফোরণ। এ বিষয়ে কোন সযৌক্তিক সংশয়ের অবকাশ নেই যে, **যে বা যারা একটি বা দুটি বোমা ছুঁড়েছিল** তাদের অভিপ্রায়ই ছিল গাড়ির আরোহীদের মৃত্যু ঘটানো। তার বা তাদের মহিলা দুটির অথবা অন্য কারও মৃত্যু ঘটানো উদ্দেশ্য ছিল কিনা সেই বিচার ভাঃ দঃ বিধির ৩০১ ধারামতে

অপরাধের ইতর বিশেষ ঘটায় না। এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, যে-লোকটি বা যে লোক দু'টি বোমা বা বোমা দু'টি নিক্ষেপ করেছে সে বা তারা হত্যাপরাধ করেছে। এই ঘটনাগুলো নিয়ে কিন্তু আপীলে কোন বিসংবাদ নেই।

আমাদের যে প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করতে হবে তা হচ্ছে: আপীলকারী (ক্ষুদিরাম) ই সেই লোক কিনা যে বোমা ছুঁড়েছে অথবা একাধিক হয়ে থাকলে যারা বোমা ছুঁড়েছে তাদের একজন কিনা, অথবা যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তার (ক্ষুদিরামের) সঙ্গীই বোমা ছুঁড়েছে তা'হলে সে (ক্ষুদিরাম) সম-অপরাধী কিনা এই যুক্তিতে যে, তারা একই উদ্দেশ্যসাধনে (ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধারা) ঐ কাজ করেছে। ফরিয়াদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, আপীলকারী ও তার সঙ্গী, দু'জনই, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জেলা জজকে হত্যার একই উদ্দেশ্যে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল এবং যদি তাই হয় ও একজনই যদি বোমা ছুঁড়ে থাকে তবু দু'জনই হত্যাপরাধে সমভাবে দায়ী। (ফস্টার ক্রিম. ল., ৩৫০)

সাক্ষ্যসাবুদ ছাড়া রয়েছে বন্দীর স্বীকারোক্তি—জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। জজ এসেসরদের উদ্দেশে মামলার যে সারাংশ দেন তাতে সাক্ষ্য-সাবুদ নিয়ে আলোচনা আছে এবং জজ চেয়েছেন এই সারাংশ যেন তার রায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা হয়। রায়ে তিনি বলেছেন, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রভৃত এবং হত্যাপরাধ সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর স্বীকারোক্তি ও অভিযোগের উত্তরে তাঁর অপরাধ-স্বীকৃতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

দায়রা জজ অবশ্য তাঁর সারাংশে সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের জবানবন্দী নেবার রীতির নিন্দা করেছেন কিন্তু উল্লেখ করেন নি তান কতটুকু সে জবানবন্দী গ্রহণ করেছেন, কতটুকু নেন নি। কোন কোন প্রশ্ন যতই আপত্তিকর হোক না কেন, আমাদের মতে এটা পরিষ্কার যে, সেজন্য সমগ্র জবানবন্দীই অগ্রাহ্য করবার নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, জজ যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে সারাংশ রায়ে সংযুক্ত করেছেন তাতে বোঝা মুস্কিল যে তিনি কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করেছেন। দায়রা জজের সামনে বিচারকালে এটাও পরিষ্কার যে, আপীলকারী ফরিয়াদের সততায় প্রশ্ন তোলেন নি এবং হত্যাকালে তিনি যে ঘটনাস্থলে ছিলেন তাও অস্বীকার করেন নি।

তাঁর আপীল-আবেদনেও তাঁর অপরাধের অস্বীকৃতি অথবা এ ব্যাপারে তিনি যে জড়িত ছিলেন তার অস্বীকৃতি নেই। ১ নং যুক্তিতে তিনি বলেছেন, জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা দীনেশ চন্দ্র রায়কে বাঁচাবার জন্য, কেননা, তিনি সেই রকমই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট যুক্তিগুলোতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, দুটি পিস্তল ও অন্যান্য জিনিসে তিনি ভারগ্রস্ত ছিলেন, কিভাবে পিস্তল ও বোমা ছুঁড়তে হয় তিনি জানেন না, এমতাবস্থায় আদালতই স্থির করবেন তিনি অথবা দীনেশ চন্দ্র বোমা নিক্ষেপ করেছেন এবং শেষ যুক্তিতে তিনি বলেছেন দীনেশ চন্দ্র যে আত্মহনন করেছেন তার একমাত্র কারণ তিনি বোমা-নিক্ষেপের অপরাধ করেছেন।

এই যুক্তিগুলো আমরা পরে বিবেচনা করব, প্রথমে আমাদের আপীলকারীর আইনজীবী যেসব যুক্তি অবলম্বন করে সওয়াল করেছেন এবং যেসব যুক্তিজাল এ যাবৎ অপর আদালতে অনুসৃত হয়েছে তা থেকে সর্বতোভাবে পৃথক, আপীলকারীর নিজেরই আপীলের যুক্তিগুলোর সঙ্গে সর্বৈব সামঞ্জস্যহীন, তা বিচার করতে হবে। আমরা এই বলতে পারি, ঐ যুক্তিগুলো প্রায় সর্বাংশে কার্যিক বা টেকনিকাল, ফরিয়াদ আক্রমণের কোন চেষ্টাই হয় নি। প্রথম আক্রমণ-লক্ষ্য দায়রা জজের রায়। বলা হয়েছে, জজ আইনত এসেসরের উদ্দেশে-কৃত সারাংশ রায়ের অঙ্গীভূত করতে পারেন না। অতএব রায় অসম্পূর্ণ, রায়ে সাক্ষ্যের কোন আলোচনা বা বিবৃতি নেই। এই যুক্তিতে দোষ সাব্যস্ত করা যায় না, এ খারিজ করে পুনর্বিচারের আদেশ দেওয়া উচিত। বলেছি, আমাদের মতে, আপত্তিগুলো নিছক কার্যিক, এতে কোন সারবস্তু নেই। জজ যদি তাঁর সারাংশের একটা নকল করে থাকেন এবং রায়ে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন সেক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, সারাংশ গ্রথিত করায় আইনগত কোন বাধা নেই। এরূপ সারাংশ রায়ের স্বাভাবিক অংশ বলে গণ্য হবে। এতে যদিও ঘটনাক্রম ও সাক্ষ্যাদি এসেসরদের সহায়তার জন্য নিরপেক্ষভাবে বিধৃত হয়েছে, ঐ ঘটনাক্রম ও সাক্ষ্যাদি প্রকৃতপক্ষে মামলা নিষ্পত্তির উপায়, এগুলোর উপরই মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল এবং জজের সিদ্ধান্ত তদনুসারী। সারাংশে যে ঘটনাক্রম ও সাক্ষ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে জজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিও তাই। অবশ্য তাঁর পদ্ধতিটি অসুবিধাজনক এবং আমাদের অনুমোদনলভ্য নয়। কিন্তু আমরা একথা বলতে পারিনে যে, এ অবৈধ অথবা রায় এমন দূষিত যে, তা গ্রহণের অযোগ্য হয়ে গেছে। তথাপি আপত্তি যখন তোলা হয়েছে তখন যেহেতু এটি ঘটনাভিত্তিক আপীল সেই হেতু আমাদের রায়ে সাক্ষ্যও সন্নিবেশ করা সঙ্গত মনে করি।

দ্বিতীয় আক্রমণ-লক্ষ্য হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের লিপিবদ্ধ বন্দীর স্বীকারোক্তি।

কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ এই স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, স্বীকারোক্তি যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণযোগ্য নয় : (১) ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীকে একথা বলেননি যে, তিনি এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিবৃতি দিচ্ছেন , (২) কার্যবিধিব ১৬৪ ধারার বিধানগুলো এইভাবে অমান্য করা হয়েছে : (ক) বন্দীকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং বন্দী যেসব জবাব দিয়েছে তা লিপিবদ্ধ হয়নি , (খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্যে যদিও এটি পরিষ্কার যে, বন্দীর মাতৃভাষা বাংলায় স্বীকাবোক্তি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল তথাপি স্বীকারোক্তি ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে , (গ) যেদিন স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হয় সেদিন অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেব উপস্থিতিতে বন্দীব স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি, পরদিন জনৈক সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বাক্ষব নেওয়া হয়েছে , (ঘ) স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট সুনিশ্চিত হয়ে নেননি যে, স্বীকারোক্তি স্বতঃপ্রণোদিত ।

এই আপত্তি সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করেছি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন, তিনি যে ম্যাজিস্ট্রেট একথা তিনি বন্দীকে বলেছেন কিনা তা তাঁর মনে নেই, তবে একথাও বলেন যে, তিনি তা করেননি এই মনে করে যে, বন্দী নিশ্চয়ই জ্ঞাত ছিলেন যে, তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, কারণ, তাঁর স্বীকারোক্তি নেবার জন্য তিনি বন্দীকে আদালতে নিয়ে আসেন। আমাদেবও অভিমত এই যে, যে-পরিস্থিতিতে বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে বন্দী নিশ্চয়ই বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, যে-অফিসার তাঁর স্বীকারোক্তি লিখেছেন তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। যে-ট্রেনে বন্দীকে ওয়েইনী স্টেশন থেকে আনা হয় ম্যাজিস্ট্রেট সে-ট্রেন দেখেন এবং তাঁরই আদেশে বন্দীকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দী অশিক্ষিত নিরক্ষর নন, তিনি জ্ঞাত ছিলেন, জেলা (পুলিস) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন ট্রেনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তখন ঐভাবে যিনি (তাঁকে নিয়ে যাওয়ার) আদেশ করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই কর্তাব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট। বস্তুত, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে বন্দী তাঁর জবানবন্দীতে স্বীকার করেছেন যে, যিনি তাঁর বিবৃতি নিয়েছেন তিনি ম্যাজিস্ট্রেটই হবেন।

চারদফায় লেখা পরবর্তী আপত্তি সম্পর্কে বিচারপতিগণ বলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকার করেছেন, তিনি বন্দীকে প্রশ্ন করেছেন কিন্তু বন্দীর জবাব-গুলো বর্ণনার আকারে লিখেছেন। ঐভাবে সমগ্র বিবৃতি লেখবার পর বন্দীর বাংলায় পড়ে শোনানো হয়, এবং একটিমাত্র বাক্য ছাড়া বন্দী বলেন,

'ঠিক আছে'। যে বাক্যটি বেঠিক বলা হয় সেটি কেটে দেওয়া হয়। আমরা অভিনিবেশসহকারে স্বীকারোক্তিটি পড়েছি এবং যতটা বুঝেছি তাতে বলা যায়, প্রশ্নগুলো নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। বন্দীর কাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্য তিনি এমন কোন প্রশ্ন করেন নি যা তিনি জানতেন, তিনি তো ঘটনার কথা আগে-ভাগে জানতেন না। আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন যে, এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক প্রশ্নোত্তরগুলো না লিপিবদ্ধ করে বন্দীর স্বার্থ কিভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

সম্রাজ্ঞী বনাম ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী (২ সি. ডবলিউ এন, পৃঃ ১০২) এবং সম্রাট বনাম রজনীকান্ত (৮ সি. ডবলিউ. এন, পৃঃ ২২) মামলা দুটি উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের মতে, এ দুটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বর্তমান মামলা সম্পর্কে আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, প্রশ্ন ও উত্তর আকারে বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ না করায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বন্দীর কোন হানি হয়নি। আমাদের বক্তব্যের সপক্ষ নজীর হিসাবে আমরা ফেকু মহতো বনাম সম্রাজ্ঞী (আই-এল-আর ১৪, ক্যাল ৩৩৯) মামলাটি উল্লেখ করব। বন্দীপক্ষের আইনজীবীর আপত্তিগুলো শেষ পর্যন্ত খণ্ডন বা অগ্রাহ্য করে বিচারপতিদ্বয় বলেন, আমাদের মতে, এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, যে-সময়ে বন্দীর স্বীকারোক্তি নেওয়া হয় সে সময় তা বাংলায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, কার্যবিধির ৩৬৪ ধারা-মতে ইংরেজীতে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা সঙ্গতই হয়েছে এবং দায়রা জজের কাছে তা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছে। একথা সত্য যে, যেদিন স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে সেদিন তা স্বাক্ষরিত হয় নি, পরদিন হয়েছে। স্বাক্ষর নেওয়া হয় বিবৃতি বা স্বীকারোক্তির স্বীকৃতি হিসাবে। স্বীকারোক্তি নেবার পর স্বাক্ষর না নেওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই যেখানে শপথ নিয়ে স্বীকারোক্তির যাথার্থ্যের কথা বলছেন তখন আর আপত্তির কারণ থাকে না। আমাদের অভিমত, এক্ষেত্রে এমন কোন অনিয়ম বা অসঙ্গতি ঘটেনি যা ঐ স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবার পথে অন্তরায় বলা চলে। তা ছাড়া, আমাদের বলতে হচ্ছে, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দী যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা পড়ে শোনানো হয় এবং বন্দী বলেছেন, ওতে তাঁর কথাই যথাযথ আছে, তবে কোন কোন জায়গায় দীনেশ তাঁকে যা শিখিয়েছিলেন তাও আছে।

বিচারপতিগণ বলেন, কার্যবিধির ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারা দুটির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বন্দীর যথার্থ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা। যে-স্বীকারোক্তি নিয়ে কথা উঠেছে সে সম্পর্কে বন্দী একাধিকবার বলেছেন যে, ঠিকই আছে। আপত্তি যা-কিছু নিতান্তই

আনুষ্ঠানিক এবং মামলার আসল বিষয়কে তা স্পর্শ করেনি। আর একটা আপত্তি ছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তি নেওয়া শুরু করার আগে জেনে নেন নি, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কি না। ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার পর এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন ও সুনিশ্চিত হয়েই 'স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত' একথা লেখেন। মামলার কোন পর্যায়ে অথবা আপীলের বিষয়সূচীতে একথার উল্লেখ নেই যে, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। আমরা দায়রা জজের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত যে, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আপীলকারীর আইনজীবী এই মর্মে আভাষ দিয়েছেন যে, বন্দী নিশ্চয়ই পুলিসের ভয়ে স্বীকারোক্তি করেছেন। বন্দী নিজে কখনও বলেন নি যে, তাই হয়েছে, তিনি কখনও, কি সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কি দায়রা জজের কাছে, তিনি যা বলেছেন তা প্রত্যাহারের চেষ্টা করেন নি। পক্ষান্তরে, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর স্বীকারোক্তির কোন্ কোন্ অংশ দীনেশের পরামর্শানুসারে বলেছেন তাই উল্লেখ করেছেন, হত্যাপরাধে মূল কথার সঙ্গে সেসব কথার কোন সম্পর্ক নেই।

বন্দীর পক্ষে আইনজীবী তাঁর শেষ কথায় বলেছেন যে, যদি স্বীকারোক্তি গৃহীতও হয় তবু তার উপর নির্ভর করা সমীচীন নয়, কেননা, পরবর্তীকালে বন্দী বলেছেন, তাঁর কিছু কিছু উক্তি দীনেশ-প্ররোচিত এবং অসত্য, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বাচ্চুনারায়ণ লালের সাক্ষ্যে প্রকাশ, দীনেশচন্দ্র রায়ের প্রকৃত নাম প্রফুল্ল চাকী। বিচারপতিগণ বলেন, আমরা মনে করিনে, একথা যুক্তিযুক্ত এবং একথায়ও কোন যৌক্তিকতা দেখিনে যে, যেহেতু বন্দী পরে কোন একসময়ে বলেছেন, তাঁর স্বীকারোক্তির কোন কোন কথা অসত্য সেই হেতু তাঁর সমগ্র স্বীকারোক্তিই গ্রহণের অযোগ্য। একথাও সঙ্গত নয় যে, যে-স্বীকারোক্তি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য তা নিয়ে অভিযুক্ত খুশিমত এই তর্ক তুলতে পারে যে, স্বীকারোক্তিতে কতকাংশ অসত্য বলে সর্বাংশই গ্রহণের অযোগ্য। বস্তুত, একথা সমর্থনের পক্ষে কোন তথ্য নেই যে, প্রথম স্বীকারোক্তি থেকে দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তদুপরি, যে অংশ অসত্য বলা হচ্ছে তার সঙ্গে প্রকৃত অপরাধের কোন সম্বন্ধ নেই। স্বীকারোক্তিতে আছে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ এবং তার পরও অপরাধী বা অপরাধীরা কি করেছে। এসব ঘটনা সাক্ষ্য সাবুদে সমর্থিত ; এমন আভাষও কেউ দেন নি যে, দীনেশ ছাড়া আর কেউ স্বীকারোক্তির কথা শিখিয়ে দিয়েছে।

বন্দী স্বয়ং সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি সত্য বলে বলেছেন এবং বিচারের কোন স্তরে তা প্রত্যাহার করেন নি। আপীল-আবেদনে আভাষ-মাত্র দেওয়া হয়েছে, সুস্পষ্ট বলা হয়নি যে, দীনেশচন্দ্র রায়ই সেই লোক যাঁর বোমানিক্ষেপের ফলে মহিলা দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার যে, বন্দীপক্ষের আইনজীবী যেসব আপত্তি তুলেছেন তা টেঁকে না, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, এটি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং এ সত্য।

দায়রা জজের পক্ষ থেকে বন্দীর জবানবন্দী গ্রহণ সম্পর্কে যে আপত্তি তোলা হয়েছে, তার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, জবানবন্দী গ্রহণের উদ্দেশ্য সমগ্র পরিস্থিতিতে বন্দীর কি বলার আছে সেইটি জেনে নেওয়া। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর, এক্ষেত্রে তো অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকারই করেছেন। আমাদের মতে, এক্ষেত্রে দায়রা জজ আরও জবানবন্দী না নিয়ে কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ করেন নি, এর ফলে বিচারকার্য দূষিতও হয়নি। বন্দীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কোন সাক্ষ্য দিতে চান কি না, তিনি বলেছেন, 'না'।

আমাদের এখন বিচার্য, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট ৩৪২ কার্যবিধিমতে বন্দীর যে জবানবন্দী নিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য কিনা। দায়রা জজ যে মন্তব্য করেছেন তা কিছু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। প্রশ্নের সংখ্যা ৫৫ বটে কিন্তু বেশির ভাগ প্রশ্নই সাক্ষীদের কথিত ঘটনা সংক্রান্ত যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন বক্তব্য থাকতেও বা পারে। এসব প্রশ্ন আপত্তিকর নয় বা এগুলো বন্দীর প্রতিকূল নয়। প্রারম্ভিক প্রশ্নগুলো যা করণীয় ছিল তাই এবং কতখানি দীনেশের শেখানো সেটি জানবার জন্যই করা। ৮ নং এবং ১০ থেকে ১৯ অবধি প্রশ্নগুলো করা উচিত হয়নি এবং তার জবাবগুলো সাক্ষ্য হিসাবে বর্জনীয়। ৪৯ থেকে ৫১ নং প্রশ্নোত্তরও সম্ভবত বাদ দেওয়া উচিত। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, উল্লিখিত প্রশ্নোত্তরগুলো বাদে অবশিষ্ট জবানবন্দী গ্রহণযোগ্য। বন্দীপক্ষের আইনজীবী এই তর্কও তুলেছেন যে, দায়রা জজ যেক্ষেত্রে বন্দীর অপরাধ-স্বীকৃতি গ্রহণ করেন নি সেক্ষেত্রে তিনি তার উপর নির্ভর করে দোষ সাব্যস্তের সিদ্ধান্তেও আসতে পারেন না। আমাদের মনে হয় না দায়রা জজ তা করেছেন। তিনি বলেছেন, অভিযুক্ত করবার পর বন্দীর অপরাধ-স্বীকৃতি যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, তথাপি তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই তিনি অপরাধ

সাব্যস্ত করেছেন। এটি হলে অবশ্যই ভাল হত, যখন তিনি বিচার করাই স্থির করলেন, তখন তিনি যদি ইংলণ্ডের প্রথানুসারে বন্দীকে "নির্দোষ" বলার নির্দেশ দিতেন। বিচার করা স্থির করে অপরাধ-স্বীকৃতি নথিভুক্ত করা অর্থহীন। অপরাধ-স্বীকৃতি গ্রহণ করে থাকলে ফরিয়াদীপক্ষ ও বন্দীর মধ্যে কোন মামলাই থাকে না। আমরা এই আপীলে তাই ধরে নিয়েছি যে, অপরাধ-স্বীকৃতি গৃহীত হয়নি এবং তদনুসারে কাজ হয়নি। আমরা ঘটনাক্রম ও আইনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দীর আপীলের অধিকার মেনে নিয়েছি।

বন্দীর আইনজীবীর বিতর্কের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা এই অভিমত প্রকাশ করছি, বন্দীর বিরুদ্ধে এবং অভিযোগের সপক্ষে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রভৃত, যে-অভিযোগ বন্দীর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তার সঙ্গে ঐসব সাক্ষ্য যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। বন্দীপক্ষের আইনজীবীর অন্যান্য তর্ক বা আপত্তিও দায়রা জজের সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করে বিচারপতিগণ খারিজ করে দেন। প্রসঙ্গত তাঁরা বলেন, মজঃফরপুরে ঐকালে বন্দীর অবস্থিতিরও অন্য কোন উপলক্ষ বা কারণ পাওয়া যায় না। বিচারপতি-গণ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের সঙ্গে "বর্জনীয়" প্রশ্নোত্তরগুলো বাদে স্বীকারোক্তিও তাঁদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে গ্রহণ করেছেন। আপীলের আবেদনে যা বলা হয়েছে, এত বোঝা (দুটি পিস্তল, অতগুলো কার্তুজ, দুটি কোট ইত্যাদি) নিয়ে হত্যা সম্ভব নয়, তদুত্তরে বিচারপতিগণ মন্তব্য করেছেন, আসলে (পিস্তল নয়) রিভলভার দুটির মধ্যে মাত্র একটি ভারি, কার্তুজগুলো কয়েক আউন্স মাত্র এবং কোট দুটি হত্যানুষ্ঠান কালে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীর গায়ে পরা ছিল। এগুলো নিয়ে হত্যাকার্য খুব একটা কঠিন বা অস্বস্তিকর হওয়ার কথা নয়। হত্যাকাণ্ডের পর ঠিক কি হয়েছিল তা তো জানা যাচ্ছে না, হতে পারে যে, একজন আর একজনকে কিছু জিনিস হস্তান্তরিত করেছেন। দীনেশের সিল্ক কোটটি ক্ষুদিরামের কাছে থাকায় এরকম অনুমান করা যায়। সুতরাং, আমরা এই উপসংহার গ্রহণ করতে পারছি নে যে, দীনেশই বোমাটা ছুঁড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে, যদি এমনও হয়ে থাকে (অর্থাৎ দীনেশই বোমাটা ছুঁড়েছে) তবু বন্দীর (ক্ষুদিরামের) অপরাধ সমপরিমাণ। যদি বন্দী (ক্ষুদিরাম) ও দীনেশ বোমা মেরে হত্যার অভিপ্রায়ে ঐ রাত্রে অপেক্ষা করে থাকে, যদি একই উদ্দেশ্য-সাধনে বন্দী বোমা নিক্ষেপক দীনেশের সুবিধের জন্য পাশে জিনিসগুলো নিয়ে দাঁড়িয়েও থেকে থাকেন এবং হত্যাকাণ্ডের পর দীনেশের পলায়নে সহায়তা করে থাকেন বন্দী সমান অপরাধী হবেন। বিচারপতিগণ ক্ষুদিরামের অপরাধ নির্ণয়ে জজের

সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন। তাঁরা দণ্ডলাঘব করারও কোন যুক্তি দেখেন না। তাঁদের মতে বন্দী ১৯ বছরে নিতান্ত তরুণ নন, এদেশের হিসাবমতো পরিণত যুবক। ঘটনাস্থলে অধিকতর বয়স্ক কারও প্ররোচনায় এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নি। বন্দী ও তাঁর সঙ্গী মজঃফরপুরে **কুড়ি দিন** অবস্থান করে অপরাধ অনুষ্ঠানের সুযোগ খুঁজছিলেন এবং যখন তাঁরা বুঝলেন যে সুযোগ এসে গেছে অমনি তারা ধরা পড়া সম্পর্কে সতর্কতা ও নিরাপত্তার উপায় অবলম্বন করে স্বেচ্ছায় দৃঢ়চিত্তে অপরাধ ঘটিয়েছেন। বন্দীকে তেমন যুবক ধরে নেওয়া অসম্ভব যিনি কি ভয়াবহ দুষ্কার্য করতে যাচ্ছেন তা সম্যক জানতেন না। তাঁর স্বীকারোক্তিতেও এমন কিছু প্রকাশ পায় নি যাতে মনে হতে পারে যে, তাঁর অনুভূতি অপরিণত এবং তাঁর কাজটা কোন অপরাধপ্রবণ ভ্রান্তি মাত্র। এই অপরাধ অনুষ্ঠানের কারণ তিনি বলেছেন এবং সঙ্গীর সঙ্গে মিলে কিভাবে তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের সম্মুখে যে তথ্যাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে তা থেকে বন্দীপক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারছিনে যে, তিনি অপরাপরের ক্রীড়নক মাত্র। তাঁর বিরুদ্ধে যে চরম শাস্তি উচ্চারিত হয়েছে আইনত তা লঘু করার কোনও যৌক্তিকতাই আমরা দেখছি নে, সুতরাং আমরা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন ও আপীল খারিজ করলাম।

২৩ জুলাই 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মজঃফরপুর সংবাদদাতা খবর দিচ্ছেন, জেলে ক্ষুদিরামের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর মাসী না পিসী কে যেন পাগলের মতো সর্বত্র মাথা কুটে বেড়াচ্ছেন, স্থানীয় উকিলদের সঙ্গেও দেখা করেছেন কিন্তু সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছেন।

২৬ জুলাই ঐ সংবাদদাতাই খবর দিয়েছেন লেঃ গবর্ণর ক্ষুদিরামের—'মার্সি পিটিসান' (করুণার আবেদন) অগ্রাহ্য করেছেন।

২৭ জুলাই তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত 'মার্সি-পিটিসানটি' বেরোয়:

To His Honour the Lieutenant-Governor of Bengal

The humble petition of Khudiram Bose, prisoner, Muzafferpur jail.

Most respectfully sheweth—

1. That Your Honour's petitioner has been convicted of murder by the Additional Sessions Judge of Muzafferpur and sentenced to death.

2. That Your Honour's petitioner preferred appeal to the Hon'ble High Court but the same has been dismissed and sentence of death confirmed.

3. That soon after the arrest of Your Honour's petitioner he made a confession before the District Magistrate, Muzafferpur in which he took the responsibility of the offence on himself.

4. That Your Honour's petitioner did this in order to screen Dinesh Chandra who was the real perpetrator of the bomb outrage at Muzafferpur, and who had not been arrested up to that time.

5. That this point was urged by Your Honour's petitioner's pleader before the Court of Sessions, as will appear from the newspaper reports of the proceedings published in the Statesman dated the 14th June 1908, of the 16th June 1908 and was also set forth in the petition of appeal presented to the High Court.

6. That Your Honour's petitioner denied in the petition of appeal that he had thrown the bomb, and Your Honour's petitioner's pleader also advanced arguments in support of this plea before the Court of Sessions as it would appear from newspaper reports referred to above.

7. That in as much as all the points urged by the petitioner's pleader before the Court of Sessions were not discussed in the judgment and as Your Honour's petitioner's petition of appeal was in Bengali, the Hon'ble High Court came to the conclusion that Your Honour's petitioner had not denied that he was the thrower of the bomb. Your Honour's petitioner humbly submits that this was a misconception.

8. That from the judgment of the Hon'ble High Court it would appear that though Your Honour's petitioner was adjuged to be the thrower of the bomb, yet his criminality in case he did not throw the bomb has also been discussed. Your Honour's petitioner respectfully submits that from the judgment of the Hon'ble High Court it seems to entertain a

doubt as to whether Your Honour's petitioner actually threw the bomb.

9. That accepting the findings of the learned Sessions Judge and the Hon'ble High Court, there are in the judgments expressions which convey some doubt as to whether Your petitioner actually threw the bomb and in such a case according to the precedent of Queen vs Babu Lall Jha reported in IWR Criminal Rulings p. 48, the sentence of death passed on Your Honour's petitioner may without violence of any principle of law be commuted if Your Honour is pleased to take a lenient view of the petitioner's case.

10. That Your Honour's petitioner's father and mother died long ago and as an orphan Your Honour's petitioner received very little education having read only upto 2nd Class of the Entrance School at Midnapur.

11. That though not actually insane Your Honour's petitioner was known to be somewhat wrong in the head by his teachers and school-fellows.

12. That Your Honour's petitioner is sincerely sorry for the death of Mrs and Miss Kennedy.

13. That Your Honour's petitioner never had any personal grudge or ill-feeling against Mr. D. H. Kingsford.

14. That Your Honour's petitioner met Dineshchandra at the "Jugantar" office in Calcutta, that he exercised considerable influence over Your Honour's petitioner come to Muzafferpur. Your Honour's petitioner begs most humbly to submit that he would never have come to this predicament, if he had not met Dineshchandra, whose real name Your Honour's petitioner subsequently learnt during the trial to be Prafullachandra Chaki.

15. That Your Honour's petitioner never belonged to any secret society and knows nothing about bomb, the revolvers and cartridges found on Your Honour's petitioner which were given to him by Prafullachandra Chaki.

16. That Your Honour's petitioner is only 19 years old and as yet inexperienced in the ways of the world, and can

not think of dying so young, and if, according to the laws of the country, any other punishment as can expiate the offence of which the petitioner has been found guilty Your Honour's petitioner is willing to undergo the same.

Your Honour's petitioner accordingly press for a commutation of the sentence of death passed against him by the Additional Sessions Judge of Muzafferpur and confirmed by the High Court and for this act of mercy Your Honour's petitioner shall, as in duty-bound, ever pray.

Sd/- KHUDIRAM BOSE

বলা বাহুল্য, মুসাবিদা উকিলের, বক্তব্যও সর্বাংশে উকিলের, ক্ষুদিরাম নিজে কতটা এর তাৎপর্য বুঝেছেন, বলা মুস্কিল। দরখাস্তখানি ক্ষুদিরাম বোস স্বাক্ষরিত। জেলের প্রথানুসারেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে এই জাতীয় আবেদনে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আবেদনের বয়ান সর্বতোভাবে উকিলের, উদ্যোগীও সম্ভবত তিনি। 'সম্ভবত' এই জন্য বলা যে, ঠিক কি অবস্থায় কিভাবে এই আবেদন স্বাক্ষরিত হয়েছে সে সম্পর্কে সংবাদের অভাব। আবেদনটি অগ্রাহ্য হয়।

পরবর্তী সংবাদ, বুধবার আগষ্ট ৫, ১৯০৮। লোকাল গবর্মেণ্ট (প্রাদেশিক সরকার) ভাইসরয়ের (বড়লাটের) উদ্দেশে লিখিত ক্ষুদিরাম বোসের আবেদন ইম্পিরিয়াল গবর্মেণ্টের (ভারতে কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সরকারের) ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই আবেদন সম্পর্কে শীগগিরই হুকুম প্রত্যাশিত।

তার পরবর্তী সংবাদ, আগষ্ট ১০, 'অমৃতবাজার পত্রিকা', পৃঃ ৫, 'রাজার কাছে ক্ষুদিরামের আপীল/আবেদনপত্র আটক/মজঃফরপুর, আগস্ট ৯ (নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত):

সম্রাটের উদ্দেশে ক্ষুদিরামের দরখাস্ত গবর্মেণ্ট আটকে দিয়েছেন, কারণ, জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কারাধ্যক্ষ)-নির্ধারিত ১১ তারিখের মধ্যে জবাব পাবার অবকাশ নেই। রাজার কাছে আবেদন-সংক্রান্ত কার্যবিধি কি ত্রুটিপূর্ণ না সঠিক? এই বিভ্রান্তিকর নীতির সমাধান দরকার।

শেষ সংবাদ, 'অমৃতবাজার পত্রিকা', বুধবার আগস্ট ১২, ১৯০৮, পৃঃ ৫ :

ক্ষুদিরামের অন্তিম/প্রফুল্লচিত্তে স্মিতহাস্যে মৃত্যুবরণ/অনাড়ম্বর অন্ত্যেস্টি
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত) মজঃফরপুর, আগষ্ট-১১ :

আজ সকাল ছ'টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেল। তিনি ফাঁসীমঞ্চের দিকে দৃঢ়পদে ও প্রফুল্লচিত্তে হেঁটে গেলেন, মাথার উপর যখন টুপি টেনে দেওয়া হ'ল একটু হাসলেনও।

ক্ষুদিরামের অভিপ্রায়মতো তাঁর উকিল বাবু কালিদাস বসু দেহটি চাইলেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্ত্যেস্টির অনুমতি দিলেন, বিনা আড়ম্বরে তা অনুষ্ঠিত হ'ল। কিছু শোকার্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা ঘাট পর্যন্ত দেহের অনুগমন করলেন। রাস্তায় সারিবদ্ধ পুলিস ও দর্শক, জনতাকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি।

গণ্ডক নদতীরে অন্ত্যেস্টি হ'ল নিঃশব্দে।

Khudiram's End : Died cheerful and smiling :
A Quiet Funeral

Khudiram's execution took place at 6 A. M. this morning. He walked to the gallows firmlv and cheerfully and even smiled when the cap was drawn over the head.

According to Khudiram's wishes, Babu Kalidas Bose, his pleader, applied for his body and the District Magistrate permitted the funeral which was performed without any demonstration. There were a few mourners who accompanied the body to the Ghat. The Road was lined by the police and spectators and the crowd were kept off.

There was a quiet funeral on the bank of the river Gandak.

—:—